

# সব্দীপত্র

## বার্ষিকী প্রকাশনা পৰ্যদ

- পৃষ্ঠপোষক** : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ  
এনডিসি, পিএসসি
- উপদেষ্টামণ্ডলী** : আসমা বেগম, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-সিনিয়র শাখা  
ফাতেমা জোহরা, উপাধ্যক্ষ, দিবা-সিনিয়র শাখা  
মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-জুনিয়র শাখা  
মোঃ ফিরোজ খান, উপাধ্যক্ষ, দিবা-জুনিয়র শাখা
- সম্পাদনা পৰ্যদ-২০২২ :**
- |  |           |
|--|-----------|
| মির্জা তানবীরা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক       | -আহ্বায়ক |
| মোঃ শাহরিয়ার কবির, সহযোগী অধ্যাপক           | -সদস্য    |
| প্রসূন গোস্বামী, সহযোগী অধ্যাপক              | -সদস্য    |
| দেওয়ান শামছুদ্দোহা, প্রভাষক                 | -সদস্য    |
| হোসেন মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন ভূঁইয়া, প্রভাষক | -সদস্য    |
| মশিউর রহমান, প্রভাষক                         | -সদস্য    |
| মোঃ এনামুল হক, প্রভাষক                       | -সদস্য    |
| তানিয়া বিলকিস শাওন, প্রভাষক                 | -সদস্য    |
| ফাহমিদা আক্তার, প্রভাষক                      | -সদস্য    |
| আছমা খাতুন, প্রভাষক                          | -সদস্য    |
| মো. মঈদুল ইসলাম, প্রভাষক                     | -সদস্য    |
| মোঃ তারিকুল ইসলাম, প্রভাষক                   | -সদস্য    |
| সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী, প্রভাষক            | -সদস্য    |
- মুদ্রণ তত্ত্বাবধান** : বার্ষিকী সম্পাদনা পৰ্যদ-২০২২
- আলোকচিত্র** : গ্যালাক্সী ফটোগ্রাফি হাউস
- প্রচ্ছদ** : রুবাইয়াত বিন হায়দার, দ্বাদশ শ্রেণি (দিবা)
- অলংকরণ** : মির্জা তানবীরা সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক (চারু ও কারুকলা)
- ডিজাইন** : গ্যালাক্সী ডিজাইন হাউজ, মিরপুর-১, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯১৩০৯৯৪১৭
- মুদ্রণ** : গ্যালাক্সী ইন্টারন্যাশনাল, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬, ✉ glxyint@gmail.com
- প্রকাশকাল** : জুন ২০২৩



অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষক প্রতিনিধিদ্বয় এবং বার্ষিকী সম্পাদনা পর্ষদ



## নবাগত সভাপতির বাণী

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের অপার সম্ভবনাময় ছাত্ররা আর শিক্ষকমণ্ডলী তাঁদের জ্ঞান-অনুভূতি আর সৃষ্টিকে তুলে ধরতে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কলেজ বার্ষিকী 'সন্দীপন' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বার্ষিকী প্রকাশের এ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ দেশের সুনামধন্য বিদ্যাপীঠ। বিশ্বায়নের যুগে বর্তমান প্রজন্মকে দক্ষ ও মর্যাদাবান হিসেবে গড়ে তোলার মহান কাজে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়ে চলছে এ প্রতিষ্ঠান। অ্যাকাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপকতা এ কলেজকে দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর পুত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সহোদর বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ লেফট্যানেন্ট শেখ জামাল এ বিদ্যায়তনেরই কৃতি ছাত্র। এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন এমন অনেকেই পরবর্তীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বহু প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রদূত, প্রকৌশলী, আইনজ্ঞ, ক্রীড়াবিদ স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে এ কলেজের মেধাবী ছাত্ররা তাদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সোলেমান খান

সোলেমান খান

সচিব

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এবং

সভাপতি

বোর্ড অব গভর্নরস

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



## বিদায়ী সভাপতির বাণী

আজকের শিশু আগামী দিনের পরিণত নাগরিক। সুযোগ্য নাগরিক হওয়া সাধনার বিষয়। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, ধারাবাহিক চর্চা ও মূল্যায়নের সঠিক মাধ্যম। ঐতিহ্যবাহী ও স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মন ও মনন বিকাশের লক্ষ্যে নিরলস প্রয়াসের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত হলো বার্ষিক ম্যাগাজিন 'সন্দীপন'।

শিশুদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। কলেজ বার্ষিকীর মতো সৃষ্টিশীল প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত মেধা বিকাশে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এই ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক চর্চা কেবল শিক্ষার্থীদের শৈল্পিক ভাবনার নান্দনিক প্রকাশ ঘটাতেই সহায়তা করে না, পাশাপাশি তাদের আত্মবিশ্বাসকে ঋদ্ধ করে তোলার মাধ্যমে তাদেরকে সুব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'সন্দীপন -২০২২' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই নবীন ও খুদে লেখকরা একদিন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের দরবারে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই মেধাবীদের হাত ধরে বাংলাদেশের গৌরবগাঁথা ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ভালবাসা।

পরিশেষে, আমি এই প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সাহিত্য বার্ষিকী 'সন্দীপন -২০২২' প্রকাশের সাথে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক

সচিব

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এবং

চেয়ারম্যান, বোর্ড অব গভর্নরস

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



## অধ্যক্ষের বাণী



সময়ের বিবর্তনের মুখোমুখি হয়ে যে অভিজ্ঞতা মানুষ লাভ করে তা থেকেই সে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। এই সমৃদ্ধ জ্ঞানকে বিকশিত ও সুসংহত করতেই সূচনা হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষের সুপ্ত সুকুমারবৃত্তিকে বিকশিত করতে অনুপ্রাণিত করে, আর এই সুকুমার বৃত্তিকে মানুষ ধরে রাখে তার সৃজনশীল সৃষ্টির মাধ্যমে। এক্ষেত্রে স্কুল এবং কলেজ থেকে প্রকাশিত বার্ষিকী একটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম একটি ঐতিহ্যবাহী ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই কলেজ গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে অনবদ্য অবদান রেখে চলছে। শিক্ষার্থীদেরকে সুশিক্ষিত ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি। কলেজ বার্ষিকী ও সন্দীপন' এর প্রকাশ কলেজের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমেরই একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা।

'সন্দীপন' এর মাধ্যমে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়। তারা সৃজনশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনাগুলোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে পারে। শিল্প ও সাহিত্যের চর্চা শিক্ষার্থীদেরকে দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সন্দীপন' কলেজের বার্ষিক কার্যক্রমসমূহের দর্পণ স্বরূপ। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের সৃষ্টিশীল রচনার পাশাপাশি কলেজের খেলাধুলা ও বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, ক্লাবসমূহের কার্যক্রম ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণ, হাউস প্রতিবেদন, চিত্রশৈলী এবং বহুমাত্রিক কার্যক্রমের আলোকচিত্র এই বার্ষিকীতে স্থান পায়। এগুলো শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে মননশীল সৃষ্টিকর্মে অনুপ্রাণিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিশেষে, আমি সন্দীপন ২০২২' এর প্রকাশকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এর প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কাজী শামীম ফরহাদ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল

অধ্যক্ষ

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



## সম্পাদকের বাণী

মানুষের আবেগ প্রকৃতির বিপুল সৌন্দর্যকে নিজের মতো করে প্রকাশের প্রেরণা জুগিয়েছিলো। প্রকৃতির এই রূপকে মানুষ নিজের মনের ভেতর নিয়ে বিমূর্ত করলো। তারপর আপন মনের রঙে-রেখায়-শব্দে-ভঙ্গিতে বাইরে এনে মূর্ত করলো। তখন সেটা আর প্রকৃতির রইলো না তার নিজের হয়ে গেলো এবং মনের রং মেশানো রূপ অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চাইলো। এটাই শিল্পকলা। এই শিল্পকলার কেতাবি উপস্থাপন 'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' মন্ত্রে উজ্জীবিত ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'সন্দীপন'।

জীবনকে সুন্দর করে সামনের দিকে প্রবাহিত করাই শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্য। প্রকৃতিকে অন্তরের করা এবং অন্তরকে সাজিয়ে বের করে আনাই এর মূল কথা। যা অদৃশ্য ও অস্পর্শযোগ্য সেটাকে দৃশ্যমান এবং স্পর্শযোগ্য করাই এর ধর্ম। 'সন্দীপন' সেই মানবতার, জ্ঞানের ধর্মকে প্রকাশ করে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, চিত্রকর্মের মধ্য দিয়ে।

দৃষ্টা যখন কোনো রূপসৌন্দর্যকে অন্তরের গভীর থেকে গ্রহণ করে তখনই রূপবন্ধ বা Form এর আবির্ভাব ঘটে। একে মানব মনের Answering quality বলা হয়। মূলত শিল্পীর একটি গুণের কারণেই এ ধরনের গুণগত মানের সৃষ্টি হয়। এই গুণটিই হল শিল্পীর মনের বিশেষত্ব এবং নির্বিশেষ মনোভূমি। শিল্পীসত্তার অনুভূতিগুলো একান্তই তার ব্যক্তিগত নয় বরং এর একটি সর্বজনীনতা আবশ্যিক। আর এই লক্ষ্যেই সেই ১৯৬৮ সাল থেকে অত্র কলেজের ম্যাগাজিন সম্পাদনা পর্ষদ প্রকাশ করে আসছে এই বার্ষিকী। 'দ্য প্রভ্লেস'(১৯৬৮), 'সন্দীপন' (১৯৭৭ থেকে বর্তমান), 'অরণি'(১৯৯৮), 'সৃজন'(২০০২), 'স্মারক সঞ্জীবন'(২০১০) এই পরিক্রমায় বর্তমানের 'সন্দীপন' (২০২২) বরাবরের মতোই ধারণ করেছে আমাদের ছাত্র, শিক্ষকদের মনোজাগতিক শৈল্পিকতাকে কালো কালির বুননে।

'সন্দীপন'-এ চিরায়ত ও চিরন্তন নৈসর্গিক প্রকৃতিকে শিল্পীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত রং, রেখা, শব্দ বা রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ করে সেই অনুভূতি অন্যের মনে সঞ্চারের মাধ্যমে একটি পরিচয়বোধের সঞ্চার ঘটিয়েছে তার প্রতি পৃষ্ঠাতে। প্রত্যেকবার এই ম্যাগাজিন ছাত্র, শিক্ষকের জ্ঞানগর্ভ ও বুদ্ধিদীপ্ত মৌলিক রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে একটি জ্ঞানিক সম্ভারে পরিবেশিত হয়েছে।

'সন্দীপন ২০২২' প্রকাশে যাঁরা অক্লান্ত সহযোগিতা করেছেন, পথ নির্দেশনা দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অত্র কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ স্যারকে তাঁর সার্বক্ষণিক মূল্যবান দিকনির্দেশনা দেবার জন্য। সেই সাথে উপাধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষক প্রতিনিধিদ্বয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ ও মুদ্রণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মির্জা তানবীর সুলতানা

সম্পাদক/আহ্বায়ক

'সন্দীপন' সম্পাদনা পর্ষদ-২০২২

এবং

সহযোগী অধ্যাপক, চারু ও কারুকলা বিভাগ

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

# ২০২২ সালের বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্যবৃন্দের নামীয় তালিকা

## বোর্ড অব গভর্নরস



সোলেমান খান  
সচিব

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ও  
সভাপতি  
বোর্ড অব গভর্নরস  
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক  
সচিব

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ও  
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বোর্ড অব গভর্নরস  
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



দুলাল কৃষ্ণ সাহা

নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব),  
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, তেজগাঁও  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ও অভিভাবক প্রতিনিধি (দিবা শাখা), বোর্ড অব  
গভর্নরস  
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



মো: জাহাঙ্গীর আলম  
সচিব

সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ও অভিভাবক প্রতিনিধি (প্রভাতী  
শাখা) বোর্ড অব গভর্নরস  
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



মো: নবীরুল ইসলাম

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন  
মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ও সদস্য, বোর্ড অব গভর্নরস  
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



মোহাম্মদ ওয়ালিদ হোসেন

যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ  
মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ও সদস্য, বোর্ড অব গভর্নরস  
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



প্রফেসর নেহাল আহমেদ

মহা পরিচালক  
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা আদিদপ্তর,  
ঢাকা  
ও সদস্য, বোর্ড অব গভর্নরস  
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



প্রফেসর তপন কুমার সরকার  
চেয়ারম্যান

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা  
ও সদস্য, বোর্ড অব গভর্নরস  
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



প্রফেসর মো: রিজওয়াল ইসলাম  
চেয়ারম্যান

ডিপার্টমেন্ট অব ল  
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়  
ও অভিভাবক প্রতিনিধি (দিবা শাখা)  
বোর্ড অব গভর্নরস,  
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



জনাব মোহাম্মদ নুরুল্লাবী  
সহযোগী অধ্যাপক

ও শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রভাতী শাখা)  
বোর্ড অব গভর্নরস  
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



জনাব রাশেদ আল মাহমুদ  
সহযোগী অধ্যাপক

ও শিক্ষক প্রতিনিধি (দিবা শাখা)  
বোর্ড অব গভর্নরস  
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ  
অধ্যক্ষ

ও সদস্য-সচিব, বোর্ড অব গভর্নরস  
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ  
এনডিসি, পিএসসি  
অধ্যক্ষ

## উপাধ্যক্ষবৃন্দ



আসমা বেগম  
উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-সিনিয়র শাখা



ফাতেমা জোহরা  
উপাধ্যক্ষ, দিবা-সিনিয়র শাখা



মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ  
উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি-জুনিয়র শাখা



মোঃ ফিরোজ খান  
উপাধ্যক্ষ, দিবা-জুনিয়র শাখা

## সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দ



ড. মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক  
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা



মোঃ গোলাম মোস্তফা  
সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান



মোঃ লোকমান হাকিম  
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা



মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার  
সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান



সাবেরা সুলতানা  
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি



মোঃ মেসবাহুল হক  
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি



শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী  
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি



মোহাম্মদ নূরুনবী  
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন



ডে এম আরিফুর রহমান  
সহযোগী অধ্যাপক, রসায়নবিজ্ঞান



সুদর্শন কুমার সাহা  
সহযোগী অধ্যাপক, গণিত





রানী নাছরীন  
সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান



রাশেদ আল মাহমুদ  
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি



মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন  
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি



মির্জা তানবীরা সুলতানা  
চারু ও কারুকলা বিভাগ



মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন  
পদার্থবিজ্ঞান



মোহাম্মদ আরিফুর রহমান  
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি

## সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ



রতন কুমার সরকার  
চারুকারণকলা বিভাগ



মোঃ বাকবিলাহ  
ইতিহাস বিভাগ



অনাদিনাথ মন্ডল  
গণিত বিভাগ



আখতার জাহান ফেরদৌসী বানু  
কম্পিউটার বিভাগ



ত ম মালেকুল এহতেশাম লালন  
বাংলা বিভাগ



মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম  
ইসলামশিক্ষা বিভাগ



নাসরীন বানু  
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ



মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন  
গণিত বিভাগ



মোঃ জাহেদুল হক  
রসায়নবিজ্ঞান বিভাগ



প্রশান্ত চক্রবর্তী  
গণিত বিভাগ



মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান  
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



আসাদুল হক  
ইংরেজি বিভাগ



মুহাঃ ওমর ফারুক  
ইসলামী শিক্ষা বিভাগ



সামীয়া সুলতানা  
অর্থনীতি বিভাগ



মোঃ রফিকুল ইসলাম  
গণিত বিভাগ



প্রসন্নজিত কুমার পাল  
রসায়নবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ শাহরিয়ার কবির  
বাংলা বিভাগ



মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন মৃধা  
ব্যবস্থাপনা বিভাগ



ড. রুমানা আফরোজ  
বাংলা বিভাগ



প্রসূন গোস্বামী  
ইংরেজি বিভাগ



মোহাম্মদ সেলিম  
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



হাফিজ উদ্দিন সরকার  
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ



জাকিয়া সুলতানা  
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



ফাতেমা নূর  
ইংরেজি বিভাগ



নুরুন্নাহার  
চারু ও কারুকলা বিভাগ



মোঃ আয়নুল হক  
ইংরেজি বিভাগ

## প্রভাষকবৃন্দ



মোঃ ফরহাদ হোসেন  
ভূগোল বিভাগ



সাবরিনা শরমিন  
ভূগোল বিভাগ



এ, কে, এম, বদরুল হাসান  
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



খন্দকার আজিমুল হক পাঞ্চু  
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ ফারুক হোসেন  
রসায়নবিজ্ঞান বিভাগ



মোহাম্মদ হানোয়ার হোসাইন  
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোহাম্মদ হারকুনুর রশিদ ভূঁইয়া  
রসায়নবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ হাবিবুর রহমান  
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
ইসলামশিক্ষা বিভাগ



মোঃ নজরুল ইসলাম  
রসায়নবিজ্ঞান বিভাগ



অসীম কুমার দাস  
ভূগোল বিভাগ



দেওয়ান শামছুদোহা  
ইংরেজি বিভাগ



জি এম এনায়ত আলী  
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ



মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া  
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ নূরুল ইসলাম  
কৃষি শিক্ষা বিভাগ



মোঃ আবু তৌহিদ মিয়া  
কৃষি শিক্ষা বিভাগ



মোঃ খায়রুল আলম  
কৃষি শিক্ষা বিভাগ



মোঃ ফারুক হোসেন  
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ



মোঃ মহিউদ্দিন  
ইসলামশিক্ষা বিভাগ



মুহাম্মদ মনির হোসাইন গাজী  
গণিত বিভাগ



হোসেন মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন ভূঁইয়া  
বাংলা বিভাগ



মোঃ হিসাব আলী  
গণিত বিভাগ



মোঃ ওয়াহিউল ইসলাম  
গণিত বিভাগ



মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী  
বাংলা বিভাগ



মুহসিনা আক্তার  
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ



জাফর ইকবাল  
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ



মশিউর রহমান  
বাংলা বিভাগ



মোহাম্মদ আল আমিন  
ইসলামশিক্ষা বিভাগ



মোঃ এনামুল হক  
ইংরেজি বিভাগ



সৈয়দ আহমেদ মজুমদার  
ইসলামশিক্ষা বিভাগ



মোসাঃ ইশরাত জাহান  
কৃষিশিক্ষা বিভাগ



তৌফাতুন্নাহার  
পরিসংখ্যান বিভাগ



রাসেল আহমেদ  
কম্পিউটার বিভাগ



মোঃ আমিনুর রহমান  
রসায়নবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ জসিম উদ্দীন বিশ্বাস  
ইংরেজি বিভাগ



রাশেদুল মনসুর  
ইংরেজি বিভাগ



হাসিনা ইয়াসমিন  
ভূগোল বিভাগ



আবদুল কুদ্দুস  
দর্শন বিভাগ



মোহাম্মদ মাস্টনুদ্দীন  
ইংরেজি বিভাগ



হরি পদ দেবনাথ  
রসায়নবিজ্ঞান বিভাগ



নিয়ামত উল্লাহ  
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



রফিকুল ইসলাম  
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ নাহিদুল ইসলাম  
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ আবু ছালেক  
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ



তানিয়া বিলকিস শাওন  
বাংলা বিভাগ



আয়িশা আনোয়ার  
কম্পিউটার বিভাগ



মোঃ আব্দুল জলিল  
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ আশিক ইকবাল  
কম্পিউটার বিভাগ



মোঃ মাসুম বিন ওহাব  
রসায়নবিজ্ঞান বিভাগ



ওমর ফারুক  
গণিত বিভাগ



মোঃ হাসান মাহমুদ আবু বক্কর সিদ্দিক  
গণিত বিভাগ



মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম  
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



মোঃ আবু সালেহ  
গণিত বিভাগ



ফাহমিদা আজার  
বাংলা বিভাগ



তারেক আহমেদ  
বাংলা বিভাগ



মোঃ খায়রুজ্জামান  
ইংরেজি বিভাগ



তামান্না আরা  
বাংলা বিভাগ



আয়েশা খাতুন  
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



মোঃ আবু সাঈদ  
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ আহসানুল হক  
ব্যবস্থাপনা বিভাগ



মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
ইসলামশিক্ষা বিভাগ



মোঃ মাজহারুল হক  
ইতিহাস বিভাগ



মোঃ মুরাদুজ্জামান আকন্দ  
অর্থনীতি বিভাগ



মোঃ জাকারিয়া আলম  
ইংরেজি বিভাগ



মু. ওমর ফারুক  
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ আব্দুল হামিদ  
ইসলামশিক্ষা বিভাগ



ফারজানা ইসলাম  
বাংলা বিভাগ



মোঃ সাদিউল ইসলাম  
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ শফিকুল ইসলাম  
পৌরনীতি বিভাগ



মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান  
গণিত বিভাগ



মোঃ সোলাইমান আলী  
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ সাইফুল ইসলাম  
গণিত বিভাগ



দুলাল চন্দ্র দাস  
গণিত বিভাগ



মোঃ জাহিদুল ইসলাম  
ইতিহাস বিভাগ



মো. মুজাহিদ আতীক  
বাংলা বিভাগ



মোঃ তারিকুল ইসলাম  
বাংলা বিভাগ



মোঃ আফজাল হোসেন  
ইংরেজি বিভাগ



নিশাত নওশিন  
বাংলা বিভাগ



আছমা খাতুন  
বাংলা বিভাগ



মো. মাসুদুল ইসলাম  
বাংলা বিভাগ



আফসানা আক্তার  
বাংলা বিভাগ



মোঃ রাফসানুর রহমানর  
ইংরেজি বিভাগ



মোঃ ফোরকান  
রসায়নবিজ্ঞান বিভাগ



সানজিদা আফরিন অনু  
ইংরেজি বিভাগ



রাফিয়া আক্তার  
বাংলা বিভাগ



মো. এনামুল হাসান  
রসায়ন বিভাগ



সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী  
কম্পিউটার বিভাগ



ফারহানা আক্তার  
জীববিজ্ঞান বিভাগ



পরেশ চন্দ্র রায়  
গণিত বিভাগ

## প্রদর্শক ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দ



মোঃ কামাল হোসেন  
কম্পিউটার বিভাগ



ভারত চন্দ্র গৌড়  
ক্রীড়া বিভাগ



মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন  
ক্রীড়া বিভাগ



ওয়াহিদা সুলতানা  
ভূগোল বিভাগ



মোঃ রমজান আলী  
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



প্রণব হাওলাদার  
হিন্দুধর্ম বিভাগ



বর্নালী ঘোষ  
সঙ্গীত বিভাগ



মোঃ জুবায়ের হোসেন  
গণিত বিভাগ



মোঃ জাহিদুজ্জামান জাহিদ  
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



মো. গোলাম আজম  
রসায়নবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ শামীম আহমেদ  
রসায়নবিজ্ঞান বিভাগ



মোঃ হাসান শেখ  
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ



মোসুমী আখতার  
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ



মোঃ আবু রায়হান  
কম্পিউটার বিভাগ



মোঃ মামুন মিয়া পাঠান  
গণিত বিভাগ



সুমাইয়া খানম  
ভূগোল বিভাগ

## সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ (প্রভাতি শাখা)



মোঃ হাসান মাসরুর খান  
প্রভাষক, আই সি টি



মোঃ হাবিবুল্লাহ  
প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা



সুজিত কান্তি রায়  
প্রভাষক, ইংরেজি



মুহাম্মদ আব্দুস সালাম  
প্রভাষক, গণিত



খ. ইনতিশার স্বাক্ষর  
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান



মোঃ ইয়াকুব আলী  
প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা



মোঃ কনক রেজা  
প্রভাষক, বাংলা



মোহাম্মদ ফেরদৌউস  
প্রভাষক, বাংলা



মোঃ সনি মিয়া  
প্রভাষক, গণিত



মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দীন  
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি



মোঃ মাহমুদুল হাসান আলম  
প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা



নাসরিন আক্তার বৃষ্টি  
প্রভাষক, প্রাণি বিদ্যা (প্রভাতি)



মোঃ আবু নাসের  
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া



এম. মাহফুজুল হক  
সহকারী শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা



ইমা আক্তার উর্মি  
প্রভাষক, বাংলা (প্রভাতি)



ইয়াজুয়া আহমেদ শরীফ  
প্রভাষক, আই সি টি



জিনাতুন-নূর  
প্রভাষক, ইংরেজি



মোঃ আরিফুল ইসলাম  
প্রভাষক, অর্থনীতি



শিশির কুমার রায়  
প্রভাষক, উদ্ভিদ বিদ্যা

## সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ (দিবা শাখা)



সাগর চন্দ্র দাস  
প্রভাষক, চারু ও কারুকলা



আফরোজা লাবনী  
প্রভাষক, আই সি টি



এস.এম সোহেল রানা  
প্রভাষক, রসায়ন



মোঃ আলী মতুর্জা মণ্ডল  
প্রভাষক, ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বীমা



মোঃ নাছিরুল হক  
প্রভাষক, শারীরিক শিক্ষা



জেবুনেছা আলী  
প্রভাষক, মার্কেটিং



নাহিদ আক্তার  
প্রভাষক, বাংলা



মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম  
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান



আয়শা আক্তার ঝিলিক  
প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা



মোঃ ফরহাদ হোসেন  
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি



শাহরিমা ইসলাম  
প্রভাষক, আইসিটি



মোঃ সুহেল ইসলাম  
প্রভাষক, ইংরেজি



জিনাত ফাতেমা স্বর্ণা  
প্রভাষক, ইংরেজি



নাঈমা সুলতানা  
প্রভাষক, মার্কেটিং



মোঃ আরিফুল ইসলাম  
সহকারী শিক্ষক, ক্রীড়া



ফারজানা আক্তার তানিয়া  
প্রভাষক, আই সি টি



রীনা রানী রায়  
সহকারী শিক্ষক, হিন্দুধর্ম



শবনম আক্তার  
প্রভাষক, ইংরেজি



সুজন কুমার সাহা  
প্রভাষক, গণিত



কানিজ ফারহানা তুলি  
প্রভাষক, পরিসংখ্যান



মোঃ এরশাদ আলী  
প্রভাষক, গণিত



## নবম গ্রেডের কর্মকর্তাবৃন্দ



বেনজীর আহমেদ  
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা



মোঃ শফিকুল ইসলাম  
মেডিকেল অফিসার



মোঃ শফিকুল ইসলাম  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা



মুহাঃ আমীমুল ইহসান  
জনসংযোগ কর্মকর্তা



মোঃ তোহিদুল ইসলাম  
মেডিকেল অফিসার



হাজেরা খাতুন  
সাইকোলজিস্ট (সাময়িক)

## দশম গ্রেডের কর্মকর্তাবৃন্দ



ফরিদ আহমেদ  
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা



মোঃ মতিয়ার রহমান  
সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার



মোঃ অখিউর রহমান  
সহকারী স্টোর কর্মকর্তা



মোঃ আমীর সোহেল  
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা



মোঃ মাইনুল ইসলাম  
ডাটা কন্ট্রোল সুপারভাইজার



মোঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো  
সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা



মোঃ তৌফিক আজাদ  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী



খন্দকার ওয়ালিদ  
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা



মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
ডাটা কন্ট্রোল সুপারভাইজার

## মসজিদের স্টাফ



মাওলানা মোঃ মহিউদ্দিন  
ইমাম



মোঃ হাসানুজ্জামান  
খাদেম

## একাদশ-শ্রেণীর কর্মকর্তাবৃন্দ



সৈয়দ শাকীর আহমেদ  
সুপারিনটেনডেন্ট



মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম  
সুপারিনটেনডেন্ট (প্রশাসন)



আব্দুল্লাহ মুর্শিদ  
হিসাব রক্ষক



রিপন মিয়া  
হিসাবরক্ষক



ইমরান হোসেন  
হিসাব রক্ষক



আল-মামুন  
পিএ টু প্রিন্সিপাল



মোঃ রবিউল ইসলাম  
ফার্মাসিস্ট



মোঃ গোলাম মোস্তফা  
ফার্মাসিস্ট



মো. নুরু নবী মিয়া  
ফিজিওথেরাপিস্ট



মোঃ ইখতিয়ার হোসেন তালুকদার  
ইউডিএ (উচ্চমান সহকারী)



মোঃ শহীদুল ইসলাম  
ইউডিএ (উচ্চমান সহকারী)



মোঃ মাহবুব হাসান  
উচ্চমান সহকারী



রওশন আরা সাথী  
মেট্রন



মুনিরা বেগম  
মেট্রন



মোহাম্মদ লোকমান হোসেন  
স্টুয়ার্ড



দিলীপ কুমার পাল  
স্টুয়ার্ড



তানজিম হাসান  
স্টুয়ার্ড



মোঃ মঞ্জুরুল হক  
স্টুয়ার্ড



আমানত খান  
ডাটা কন্ট্রোল অপারেটর



মোঃ সুহেল রানা  
স্টোর কিপার



মোঃ আফজাল হোসেন  
স্টোর কিপার



মোঃ মঈনুল হাসান  
গ্রাউন্ডস সুপারভাইজার



মোঃ খাইরুল ইসলাম  
হিসাব সহকারী



সুরাইয়া আক্তার  
হিসাব সহকারী



মোঃ বায়েজীদ তনয়  
হিসাব সহকারী



সুমন কুমার  
হিসাব সহকারী



রহিমা আক্তার  
হিসাব সহকারী



হাসিনা খাতুন  
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর



হেমায়েত হোসেন  
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর



মোঃ আমিনুর ইসলাম রেজা  
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর



মোঃ সাইদুল ইসলাম  
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর



মোঃ আল-আমিন খোন্দকার  
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর



মোছাঃ রোকেয়া আখতার  
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর



ইমরান খান  
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর



রাজু তালুকদার  
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর



মোঃ তাকিব উল্লাহ সাকিব  
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর



মোহাম্মদ লিটন মিয়া  
স্টোর এ্যাসিস্টেন্ট



মঈনুল ইসলাম শোভন  
টেক্সটবুক স্টুয়ার্ড



মোঃ সাগর আলী  
মেডিকেল অ্যাসিস্টেন্ট



ইসরাফিল শেখ  
ড্রাইভার



মোঃ শরিফ আকন্দ  
ড্রাইভার



মিঠন বর্মন  
ড্রাইভার



জজ নুরুল ইসলাম  
ড্রাইভার



মোঃ জিন্নাহ  
কার্পেন্টার (কাঠমিস্ত্রী)



জিয়াউর রহমান  
মেকানিক কাম-ইলেকট্রিশিয়ান (ই এন্ড ই)



মোঃ খাইরুল ইসলাম  
মেকানিক কাম-ইলেকট্রিশিয়ান (জি-১৬)



মোঃ রফিকুল ইসলাম  
মেকানিক কাম-ইলেকট্রিশিয়ান (জি-১৬)



মোঃ রেজাউল আলম খান  
মেশন (রাজমিস্ত্রী)



মোঃ তোফাজ্জেল ইসলাম  
পেইন্টার (রং মিস্ত্রী)



আব্দুল মান্নান সিকদার  
প্লাম্বার

ফটো গ্যালারি



নূর মোহাম্মদ কাজল  
মেকানিক কাম ইলেকট্রিশিয়ান (জি-১৮)



মোঃ আব্দুল হালিম রেজা  
মেকানিক কাম ইলেকট্রিশিয়ান (জি-১৮)



রাসেল রানা  
মেকানিক কাম ইলেকট্রিশিয়ান (জি-১৮)



তপন কুমার পাল  
মেশিন অপারেটর (পাম্প)



মোঃ বেলাল হোসেন  
মেশিন অপারেটর (পাম্প)



মোঃ ওসমান আলী  
ওয়্যারম্যান



মোঃ মফিজুল ইসলাম  
ওয়্যারম্যান



সাইফুল ইসলাম  
ওয়্যারম্যান



মোঃ মোস্তফা  
হেড গার্ড



মোঃ মনির হোসেন  
হেড মালি



সঞ্জীত চন্দ্র দাস  
হেড সুইপার



মোঃ হারুন-অর-রশীদ  
ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেন্ট



মোঃ জাকির হোসেন  
ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেন্ট



মোঃ খলিলুর রহমান  
ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেন্ট



মোঃ ফারুকুল ইসলাম হাওলাদার  
ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেন্ট



মোঃ সোহাগ মিয়া  
ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেন্ট



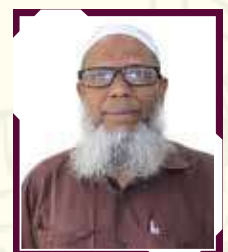
মোঃ আইয়ুব আলী  
ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেন্ট



মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান  
ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেন্ট



মোঃ আবু সায়েদ  
লাইব্রেরি অ্যাসিস্টেন্ট



মোঃ ইউনুস  
লাইব্রেরি অ্যাসিস্টেন্ট



মোঃ আয়াতুল্লাহ  
সহকারী কার্পেন্টার



মোঃ সোহরাব আলী  
মেশন (রাজমিস্ত্রী) হেলপার



মোঃ দারুল মিয়া  
মেশন (রাজমিস্ত্রী) হেলপার



তাইজুল ইসলাম মোল্লা  
প্রামাণ্য হেলপার



আবদুস সালাম মিজ্ঞা  
নাসিং এ্যাসিস্টেন্ট



মোঃ নজরুল ইসলাম  
নার্সিং অ্যাসিস্টেন্ট



মিজবা  
নার্সিং অ্যাসিস্টেন্ট



মোঃ নজরুল ইসলাম  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ কুদ্দুস মোল্লা  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ আনোয়ারুল হক  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ মোকহেদ আলী খাঁ  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ কামাল হোসেন  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ ফারুক শিকদার  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ জহুরুল ইসলাম সেখ  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ জালাল উদ্দিন  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ আনোয়ার হোসেন খাঁ  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ নবীজল ইসলাম  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ রাসেল আলী  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ খলিলুর রহমান  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ ইমরান শেখ  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ মোবাম্বশের আহম্মেদ  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ রেজাউল ইসলাম  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



হাফিজ মোল্লা  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



আবু ছাহিদ দিপু  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



সোহেল আমিন  
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)



মোঃ ইয়ার আলী  
কুক



মোঃ আব্দুল জলিল  
কুক



মোঃ মোস্তফা  
কুক



মোঃ কামাল হোসেন  
কুক



মোঃ সোহরাব হোসেন  
কুক

ফটো গ্যালারি



মোঃ মোস্তাকুর রহমান  
কুক



মোঃ আবজাল হোসেন  
অ্যাসিসটেন্ট কুক



মোঃ আব্বাহ আলী  
অ্যাসিসটেন্ট কুক



মোঃ দেলোয়ার হোসেন  
অ্যাসিসটেন্ট কুক



সাইফুল ইসলাম  
অ্যাসিসটেন্ট কুক



মোঃ সোয়ানুর রহমান  
অ্যাসিসটেন্ট কুক



মোঃ মহিরুল হক  
অ্যাসিসটেন্ট কুক



মোঃ আজমল হোসেন  
গ্রাউন্ডসম্যান



মোঃ সহিদুল ইসলাম  
গ্রাউন্ডসম্যান



মোঃ জাহিরুল ইসলাম  
গ্রাউন্ডসম্যান



মোঃ সাইফুল ইসলাম (শহীদ)  
গ্রাউন্ডসম্যান



মুহাম্মদ শরীফ হোসেন  
গ্রাউন্ডসম্যান



মোঃ হানিফ  
গ্রাউন্ডসম্যান



মোঃ আব্দুর রহমান  
(গার্ড) হাউস



মোঃ শহিদুজ্জামান  
(গার্ড) হাউস



মোঃ রাসেল বেপারী  
(গার্ড) হাউস



মোঃ এনামুল হক  
(গার্ড) হাউস



মোঃ হৃদয় মজুমদার  
(গার্ড) হাউস



মোঃ শহিদুল ইসলাম  
মালি (হাউস)



মোঃ আব্দুর রাজ্জাক খাঁন  
মালি (হাউস)



মোঃ নাসির উদ্দিন  
মালি (হাউস)



মোঃ ইমদাদুল হক  
মালি (হাউস)



মোঃ লাভলু মিয়া  
মালি (হাউস)



মোঃ মনজুর আলী  
মালি (হাউস)



মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন বারু  
সুইপার (হাউস)



এ জেড এম মাইনুল আকবর  
সুইপার (হাউস)



মোঃ রিপন শেখ  
সুইপার (হাউস)



সঞ্জয় কুমার  
সুইপার (হাউস)



মোঃ তানভির অহমেদ  
সুইপার (হাউস)



বাদল চন্দ দাস  
সুইপার (হাউস)



শ্রী কৃষান দাস  
মালি (সেন্ট্রাল)



মোঃ মনু মোল্লা  
মালি (সেন্ট্রাল)



মুকুল  
মালি (সেন্ট্রাল)



মোঃ শহীদুল ইসলাম  
কুক হেলপার



মোহাম্মদ বদিউর রহমান  
কুক হেলপার



মোঃ নুরে আলম সিকদার  
কুক হেলপার



মোঃ শাহীন আলম  
কুক হেলপার



মোঃ বায়েজিদ হোসেন  
কুক হেলপার



রিংকু আহমেদ  
কুক হেলপার



মোঃ আবুল কালাম  
অফিস সহায়ক



মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
অফিস সহায়ক



মোঃ আবদুর রশিদ (৪)  
অফিস সহায়ক



মোঃ আব্দুর রশিদ শেখ  
অফিস সহায়ক



মোঃ আব্দুল কাদের  
অফিস সহায়ক



মোঃ খালেদ পারভেজ  
অফিস সহায়ক



মোঃ মজিবুর রহমান  
অফিস সহায়ক



রাহাত আহমেদ  
অফিস সহায়ক



মোঃ জাকিরুল ইসলাম  
অফিস সহায়ক



মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন  
অফিস সহায়ক



মোঃ সাব্বির উদ্দিন  
অফিস সহায়ক

ফটো গ্যালারি



আশরাফ হোসেন  
অফিস সহায়ক



মোসামঃ শিউলী আক্তার  
অফিস সহায়ক



মোঃ নাজিম উদ্দিন  
অফিস সহায়ক



সুমন হীরা  
অফিস সহায়ক



মোঃ মোকলেচুর রহমান  
অফিস সহায়ক



মোঃ আহসানুল হক  
স্পোর্টস বেয়ারার



মোঃ হানিফ  
সুইপার (একাডেমিক)



মোঃ স্বপন হোসেন  
সুইপার (একাডেমিক)



মোঃ রিপন আলী  
সুইপার (একাডেমিক)



পি. জেমস লুক  
সুইপার (একাডেমিক)



মোঃ মানিক মিয়া  
সুইপার (একাডেমিক)



তিমথী পেনাপেন্লী (সবুজ)  
সুইপার (সেন্ট্রাল)



মোঃ হাজারুল ইসলাম  
সুইপার (সেন্ট্রাল)



সুজন কুমার পাল  
সুইপার (সেন্ট্রাল)



মোঃ হলেমান  
সুইপার (সেন্ট্রাল)



মোঃ সুমন  
সুইপার (সেন্ট্রাল)



রিপন  
সুইপার (সেন্ট্রাল)



মোছাম্মৎ লাইলী আক্তার  
সুইপার (মেডিকেল)



আকলিমা বেগম  
সুইপার (মেডিকেল)



মোঃ আমিনুল ইসলাম  
টেবিলবয়



গাজী মস্তফা কামাল  
টেবিলবয়



মোঃ মোকছেদুল হক  
টেবিলবয়



মোঃ আব্দুল বাহেদ  
টেবিলবয়



মোঃ আব্দুল্লাহ  
টেবিলবয়



মোঃ আকবুল ইসলাম  
টেবিলবয়





মোঃ মাইদুর রহমান মাসুম  
টেবিলবয়



সেলিম মিয়া  
টেবিলবয়



মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম  
টেবিলবয়



মোঃ রাসেল  
টেবিলবয়



মোঃ ইয়াসিন মোল্লা  
টেবিলবয়



মোঃ জাহিদুল ইসলাম  
টেবিলবয়



মোঃ জাকির হোসেন  
ওয়ার্ডবয়



মোহাম্মদ শফিকুর রহমান  
ওয়ার্ডবয়



মোহাম্মদ আলাউদ্দিন  
ওয়ার্ডবয়



মোঃ মজিবুর রহমান  
ওয়ার্ডবয়



মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন  
ওয়ার্ডবয়



মোঃ সাহাদাত হোসেন  
ওয়ার্ডবয়



আবদুল জলিল মিয়া  
ওয়ার্ডবয়



সোহেল সিকদার  
ওয়ার্ডবয়



অধ্যক্ষের সাথে প্রভাতি শাখার শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষের সাথে দিবা শাখার শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষের সাথে প্রশাসন শাখা, মেডিকেল এবং অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ



অধ্যক্ষের সাথে প্রশাসন শাখার কর্মকর্তা এবং হাউসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ



অধ্যক্ষের সাথে প্রশাসন শাখার কর্মকতা-কর্মচারীবৃন্দ



অধ্যক্ষের সাথে চীফ কো-অর্ডিনেটর ও ক্লাব মডারেটরগণ



অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষক প্রতিনিধিদ্বয় এবং বার্ষিকী সম্পাদনা পর্ষদ



অধ্যক্ষের সাথে বহিঃস্বর্ণ প্রতিযোগিতার বিজয়ী ছাত্রবৃন্দ



অধ্যক্ষের সাথে প্রভাতি শাখার প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড



অধ্যক্ষের সাথে দিবা শাখার প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড



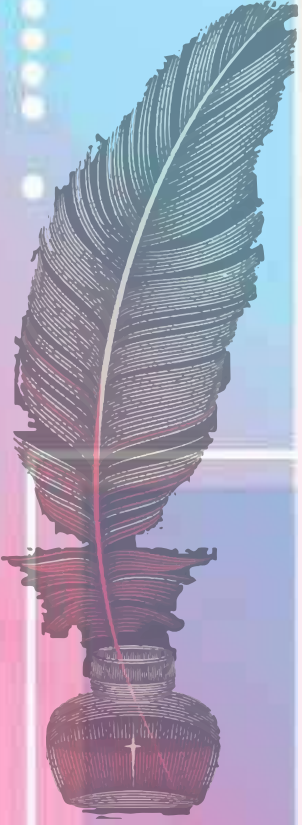
অধ্যক্ষের সাথে বিএনসিসি শিক্ষক এবং ক্যাডেট দল



অধ্যক্ষের সাথে স্কাউট শিক্ষক এবং স্কাউট দল



বিষয় শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১. হাউস রিপোর্ট	৩৩
২. নানাবিধ সফলতা, কার্যক্রম এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড	৪০
৩. জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ও শ্রেষ্ঠ কলেজ	৫১
৪. শেখ রাসেল পদক-২০২২ ও সেরা ডিজিটাল স্কুল	৫৩
৫. লিখন-পঠন-শিক্ষক	৫৭
৬. লিখন-পঠন-ছাত্র	৮৩
৭. গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনী	৯৯
৮. English Write Up	১২৬
৯. চিত্রশৈলী	১৪৪
১০. ক্লাব রিপোর্ট	১৫৪
১১. গুচ্ছছবি	১৭৩
১২. বর্ণিল-২০২২	২১৩
১৩. মিডিয়ায় ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ	১১৬







## ড. কুদরত-ই-খুদা হাউস

ব্যতিক্রমধর্মী স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ৭টি আবাসিক হাউজের মধ্যে কুদরত-ই-খুদা হাউজ অন্যতম। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপিত এই হাউসটি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে নির্মিত প্রথম আবাসিক হাউস। স্থাপনের সময় এ হাউসের নাম ছিল জিন্নাহ হাউস। স্বাধীনতার পর হাউসটির নামকরণ করা হয় ১ নম্বর হাউস এবং পরবর্তী কালে দেশমাতৃকার অমর সন্তান, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নামে নামকরণ করা হয় হাউসটির।

নানা ইতিহাস ঐতিহ্যসহ স্বর্ণালি স্মৃতি ধারণ করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে হাউসটি। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত বর্গাকৃতির দ্বিতল এ হাউজের সুপারিসর অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। হাউসটির ঠিক মাঝখানে রয়েছে পুষ্পশোভিত মনোরম ফুলের বাগান এবং হাউসের দেওয়ালে শোভাবর্ধন করেছে কুদরত-ই-খুদার সুদৃশ্য ম্যুরাল। হাউসটিতে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ৭টি বড় কক্ষ এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য ৫টি বিশেষ কক্ষ। এ ছাড়াও এ হাউসে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিংহল, টিভি ও ইনডোর গেমসের সুবিধা সমৃদ্ধ একটি কমনরুম এবং প্রার্থনার জন্য একটি প্রেরার রুম।

এ হাউসে বর্তমানে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। হাউসটি পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এছাড়া তাদের সহযোগিতার জন্য রয়েছে একজন মেট্রনসহ ১০ জন স্টাফ। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে হাউসের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার জন্য হাউসে আছে ১০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। লেখাপড়া ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রদের রয়েছে সফলতার এক গৌরব উজ্জ্বল ঐতিহ্য। ২০১৩ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত PEC ও JSC পরীক্ষায় সকল ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়ে

উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ সালে করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে PEC ও JSC পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এই হাউসটি ২০১১ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ২০১৮ সাল ব্যতীত সকল বছর এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২০১৬ সাল (রানার আপ) ব্যতীত অন্যান্য বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া আন্তঃহাউজ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ২০১৯ সাল পর্যন্ত টানা ১২ বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে কুদরত-ই-খুদা হাউস। ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত ৩য়-৫ম শ্রেণির আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায়ও এ হাউস চ্যাম্পিয়ন ও ২০২২ (রানার আপ) হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এ হাউস ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালে পরপর ৪ বার আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বহিরাঙ্গন প্রতিযোগিতায় সপ্তম শ্রেণির মুনওয়ার সাদিক বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতায় জেলা (ঢাকা) পর্যায়ে 'খ' বিভাগে প্রথম স্থানের অধিকারী হয়েছে এবং তানবীন হাসান (অষ্টম-বি) মার্কস একটিভ স্কুল কর্তৃক আয়োজিত 'চেস চ্যাম্প' এ ঢাকা জোন-৫ এ প্রাইমারি রাউন্ডে দ্বিতীয় স্থান পাওয়ার গৌরব অর্জন করে। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিযোগিতা 'বিজ্ঞান উৎসবে' ঢাকা অঞ্চলে সেরাদের সেরা (চ্যাম্পিয়ন) হওয়ার গৌরব অর্জন করে এই হাউসের আবাসিক ছাত্র অষ্টম শ্রেণির নাবিল হোসেন।

কুদরত-ই-খুদা হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক এটাই প্রত্যাশা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার : ফাতেমা নূর

হাউস টিউটর : আয়েশা খাতুন

হাউস এন্ডার : সাকিব ইবনে হাসান

হাউস প্রিফেক্ট : নাবিল হোসেন



## জয়নুল আবেদিন হাউস

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ 'ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ' ২০২২ সালে বাংলাদেশের 'শ্রেষ্ঠ কলেজ' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কলেজের ৭টি আবাসিক হাউসের মধ্যে জয়নুল আবেদিন হাউস অন্যতম। ১৯৬১ সালের মে মাসে 'আইয়ুব হাউস' নামে এ হাউসের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের দেশের মহান চিত্রশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নাম অনুসারে এই হাউসটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় জয়নুল আবেদিন হাউস। লাল সিরামিক ইটের তৈরি দ্বিতল হাউসটির অবকাঠামো অত্যন্ত সুপারিকল্পিত ও মনোরম। হাউসের সবুজ শ্যামল পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে রাখে। হাউসের দেয়ালে শোভা বর্ধন করছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের এক সপ্রতিভ মুরাল। হাউসটির অভ্যন্তরে রয়েছে বর্গাকৃতির একটি সুন্দর বাগান। হাউসটিতে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ৮টি বড় কক্ষ এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য ৪টি বিশেষ কক্ষ। এছাড়াও এ হাউসে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিং হল, টিভি ও ইনডোর গেমসের সুবিধা সমৃদ্ধ একটি কমনরুম এবং একটি নামাজের কক্ষ। বর্তমানে এই হাউসে ৩য় থেকে ৮ম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। ছাত্রদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য ১১ জন কর্মচারী এবং ১ জন মেট্রন নিযুক্ত আছেন। শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের অনুপম সমন্বয় জয়নুল আবেদিন হাউসের মূল লক্ষ্য। ভোর বেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই করে রুটিন মারফিক। এই হাউসের ছাত্ররা বরাবরই প্রশংসনীয় ফলাফল অর্জন করে থাকে। বিগত বছরগুলোতে পি ই সি এবং জে এস সি পরীক্ষায় এ হাউসের সকল ছাত্র জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। তবে ২০২০ ও ২০২১ সালের করোনা সংক্রমণের কারণে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল পি ই সি এবং জে এস সি পরীক্ষার্থীদের অটোপাস দেওয়া হয়েছে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ২০১৬ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। তাছাড়া ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সাল পর্যন্ত রানার আপ হয়। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় টানা চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৭ সালের দেয়াল পত্রিকায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৮ ও ২০১৯ সালে রানার আপ হয়। ২০২০ সালে পুনরায় দেয়াল পত্রিকায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৭ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০১৯ সালে রানার আপ হয়। ২০১৯ সালের অন্যতম আকর্ষণ ট্রেজার হান্ট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় জয়নুল আবেদিন হাউস।

**২০২২ সালের অর্জন:** ২০২২ সালের অসমাপ্ত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অন্য দুই হাউসের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পয়েন্টের ব্যবধানে জয়নুল আবেদিন হাউস এগিয়ে ছিল। ২০২২ সালের আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়া ২০২২ সালের আন্তঃহাউস অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে ১০ সদস্যের একটি প্রিফেক্টরিয়াল বোর্ড রয়েছে। হাউসের প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে যেমন হৃদয়তা রয়েছে, তেমনি রয়েছে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে সুনিবিড় সম্পর্ক। মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা, জয়নুল আবেদিন হাউসের কৃতিত্ব ও গৌরব চিরদিন উজ্জীবিত থাকুক। মহান রাক্বুল আলামিন আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার : সাবরিনা শরমিন  
হাউস টিউটর : হাসিনা ইয়াসমিন  
হাউস এন্ডার : মুহাম্মদ হুসাইন ইশরাক  
হাউস প্রিফেক্ট : আবিদ ইসলাম



## ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৭টি হাউসের মধ্যে অন্যতম। বিশিষ্ট ভাষাবিদ, জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার দিক থেকে এ হাউসটি নবীন। দিবা শাখার ছাত্রদের আবাসন সমস্যা নিরসনে ২০ মার্চ ২০০৮ সালে এ হাউসের যাত্রা শুরু হয়। হাউসের আসন সংখ্যা ৮৮। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে হাউসটি প্রভাতি শাখার আবাসিক ছাত্রদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

হাউসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাঁদের সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন স্টুয়ার্ড, একজন বাবুর্চি, একজন সহকারী বাবুর্চি, একজন ম্যাট, দুইজন টেবিলবয়, একজন ওয়ার্ড বয়, একজন দারোয়ান, একজন মালি ও একজন সুইপার। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে হাউস কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে একটি প্রিফেক্টরিয়াল বোর্ড।

হাউসের সামনে এবং দুই পাশে রয়েছে সুদৃশ্য ফুলের বাগান, বিভিন্ন প্রজাতির শোভাবর্ধক ও ফুলের গাছে বাগানটি সমৃদ্ধ। হাউসের সামনে রয়েছে সুবিশাল খেলার মাঠ। সবুজে ঘেরা এ হাউসের দিকে তাকালে মনজুড়ানো অনুভূতি জাগে, শান্তির স্পর্শে প্রাণ ছুঁয়ে যায়। পাঁচতলা বিশিষ্ট এ হাউসের প্রত্যেক তলায় রঙিন আলোর বিচ্ছুরণ হাউসের সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করেছে।

শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় হাউসের ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ছাত্ররা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো মহামানবের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে মা-মাটি-মানুষের ভালোবাসায় নিজেদের সমর্পণে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

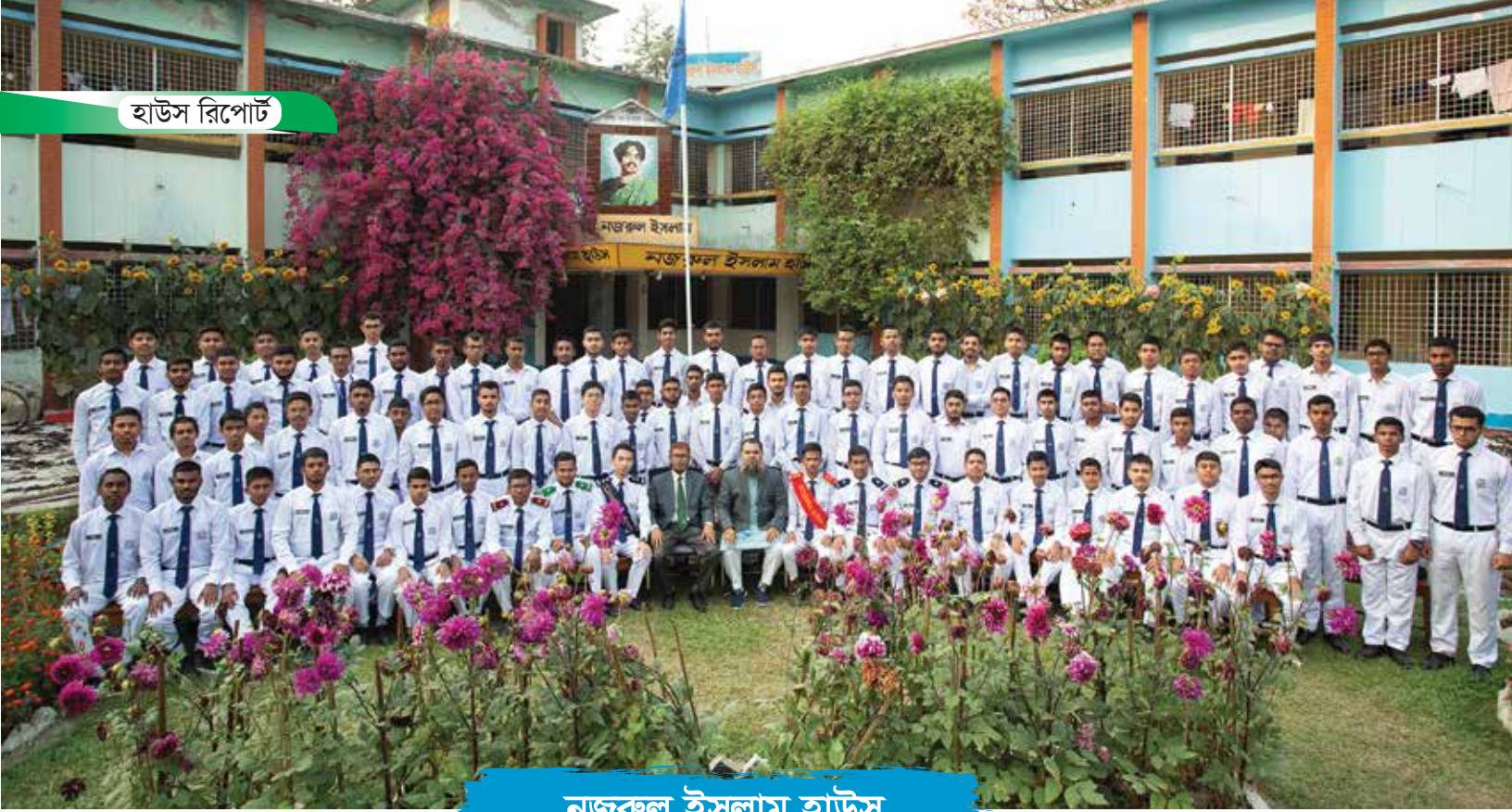
নবীন হাউস হিসেবে কলেজের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এ হাউসের অর্জনও কম নয়। ২০১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় এ হাউস পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ২০১৪ সালে আন্তঃহাউস বাল্কেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০২০ ও ২০২২ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৮ সালে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ২০২২ সালের আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় রানারআপ হয়। ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস ব্যাডমিন্টন, ভলিবল ও বাল্কেটবল প্রতিযোগিতায় রানারআপ হয়েছে। ২০২২ সালের আন্তঃহাউস ইনডোর গেমস এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৭ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৫ ও ২০১৮ সালে রানারআপ হয়। ২০১৮ সালের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৬ ও ২০১৭ সালে রানারআপ হয়। আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় ২০১৯ ও ২০২১ সালে চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৮, ২০২০ ও ২০২২ সালে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের হাউসগুলোর ২০২২ সালের সামগ্রিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে হাউসটি। এভাবেই এ হাউসের ছাত্ররা পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাদের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

হাউস মাস্টার : তারেক আহমেদ

হাউস টিউটর : মোঃ রমজান আলী

হাউস এন্ডার : মোঃ শিফাত আল শাফায়াত

হাউস প্রিফেক্ট : মোঃ রিফাত



## নজরুল ইসলাম হাউস

গাহি সাম্যের গান-

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান

যেখানে মিশেছ হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।

গাহি সাম্যের গান!

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ স্বমহিমায় ভাস্বর এক স্বনামধন্য বিদ্যাপীঠ। আর এই বিদ্যাপীঠের প্রাণের উৎস হল সুশৃঙ্খলার মূর্ত প্রতীক এর হাউসগুলো।

“উৎকর্ষ সাধনে অদম্য” এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের হাউসগুলোর মধ্যে নজরুল ইসলাম হাউস অন্যতম। বিদ্রোহ, তারণ্য, স্বদেশপ্রেম, সাম্য, ঐক্য, অসাম্প্রদায়িকতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে এই হাউসটির নামকরণ করা হয়েছে। আকাঙ্ক্ষার সাথে সুশিক্ষার প্রাপ্তিযোগ্য, সত্যের সাথে স্বপ্ন আর বিদ্রোহের সাথে দেশপ্রেমের অপূর্ব সংমিশ্রণে নজরুল ইসলাম হাউস যেন সুদক্ষ কারিগরের এক সুনিপুণ সূতিকাগার। শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও সমুজ্জ্বল নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ছোট-বড় ২৮ টি রুম, ইনডোর গেমসের সুবিধা সমৃদ্ধ একটি কমনরুম এবং বিশাল আকৃতির ডাইনিংহল। এছাড়া হাউসটির সামনে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফুলের সুসজ্জিত বিশাল আকারের মনোরম বাগান।

হাউসের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একজন হাউসমাস্টার ও একজন হাউস টিউটরসহ দশজন ছাত্র সমন্বয়ে গঠিত প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড রয়েছে এছাড়া ছাত্রদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়োজিত আছে দশজন স্টাফ।

প্রাতিষ্ঠানিক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্রদের সুবিশাল অর্জন ঈর্ষনীয়।

২০২২ সালের এস. এস. সি এবং এইস. এস. সি. পরীক্ষায় নজরুল ইসলাম হাউসের প্রায় সকল পরীক্ষার্থী জি. পি. এ ৫ পাওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০২৩ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নজরুল ইসলাম হাউস রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বিগত বছরগুলোতে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে নজরুল ইসলাম হাউস হ্যাটট্রিক করার সাফল্য অর্জন করে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনের দিক দিয়ে নজরুল ইসলাম হাউসের ইতিহাস অনেক উজ্জ্বল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র শহিদ শেখ জামাল ও বর্তমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু সহ আরো অনেক দেশ বরণ্য প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব এই হাউসের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে সকল কৃতিত্ব ও গৌরব মানবতার জন্য এই প্রত্যাশা আমাদের সবার।

হাউস মাস্টার : জি. এম. এনায়েত আলী

হাউস টিউটর : মো: নাহিদুল ইসলাম

হাউস এন্ডার : ঐশ্বর্য্য মান চাকমা

হাউস প্রিফেক্ট : মো: মারুফ হোসেন



## লালন শাহ হাউস

“ও যার আপন খবর আপনার হয় না।

একবার আপনারে চিনতে পারলে রে যাবে অচেনারে চেনা।”

- ফকির লালন শাহ

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের সাতটি আবাসিক হাউসের মধ্যে লালন শাহ হাউস অন্যতম। ১৯৬০ সালে কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এ হাউসের ভবনটি কলেজের ‘মেডিকেল সেন্টার’ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৭৭ সালে তা আবাসিক ছাত্রাবাস হিসাবে শুভযাত্রা শুরু করে। শুরুতে এটি ‘৩নং হাউস’ নামে পরিচিত থাকলেও ১৯৭৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ মরহুম কর্নেল জিয়াউদ্দীন আহমেদ বিখ্যাত বাউল সাধক ‘লালন শাহ’ এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করেন ‘লালন শাহ হাউস’। ২০১৯ সাল থেকে হাউসটির সংস্কার কাজ শুরু হয়। গত ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মাহবুব হোসেন হাউসটির সংস্কার কাজের উদ্বোধন করেন। সংস্কার কাজ সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করেন কলেজের ও এই হাউসের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ।

পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত ও প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দ্বিতল লালন শাহ হাউসের সুপারিসর অবকাঠামো আধুনিক, দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয়। হাউসের সামনে রয়েছে তিনটি অংশে বিভক্ত চিত্তাকর্ষক গার্ডেন। শিক্ষা ভবন-১ ও অধ্যক্ষের বাস ভবনের সন্নিহিত অবস্থিত এ হাউসে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ৩১টি কক্ষ। এসব কক্ষে ১২৬ জন ছাত্রের থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষা সহায়ক পরিবেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা নিজ গৃহের মতোই এ হাউসে অবস্থান করে। ছাত্রদের অবস্থানের কক্ষ ছাড়াও এ হাউসে রয়েছে অফিস কক্ষ, মসজিদ, কমনরুম, ডাইনিং হল,

কিচেন, স্টোর ও স্টাফরুম। হাউসের ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এ ছাড়া তাঁদের সহযোগিতার জন্য রয়েছে ১০ জন কর্মচারী। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে হাউসের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেম, সততা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার জন্য হাউসে আছে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসের প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে হৃদয়তা, তেমন ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ড পরীক্ষায়ও এ হাউসের অধিককাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষা-মূলক কর্মকাণ্ডেও লালন শাহ হাউসের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। আন্তঃহাউস ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতা-২০২২, আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় ও আন্তঃহাউস ভলিবল প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন এবং আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ও আন্তঃহাউস ইনডোর গেমসে এ হাউস রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ ছাড়া মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায়ও এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। লালন শাহ হাউজ ২০২২ ইং সালে “একাডেমিক ইয়ার অফ দ্যা হাউস” (বেস্ট হাউস) নির্বাচিত হয়।

হাউস মাস্টার : রাসেল আহমেদ

হাউস টিউটর : মোঃ শফিকুল ইসলাম

হাউস এন্ডার : মোঃ মিছবাহুল হক

হাউস প্রিফেক্ট : মোঃ আবু বকর সিদ্দিক উদয়



## শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হাউস

“চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,  
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর  
আপন প্রাক্ষণতলে দিবসশর্বরী  
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি।”

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ- ২০২২ এ কলেজ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। এই কলেজের ৭টি হাউসের মধ্যে অন্যতম হলো শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হাউস। দেশ মাতৃকার অমর সন্তান, কৃষক বন্ধু, অসাধারণ বাগী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এ হাউসের প্রতিটি কাজে তাঁর দেশপ্রেম ও সুমহান আদর্শের অনিন্দ্য সুন্দর প্রকাশ ঘটে। প্রকৃতির রঙ সবুজ পতাকা মুক্ত আকাশে উড়িয়ে তার নিচে নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণির একঝাঁক ছাত্রের বসবাস। এখানে ছাত্রদের আত্মতৃপ্তির নিজের পরিবারের বন্ধনকেও যেন হার মানায়। পাশাপাশি শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল ফজলুল হক হাউসের ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ছোট বড় ২৮টি কক্ষ। এছাড়াও রয়েছে একটি কমনরুম এবং সুবিশাল ডাইনিং হল। হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এছাড়া তাদের সহযোগিতার জন্য রয়েছেন স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারওয়ান, মালি, মেট ও বাবুর্চিসহ মোট ১০ জন কর্মচারী। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতাসহ একজন সুনামগরিকের নানা রকম বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে ১০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হাউস প্রিফেক্টরিয়াল বোর্ড। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন দিতল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হাউসটিতে বর্তমানে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। “ছাত্র নং অধ্যয়নং তপঃ”

এ সংস্কৃত শ্লোকে ছাত্ররা মনে প্রাণে বিশ্বাসী। তাই কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে। ভোরবেলায় পিটি থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা প্রতিটি কাজই রুটিন মারফিক করে থাকে। এর মধ্যে তাদের পড়াশোনার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়ে থাকে সর্বাত্মে। শুধু শিক্ষামূলকই নয়, সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমেও ছাত্ররা বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ২০১৮ সালে ৫৮তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফজলুল হক হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। একই বছরে আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। করোনাকালীন ছুটির পূর্বে ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। একইসাথে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় ফজলুল হক হাউস রানার আপ হয়। আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা তাদের কৃতিত্ব অব্যাহত রাখে। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সর্বক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষনীয়। ফজলুল হক হাউসের সাফল্যের এই ধারা অব্যাহত থাকুক এটাই প্রত্যাশা। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার : মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসাইন

হাউস টিউটর : মোঃ জুবায়ের হোসেন

হাউস এন্ডার : আব্দুল্লাহ আল মামুন আকাশ

হাউস প্রিফেক্ট : মিরাজ মাহমুদ রোজ



## জসীমউদ্দীন হাউস

“কাঁচা ধানের পাতার মত কচি-মুখের মায়া,  
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।  
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,  
গা-খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।”

- জসীমউদ্দীন

পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের রূপাইয়ের মত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে ভর্তি হওয়া প্রত্যেক ছাত্র যেন একেকটি নবীন তৃণ। শিক্ষকদের স্নেহপূর্ণ পরিচর্যায়, অভিভাবকদের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় এবং কলেজের বিশাল খোলা মাঠের মুক্ত আলো-বাতাসে এই নবীন তৃণগুলো ফুলে ফুলে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামোর অপূর্ব সমন্বয়ে সমন্বিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। জনলাগ্ন থেকে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলেজের হাউসসমূহ। কলেজের ০৭টি হাউসের মধ্যে জসীমউদ্দীন হাউস নবীন সংযোজন। দিবা জুনিয়র শাখার তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা, একতা, খেলাধুলায় নৈপুণ্য অর্জন তথা সার্বিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে ২০০৮ সালে বাংলা সাহিত্যের পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের নামানুসারে এই হাউসটির নামকরণ করা হয়। ২০১৯ সালে অফিস আদেশের মাধ্যমে শিক্ষা ভবন-২ এর ২০৬ নম্বর কক্ষটিকে এ হাউসের অফিস কক্ষ হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়। হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার, একজন হাউস টিউটর ও একটি ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড।

এই হাউসের ছাত্ররা মনে প্রাণে জ্ঞানার্জনে উৎসাহী। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে থাকে। একাডেমিক সাফল্যের পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে এ হাউসের ছাত্ররা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ২০২২ সালে জসীমউদ্দীন হাউস আস্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। হাউসটি অঙ্কুর এবং কিশলয় ০২ গ্রুপেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ফুটবলের পাশাপাশি হাউসটি ব্যাডমিন্টনেও কৃতিত্বের সাথে চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখে। এছাড়া ইনডোর গেইমসে যৌথ চ্যাম্পিয়ন এবং ক্রিকেটে রানারআপ হয় হাউসটি। ২০২২ সালের সার্বিক সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ অত্র হাউস যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ হাউসের ট্রফি অর্জন করতে সক্ষম হয়। কলেজের ভাবমূর্তি উন্নয়নে জসীমউদ্দীন হাউস প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে।

একটি জাতিকে সকল ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। একটি সৃজনশীল এবং শিক্ষাবান্ধব পরিবেশই পারে ছাত্রদেরকে সুন্দর আগামীর জন্য প্রস্তুত করতে। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের জসীমউদ্দীন হাউস ছাত্রদেরকে সেই চমৎকার পরিবেশ উপহার দিতে সর্বদা চেষ্টা করে যাবে।

হাউস মাস্টার : মোঃ শাহরিয়ার কবির  
হাউস টিউটর : মোঃ রাফসানুর রহমান  
হাউস এন্ডার : আহবার রহমান  
হাউস প্রিফেক্ট : মোঃ সানজিদ রহমান



# নানাবিধ সফলতা, কার্যক্রম এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড



মোহাম্মদ নূরুন্নবী  
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ



মোঃ শাহরিয়ার কবির  
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ



## ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ: নানাবিধ সফলতা, কার্যক্রম এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

### কলেজ পরিচিতি

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ব্যস্ততম নগরীর বুকে প্রাকৃতিক পরিবেশে দৃষ্টিনন্দন এ প্রতিষ্ঠানটি 'শিক্ষা, শৃঙ্খলা, চরিত্র, সেবা এবং দেশপ্রেম' এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১৯৬০ সালের ০৬ মে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলের আদলে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম ছিল 'রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল'। পরবর্তীকালে এর নামকরণ 'ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ' করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সরাসরি পরিচালিত হলেও ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত করে। ১৯৬৫ সালে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তর করত প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস এর হাতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনাভার অর্পণ করে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় বিদ্যালয়টির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং এর স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা বহাল রাখে। ১৯৬৭ সালের ০৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা সচিবকে পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করে। অদ্যাবধি উক্ত বোর্ড অব গভর্নরসই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির আওতায় ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শিফট (ডে শিফট) চালু করা হয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভাষানে প্রায় ৬০০০ জন ছাত্র আবাসিক/অনাবাসিক হিসেবে অধ্যয়ন করছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি এ প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য ছাত্র তাদের পাঠ সম্পন্ন করে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় এবং ভালো ফলাফল অর্জন করে তারা দেশে বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাদের এ নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা তৈরি হয় কলেজের বিভিন্নমুখী শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে। কলেজের চলতি বছরের বৈচিত্র্যময় এসব কার্যক্রম ও অর্জনের এক ঝলক নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :



## শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই প্রশংসনীয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্ররা শতকরা প্রায় একশত ভাগ পাশ করে থাকে। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র বোর্ডবৃত্তি পেয়ে থাকে। নিচে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের চিত্র তুলে ধরা হলো :

### এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল-২০২২

বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের সংখ্যা	জিপিএ - ৫	জিপিএ - ৫ এর হার	পাশের হার
বিজ্ঞান	৪৫০	৪৫০	৪৩৩	৯৬.২২	১০০%
ব্যবসায় শিক্ষা	৩৬	৩৬	১৪	৩৮.৮৮	১০০%
মানবিক	৩৪	৩৩	১০	২৯.৪১	৯৭.১০%
মোট	৫২০	৫১৯	৪৫৭	৮৭.৮৮	৯৯.৮১%

### এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল-২০২২

বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের সংখ্যা	জিপিএ - ৫	জিপিএ - ৫ এর হার	পাশের হার
বিজ্ঞান	৭৭৫	৭৭৫	৭৫৫	৯৭.৪	১০০%
ব্যবসায় শিক্ষা	১০১	১০১	৯৪	৯৩.১	১০০%
মানবিক	১১০	১১০	১০২	৯২.৭	১০০%
মোট	৯৮৬	৯৮৬	৯৫১	৯৬.৪	১০০%

উল্লেখ্য এইচএসসি পরীক্ষার সার্বিক ফলাফল বিবেচনায় এ কলেজ দেশের দশটি সেরা কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

### অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ড-২০২২

শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য সময়োপযোগী বহুমুখী অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ডের বিকল্প নেই। বর্তমান অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক গৃহীত কিছু অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ড ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজকে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। নিম্নে ২০২২ সালের কিছু উন্নয়নমূলক অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরা হলো :

### সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য

\* Dhaka University Debating Society কর্তৃক আয়োজিত CTTC-DUDS উগ্রতা বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২২ এর স্কুল পর্যায়ে কলেজের বিতর্ক দল চ্যাম্পিয়ন ও কলেজ পর্যায়ে Debater of the Tournament হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

\* Xaverian Debating Club কর্তৃক আয়োজিত 3rd XDC Nationals 2022 প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে Top Independent Adjudicator হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

- \* ICARUS কর্তৃক আয়োজিত ICARUS 2nd Inter Club Asian Parliamonty Debate Championship 2022 এ অংশগ্রহণ করে এ কলেজের Debate দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- \* Harmann Gmeiner Debating Club-HGDC কর্তৃক আয়োজিত 15th HGDC Nationals-2022 এ অংশগ্রহণ করে এ কলেজের Debate দল স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- \* Notre Dame Debating Club কর্তৃক আয়োজিত 33rd NNDC Nationals-2022 এ অংশগ্রহণ করে এ কলেজের Debate দল কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র তাহমিদুল ইসলাম Debator of the Tournament হওয়ায় গৌরব অর্জন করে।
- \* ৪৯তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলায় এ কলেজের ছাত্ররা থানা পর্যায়ে ফুটবল, হ্যান্ডবল ও দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় গৌরব অর্জন করে। মহানগর পর্যায়েও উক্ত প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় গৌরব অর্জন করে।
- \* আইসিটি ডিভিশন এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Subornojyonti National Online Quiz প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এ কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র নাজিল রহমান প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- \* আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস-২০২২ এর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় জুনিয়র গ্রুপে অংশগ্রহণ করে এ কলেজের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র স্বপ্নীল সাহা এবং সিনিয়র গ্রুপে এ কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র আবতাহি নূর প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- \* অনলাইন অ্যাকাডেমিক গেইম বঙ্গবন্ধু অলিম্পিয়াড ২০২২ এ অংশগ্রহণ করে কলেজের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র বখতিয়ার আল-মুয়িয মুনেম দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

### জাতীয় পর্যায়ে অর্জিত সাফল্য

কলেজ পর্যায়ে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২' এ দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ার অনন্য গৌরব অর্জন করে ও ডিজিটাল প্রতিযোগিতায় স্কুল ক্যাটাগরিতে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ 'শেখ রাসেল পদক-২০২২'(স্বর্ণ) লাভ করে যা ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি এর হাতে তুলে দেন। এ দুটি অর্জন কলেজকে অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করেছে।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২ এর থানা পর্যায়ে যারা প্রথম হয়েছে তাদের তালিকা:

ক্র. ন.	প্রতিযোগিতার বিষয়	গ্রুপ ও শ্রেণি	ছাত্রের নাম
০১	হামদ/নাত	গ-১০ম	নাদিব রহমান অর্ক
০২	বাংলা রচনা	খ-৯ম	অনিরুদ্ধ সাচী ধ্রুব
০৩	ইংরেজি রচনা	ক-৮ম	আহনাফ মাহিব
০৪		খ-৯ম	রাসেদুল ইসলাম ইয়ন
০৫	ইংরেজি বক্তৃতা	গ-১২শ	তামহিদুল ইসলাম
০৬	রবীন্দ্র সঙ্গীত	খ-৯ম	নাহিয়ান তাসনীম প্রীত
০৭	নজরুল সঙ্গীত	ক-৮ম	রিমেল সরকার
০৮		গ-১১শ	আশফাকুর রহমান রৌদ্র
০৯	উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত	ক-৮ম	রিমেল সরকার
১০		গ-১১শ	ওয়াজিউর রহমান প্রথম
১১	লোক সঙ্গীত	ক-৮ম	রিমেল সরকার
১২		খ-৯ম	রাগীব আশরাফ ঐতিহ্য
১৩		গ-১১শ	ওয়াজিউর রহমান প্রথম

১৪	জারি গান	গ-১১শ	নাদিব রহমান অর্ক ও তার দল
১৫	নির্ধারিত বক্তৃতা ( জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ)	ক-৭ম	শিহাব আদনান অন্তর
১৬		খ-১০ম	নাফিস আহমেদ
১৭	শ্রেষ্ঠ বি,এন,সি,সি শিক্ষক	-	মো: আবু সাঈদ
১৮	শ্রেষ্ঠ বি,এন,সি,সি	-	রুদনান আহম্মদ তানজীম
১৯	শ্রেষ্ঠ বি,এন,সি,সি গ্রুপ	-	ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ
২০	শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	কলেজ	ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ
২১	শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান	কলেজ	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি
২২	শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী	কলেজ	সৌমিত্র শর্মা উৎস

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২ এর মহানগর পর্যায়ে যারা প্রথম হয়েছে তাদের তালিকা

ক্র. ন.	প্রতিযোগিতার বিষয়	গ্রুপ ও শ্রেণি	ছাত্রের/কলেজের নাম
০১.	ইংরেজি রচনা	খ-৯ম শ্রেণি	রাশেদুল ইসলাম ইয়ন
০২.	ইংরেজি বক্তৃতা	গ- ১২শ শ্রেণি	তামহিদুল ইসলাম
০৩.	শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	কলেজ	ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২ এর জাতীয় পর্যায়ে যারা প্রথম হয়েছে তাদের তালিকা

ক্র. ন.	প্রতিযোগিতার বিষয়	গ্রুপ ও শ্রেণি	ছাত্রের/কলেজের নাম
০১.	ইংরেজি রচনা	গ-১২শ শ্রেণি	তামহিদুল ইসলাম
০৩.	শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	কলেজ	ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

### আন্তর্জাতিক অর্জনসমূহ

\* Korea Digital Education Frontiers Association (KEFA) এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকার কর্তৃক আয়োজিত 12th e-ICON Global World Contest মোবাইল অ্যাপ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের পক্ষ হয়ে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ টিম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ায় গৌরব অর্জন করে। উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে একাদশ শ্রেণির ছাত্র মাহির দাইয়ান সাফওয়ান এবং দশম শ্রেণির ছাত্র মুহতাসিম মাহিম এবং তাদের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এ কলেজের আইসিটি বিভাগের প্রভাষক রাসেল আহমেদ।

\* West Field Secondary School in Toronto Canada কর্তৃক আয়োজিত Spot Admission and Scholarship -2022 প্রতিযোগিতায় ৩০৪০ টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগীদের মধ্যে হতে এ কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র আন নাফিউ প্রথম হয়ে ৭০,০০০ কানাডিয়ান ডলারের বৃত্তি অর্জন করে।

\* নেপালে অনুষ্ঠিতব্য ইন্টারন্যাশনাল আর্ট এক্সিভিশন প্রতিযোগিতায় কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র আবতাহি নূর এর আঁকা ছবি প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

\* Japan Shinkyoku Art and Research কর্তৃক আয়োজিত The 2nd Oshino Fuji Art Relay প্রতিযোগিতায় এ কলেজের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সায়ান রয় এর অঙ্কিত ছবি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়।

## কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানাদি

**আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতা ও বসন্ত বরণ উৎসব :**

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় জুনিয়র হাউসে কুদরত-ই-খুদা হাউস ও সিনিয়র হাউসের মধ্যে লালন শাহ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া বসন্ত বরণ উৎসবে কলেজের সকল শিক্ষিকা ও শিক্ষকপত্নীদের অংশগ্রহণে বসন্তবরণ উৎসব উদযাপন করা হয়।

**মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ উদযাপন :**

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২এ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল প্রত্যুষে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি এর নেতৃত্বে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে উত্তোলন, ৫২'র ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ভাষা আন্দোলনের সাথে সংগতি রেখে কবিতা, গল্প, সৃজনশীল লেখা ও চিত্রাঙ্কন করে রাসেল দেয়ালিকায় উপস্থাপন, কালো ব্যাজ ধারণ এবং কলেজের কেন্দ্রীয় মসজিদে যোহরের নামাজ বাদ শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত।

**ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ উদযাপন :**

০৭ মার্চ ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শিক্ষার্থীদের জন্য ০৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচারের আয়োজন করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে ছাত্রদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

**বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন :**

১০ মার্চ ২০২২ তারিখ কলেজের ০২ জন উপাধ্যক্ষ, ০১ জন প্রভাষক ও ০১ জন সহকারী শিক্ষক এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

**জাতির পিতার জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন :**

১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিবস এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত কর্মসূচির মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, অনলাইনে ছাত্রদের রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা এবং বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কলেজের নির্বাচিত ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

**আইসিটি ডিভিশন প্রেজেন্টস পেট্রোমেব্র এলপিজি ৫ম ডিআরএমসি ইন্টারন্যাশনাল টেক কার্নিভাল ২০২২ :**

১৮ মার্চ ২০২২ শুক্রবার 'আইসিটি ডিভিশন প্রেজেন্টস পেট্রোমেব্র এলপিজি ৫ম ডিআরএমসি ইন্টারন্যাশনাল টেক কার্নিভাল ২০২২' এর বর্ণিল উদ্বোধন ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ। তিন দিনব্যাপী এ কার্নিভালে দেশের ২৫০টি খ্যাতনামা স্কুল, কলেজের সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ২০ মার্চ ২০২২ তারিখ রবিবার বিকেল ৩:০০টায় কার্নিভালের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আমেদ পলক, এমপি এবং সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজের আইসিটি বিভাগের প্রভাষক এবং কার্নিভালের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ, সরকারি-বেসরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, অভিভাবকমণ্ডলী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। নানা আয়োজনের মধ্যে ছিলো 'রোবটিক্স ও আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স' এর উপর ওয়ার্কশপ। ওয়ার্কশপের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক ডঃ আব্দুল মান্নান, পিএএ

এবং কী-নোট স্পিকার ছিলেন কনফিগ ভিআর এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রুদমিলা নওশিন। 'বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টরে অর্জন বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ বেলায়েত হোসেন তালুকদার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ রেজাউল মাকসুদ জাহেদী। 'ডিজিটাল লিটারেসি' শীর্ষক সেমিনারের প্রধান অতিথি ছিলেন ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক মোঃ খায়রুল আমীন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাইনুল ইসলাম। ডিজিটাল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করা এবং ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নে নবীনদের উৎসাহিত করতেই এই তিন দিনব্যাপী টেক কার্নিভাল এর আয়োজন।

#### গণহত্যা দিবস উদযাপন :

২৫ মার্চ ২০২২ তারিখ এ কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদায় গণহত্যা দিবস-২০২২ উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে অত্র প্রতিষ্ঠানে মোমবাতি প্রজ্বলনসহ অন্যান্য নানা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কলেজ ক্যাম্পাসে বসবাসরত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত আলোচনাসভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ এনডিসি, পিএসসি।

#### মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন :

২৬ মার্চ ২০২২ তারিখ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন করা হয়। উক্ত কর্মসূচির মধ্যে ছিল ভোরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ছাত্রদের অনলাইনভিত্তিক চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত ও রচনা প্রতিযোগিতা। এছাড়াও কলেজ অডিটোরিয়ামে সকল ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে আয়োজন করা হয় বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের ধারণকৃত সাক্ষাতকার প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক পরিবেশনা, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের বিশেষ ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী, আলোচনা সভা ও বিশেষ মোনাজাত। উক্ত অনুষ্ঠানে কলেজের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

#### মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন :

২৬ মার্চ ২০২২ তারিখ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ছাত্রদের অনলাইনভিত্তিক চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত, রচনা, বিতর্ক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষকদের শ্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। এছাড়াও কলেজ অডিটোরিয়ামে সকল ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে আয়োজন করা হয় বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের ধারণকৃত সাক্ষাতকার প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক পরিবেশনা, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের বিশেষ ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী, আলোচনা সভা ও বিশেষ মোনাজাত। উক্ত অনুষ্ঠানে কলেজের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

#### বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০২২ :

০২ থেকে ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় এ কলেজে “বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস” উদযাপন করা হয়।

#### বাংলা নববর্ষ-১৪২৯ উদযাপন :

১৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখ বৃহস্পতিবার ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ-১৪২৯। নববর্ষের বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল অধ্যক্ষ মহোদয়ের নেতৃত্বে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে মঙ্গল শোভাযাত্রা পুরো ক্যাম্পাস পরিক্রমণ, কলেজ বটমূলে আলোচনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নববর্ষ উপলক্ষ্যে রঙ-বেরঙের পতাকা, বেলুন, ফেস্টুন, ব্যানার ইত্যাদি দ্বারা নয়নাভিরাম সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল কলেজ প্রাঙ্গণ। সবুজ-শ্যামলিমায় সুবিশাল ক্যাম্পাস হয়ে উঠেছিল নান্দনিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। মনমাতানো গানের তালে তালে আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠেছিল সবাই।

নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি।

#### যানজট নিরসন সংক্রান্ত সেমিনার :

১৭ মে ২০২২ তারিখে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত অত্র কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদেরকে নিয়ে যানজট নিরসন সংক্রান্ত সচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

#### Seminar on Higher Studies Guideline :

৩১ মে ২০২২ তারিখে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদেরকে নিয়ে ঐরম্যবৎ বাঁফরবৎ ঐরফবষরহব সংক্রান্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

#### আন্তঃশ্রেণি ফুটবল প্রতিযোগিতা :

২৮ মে থেকে ০২ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত কলেজ মাঠে আন্তঃশ্রেণি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

#### বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ :

০৫ জুন ২০২২ তারিখে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও একই সঙ্গে ক্যাম্পাস চত্বরে বৃক্ষ রোপণ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। পরিবেশ দিবসের পোস্টার ফেস্টুন নিয়ে র্যালি বের করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। র্যালি শেষে কলেজ ক্যাম্পাসে বিভিন্ন বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়। পরে কলেজ অডিটরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় পরিবেশ সংক্রান্ত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন, রচনা, বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

#### আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতা :

০৫ জুন ২০২২ থেকে ০৮ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত কলেজ মাঠে আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় জুনিয়র উইংয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় জসীমউদ্দীন হাউস ও সিনিয়র উইংয়ে চ্যাম্পিয়ন লালন শাহ হাউস।

#### বিশ্ব পরিবেশ দিবসের পুরস্কার প্রদান :

০৪ জুলাই ২০২২ তারিখে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও একই সঙ্গে ক্যাম্পাস চত্বরে বৃক্ষ রোপণ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। পরিবেশ দিবসের পোস্টার ফেস্টুন নিয়ে র্যালি বের করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। র্যালি শেষে কলেজ ক্যাম্পাসে বিভিন্ন বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়। পরে কলেজ অডিটরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় পরিবেশ সংক্রান্ত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন, রচনা, বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

#### জাতীয় শোক দিবস পালন :

১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কলেজে দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণ, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং অনলাইনে ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ লেখা ও ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা।

#### আন্তঃহাউস ক্যারম, দাবা ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা আয়োজন :

২৮ আগস্ট ২০২২ থেকে ০২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত কলেজে আন্তঃহাউস ক্যারম, দাবা ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

### “শেখ রাসেল পদক-২০২২” গ্রহণ ও “শেখ রাসেল দিবস” উদযাপন অনুষ্ঠান :

১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ডিজিটাল স্কুল ক্যাটাগরিতে “শেখ রাসেল পদক-২০২২” লাভ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি এর ভারুয়াল উপস্থিতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, এমপি এর নিকট থেকে কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি ১৮ অক্টোবর ২০২২ শেখ রাসেল দিবসে এই পদক গ্রহণ করেন।

জাতীয়ভাবে দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে “শেখ রাসেল, নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক” প্রতিপাদ্যে যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে শেখ রাসেল দিবস উদযাপনে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। জাতীয় কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে কলেজ অডিটরিয়ামে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল, শেখ রাসেল দেয়ালিকায় গল্প, কবিতা, সৃষ্টিশীল লেখা ও ছবি প্রদর্শন এবং শহিদ শেখ রাসেলের স্মরণে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

### 8th Marks Active School Artsy Overlap 2022:

২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ বুধবার ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের রেমিয়ানস আর্ট ক্লাব আয়োজিত চারদিনব্যাপি ‘8th Marks Active School Artsy Overlap 2022’ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সম্মানিত সচিব ও কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশের ক্যাডেট কলেজসহ বিভিন্ন খ্যাতনামা স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও এ কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

### মাদক বিরোধী সেমিনার :

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ সমাজসেবা ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত একটি মাদক বিরোধী সেমিনার কলেজ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির দ্বিতীয় (২য়) সভার সিদ্ধান্ত ৪ (১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উক্ত সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় ১০০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ সমাজসেবা ক্লাবের মডারেটর ও ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মো. খায়রুজ্জামান। অনুষ্ঠানে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক মো. জাহাঙ্গীর আলম শিক্ষার্থীদের মাদক বিরোধী শপথ বাক্য পাঠ করান। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি।

### মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক ‘লালজমিন’ মঞ্চায়ন :

১২ নভেম্বর ২০২২ ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২ এ কলেজ কলেজ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া ও ডিজিটাল স্কুল ক্যাটাগরিতে শেখ রাসেল স্বর্ণপদক-২০২২ অর্জন উপলক্ষ্যে রাত ৬:০০টায় এক সামাজিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। এ সামাজিক সন্ধ্যায় মোমেনা চৌধুরী অভিনীত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক ‘লালজমিন’ মঞ্চায়িত হয়। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে জানা এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নাটকটি মঞ্চায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজেই এই নাটক মঞ্চায়নের সূচনা হয়। নাটকটি মঞ্চায়নের শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সম্মানিত সচিব এবং কলেজের বোর্ড অব গভর্নরসের সভাপতি জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক। অনুষ্ঠানে কলেজের বোর্ড অব গভর্নরসের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



**বাইরের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে সহযোগিতা প্রদান :**

ক্লাসের ফাঁকে বই মেলায় আয়োজন ;

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ক্লাসের ফাঁকে বই মেলা গত ২৭ আগস্ট ২০২২ থেকে ০১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়।

**ট্যালেন্ট ট্যুরিস্ট কম্পিটিশন ২০২২-২০২৩ এর আয়োজন :**

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ‘লুক অ্যাট বাংলাদেশ’ আয়োজিত ‘ট্যালেন্ট ট্যুরিস্ট কম্পিটিশন ২০২২-২০২৩’ ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ কলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মেজবাহ উদ্দিন, মাননীয় সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, অতিরিক্ত সচিব ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি এবং সভাপতিত্ব করেন ভ্রমণ বিষয়ক সংগঠন ‘লুক অ্যাট বাংলাদেশ’ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি লায়ন আমিনুল ইসলাম শামীম। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে সরকারি-বেসরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

**জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ৪৯তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২২ :**

জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক ৪৯তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২২ গত ০৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ মাঠে আয়োজন করা হয়।

### কলেজের সাম্প্রতিক উন্নয়নমূলক ও বিবিধ কর্মকাণ্ড

- \* প্রশাসন ভবন সংলগ্ন গার্ডেনের গার্ডেন লাইট শেডগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে।
- \* উপাধ্যক্ষ বাংলোর প্রবেশ পথে দুটি এসএস গেইট তৈরি করা হয়েছে এবং উত্তর দিকে ০১টি বারান্দা তৈরি করা হয়েছে।
- \* টিচার্স কোয়ার্টার-১এ ০১টি কলাপসিবল গেইট স্থাপন করা হয়েছে এবং ১/এ ও ১/সি নম্বর বাসায় সংস্কার কাজ হয়েছে। টিচার্স কোয়ার্টার-৩ এর ছাদের অর্ধেক অংশের জলছাদ ড্যাম্প প্রুফ ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে। টিচার্স কোয়ার্টার-৪, টিচার্স কোয়ার্টার-৫ এর ৫/সি নম্বর বাসা ও স্বপ্ননীড় টিচার্স কোয়ার্টারের ০৪নং ও ০৫ নম্বর সংস্কার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। স্বপ্ননীড় টিচার্স কোয়ার্টারের ১, ২, ৩ ও ৮ নম্বর বাসার ড্যাম ওয়ালগুলোতে ওয়াল টাইলস করা হয়েছে।
- \* কুদরত-ই-খুদা হাউসের ডাইনিং টেবিলের ফরমিকা পরিবর্তন করা হয়েছে। জয়নুল আবেদিন হাউসের হাউস মাস্টারের বাসা এবং ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাউসের হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটরের বাসা সংস্কার করা হয়েছে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাউসের জন্য ০১টি এমএস ফ্রেম, এসএস শিট দিয়ে পরোটা বানানোর টেবিল তৈরি করা হয়েছে। ফজলুল হক হাউসের ডাইনিং বেঞ্চের টপ পরিবর্তন করা হয়েছে। লালন শাহ হাউস সংলগ্ন এলটি মিটার এবং ৪নং আবাসিক কোয়ার্টারের সামনের এলটি মিটার দুটি নষ্ট হওয়ায় নতুন এলটি মিটার সংযোগ করা হয়েছে। ফজলুল হক হাউসের পানির রিজার্ভ ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।
- \* শিক্ষাভবন-২ এর পশ্চিম দিকে ইট বিছানো রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষাভবন-৩ এ ০১টি ক্লাসরুম, ১১টি লেকচার স্ট্যান্ড ও ০১টি টেবিল তৈরি করা হয়েছে। সেখানে অফিসরুমে এসি স্থাপন করা হয়েছে।
- \* মসজিদের ইমাম সাহেবের কোয়ার্টারের ০১টি নতুন রুম তৈরি করা হয়েছে। মসজিদের খিল রং করা হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকে পার্কিং এ যাওয়ার জন্য সোলিং রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

\* কলেজের পূর্ব দিকের বাউন্ডারি ওয়ালে ওয়েদার কোট করা হয়েছে এবং পশ্চিম গেইট সংলগ্ন স্থানে জিআই নেট দিয়ে বাউন্ডারি তৈরি করা হয়েছে।

\* অডিটরিয়ামের ফলস সিলিং মেরামত করা হয়েছে এবং ০২টি মিক্সার মেশিন/কনসোল মেশিন ঠিক করা হয়েছে।

\* তায়কোয়ান্দো সেড সংলগ্ন ব্যাচেলর স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যাপক জনবলসমৃদ্ধ দেশের সর্ববৃহৎ স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজ শক্তিশালী বোর্ড অব গভর্নরসের তত্ত্বাবধানে সুযোগ্য অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি, পিএসসি এর বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে এর চৌকস, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিরলস চেষ্টা, শ্রম ও কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ২০২২ সালে অ্যাকাডেমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম উভয় দিক থেকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষে অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছে। আগামীতেও কলেজের এ অবস্থান ধরে রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলেই নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে যাবে এটাই আমাদের অতীষ্ট লক্ষ্য।

SUCCESS  
STORIES



# জাতীয় শিক্ষা সম্ভাৱ ও শ্রেষ্ঠ কলেজ



## 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ' ও 'শ্রেষ্ঠ কলেজ'

২০২২ সালে 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে' ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ সমস্ত দেশের মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ কলেজ' হিসেবে নির্বাচিত হয়। এটি একটি অনন্য অসাধারণ অর্জন। এই অর্জনের পেছনে রয়েছে অনেক শ্রম, আছে ত্যাগ, আছে মেধার পরিচয়। অনেকগুলো পথ পেরিয়ে এই কলেজকে শ্রেষ্ঠ কলেজ হতে হয়েছে।

এই প্রতিযোগিতাটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে প্রতিযোগিতাটি সম্পন্ন করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এই মানদণ্ডগুলোর প্রত্যেকটির বিপরীতে নম্বর বণ্টন করা থাকে। মানদণ্ডগুলো নিম্নরূপ-

মানদণ্ড	নম্বর
১। পাশের শতকরা হার	২০
২। পাশ করা ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	১০
৩। প্রতিষ্ঠানের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫
৫। কর্মরত শিক্ষকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার মানের গড়	৫
৪। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত	১৫
৬। ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা	৫
৭। প্রশাসনিক ও আর্থিক শৃঙ্খলা	৫
৮। জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন	৫
৯। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের জন্য সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা	৫
১০। গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার	৫
১১। পঠন-পাঠনের নিয়মানুবর্তিতা, খেলাধুলা ও সহপাঠক্রম ব্যবস্থা	৫
১২। শিক্ষার পরিবেশ	৫
১৩। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম/কম্পিউটার ল্যাব	৫
১৪। প্রতিষ্ঠানে স্কাউট গার্লস গাইড/রোভার/বি. এন. সি. সি/ যুব রেড ক্রিসেন্ট ইত্যাদির কার্যক্রম থাকা	৫

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আলোচ্য মানদণ্ড অনুযায়ী প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পারদর্শিতার পরিচয় দিতে হয়। আমরাও দেখিয়েছি। আমাদের কখনো বিভিন্ন পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল দেখাতে হয়েছে; কখনো প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর বিভিন্ন নমুনার প্রমাণ দেখাতে হয়েছে; কখনো শিক্ষার্থীদের কার্যক্রমকে তুলে নিয়ে আসতে হয়েছে; কখনোবা প্রাতিষ্ঠানিক নানামুখী কার্যক্রমকে প্রমাণসহ উপস্থাপন করতে হয়েছে।

'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ' প্রতিযোগিতার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় থানা/উপজেলা পর্যায়ে। মোহাম্মদপুর থানা থেকে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ উপর্যুক্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে 'শ্রেষ্ঠ কলেজ' হিসেবে নির্বাচিত হয়। এরপর এই প্রতিযোগিতাটিতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা থানা/উপজেলাকে একটি করে কলেজ শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে জেলা পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। জেলা পর্যায়ের বিজয়ীরা অঞ্চলে/বিভাগে এবং অঞ্চল পর্যায়ের বিজয়ীরা ও ঢাকা মহানগরীর বিজয়ীরা জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে বিবেচিত হয়। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ এই এতগুলো পথ অতিক্রম করে সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

সত্যি কথা বলতে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের যে ভৌত অবকাঠামো, তা বাংলাদেশের খুব কম কলেজেরই রয়েছে। সবুজের চাদরে ঘেরা সুবিশাল এই কলেজের চত্বরে বেড়ে ওঠা ছাত্ররাও লেখাপড়ার পাশাপাশি তাই সৃজনশীল মেধা ও মননের সমন্বয়ে বেড়ে ওঠে। এখানে লেখাপড়ার পাশাপাশি সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেয়া হয়। শুধু গুরুত্ব দেয়া নয়, ১৮টি ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তা চর্চাও করা হয়। বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষা এবং বৃত্তি পরীক্ষায় যেভাবে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ভালো ফলাফল করে, তা এই কলেজের দক্ষ শিক্ষক পরিবার এবং সুগঠিত প্রশাসনিক কাঠামোকেই প্রমাণিত করে। এখান থেকে পাশ করে বেড়িয়ে যাওয়া রেমিয়ানরা যোগ্য নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে দেশ গড়াসহ বিভিন্নভাবে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ শুধু শিক্ষাদানই করে না, দীক্ষাও প্রদান করে। আর তাই তো প্রতি বছর নতুন করে এ কলেজের জয়মুকুটে নতুন নতুন পালক যুক্ত হয়, যা এ প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতিনিয়ত এক অনন্য মর্যাদা দান করে চলেছে। নতুন নতুন সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাক ডিআরএমসি। জয়তু ডিআরএমসি।

## ড. রুমানা আফরোজ

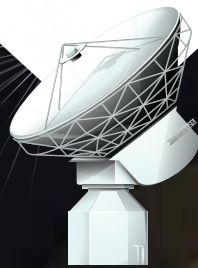
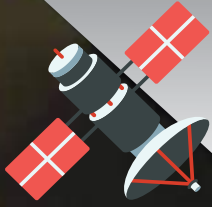
সহকারী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ (প্রভাতি শাখা)

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য সেবা পুরস্কার-২০২২

ও  
স্বাস্থ্য ডিজিটাল স্কুল



## ‘শেখ রাসেল পদক-২০২২’ ও সেরা ডিজিটাল স্কুল

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল ১৮ অক্টোবর, ১৯৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিবছর ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস পালনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কর্ণধার তথা বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থী/শিশু-কিশোরদেরকে উন্নত বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে তাদের মাঝে শেখ রাসেলের স্মৃতি অম্লান থাকবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ‘শেখ রাসেল দিবস’-কে ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিবছর ‘শেখ রাসেল পদক’ প্রদান করার নিমিত্তে ‘শেখ রাসেল পদক নীতিমালা ২০২২’ প্রণয়ন করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মোট ২০ জন সচিবের সমন্বয়ে তৈরি একটি কমিটি সমস্ত দেশের আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তিনটি সেরা প্রতিষ্ঠান মনোনয়নের সুপারিশসহ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কাছে প্রেরণ করেন। মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনায় জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রতিষ্ঠান চূড়ান্তভাবে বাছাই করার পর তা অনুমোদনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন ‘সেরা ডিজিটাল স্কুল’ ঘোষণা করেন।

এভাবেই এই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ‘শেখ রাসেল পদক-২০২২’ এ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ‘ডিজিটাল স্কুল’ ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। দখল করে নেয় সেরা স্থানটি। এ এক বিরল অর্জন সেরা ‘ডিজিটাল স্কুল’ মূল্যায়নের মাপকাঠি ছিল নিম্নরূপ-

ক্রমিক নম্বর	মূল্যায়নের মাপকাঠি	নম্বর	
১	স্কুলে বিদ্যমান শিক্ষার্থী ও ডিজিটাল রিসোর্স, যেমন: শিক্ষার্থী/কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর/ক্লাস, প্রিন্টার, ওয়েবক্যাম ইত্যাদি।	স্কুলের সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫
		প্রতিজন শিক্ষার্থী সপ্তাহে গড়ে কত ঘণ্টা ডিজিটাল রিসোর্স (যেমন কম্পিউটার, ইন্টারনেট) ব্যবহার করে।	৫
		কতটি শ্রেণিকক্ষের জন্য গড়ে একটি করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বা সমজাতীয় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার হয়ে থাকে।	৫
		ডিজিটাল রিসোর্সসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত কার্যক্রম ও নিয়োজিত লোকের সংখ্যা (যেমন: ল্যাব অ্যাটেন্ডেন্ট)	৫
		বছরে গড়ে কতবার সাইবার নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ, কর্মসূচি ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	৫
		বছরে প্রোগ্রামিং/আইটি/ ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ক গড়ে কতগুলো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।	৫
২	প্রতিষ্ঠানটির হালনাগাদকৃত নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে কিনা? (প্রমাণকসহ)	১০	
৩	স্কুল পরিচালনায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার	১০	
৪	আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা (প্রমাণকসহ)	১০	
৫	পাঠদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ডিজিটাল কনটেন্টের সংখ্যা	১০	
৬	স্কুল কর্তৃপক্ষ কেন মনে করেন যে তাদের স্কুলটি একটি ডিজিটাল স্কুল (অনধিক ৫০০ শব্দ)	১০	
৭	স্কুলের শিক্ষার্থী বা শিক্ষক কর্তৃক ডিজিটাল কার্যক্রমের জন্য স্বীকৃতি বা অর্জন	১০	

৮	<p>সিটি কর্পোরেশন, সদর উপজেলা এবং সদর পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রোগ্রামার (জেলা আইসিটি অফিসার) কর্তৃক প্রদেয় ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরকৃত এবং অন্যান্য উপজেলার ক্ষেত্রে সহকারী প্রোগ্রামার (উপজেলা আইসিটি অফিসার) কর্তৃক প্রদেয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরকৃত সুপারিশপত্র। সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে:</p> <p>-প্রতিজন শিক্ষার্থী সপ্তাহে গড়ে কত ঘণ্টা ডিজিটাল রিসোর্স (যেমন: কম্পিউটার, ইন্টারনেট) ব্যবহার করে।</p> <p>-কতটি শ্রেণিকক্ষের জন্য গড়ে অন্তত একটি করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বা সমজাতীয় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার হয়ে থাকে।</p> <p>-কতটি সাইবার নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ, কর্মসূচি, সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>-বছরে প্রোগ্রামিং/আইটি/ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ক গড়ে কতগুলো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।</p> <p>-আইটি ক্লাব, প্রোগ্রামিং ক্লাব, ডিজিটাল ক্লাব আছে কিনা।</p>	১০
মোট		১০০

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ বাংলাদেশের স্বনামধন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত ডিজিটাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 'শেখ রাসেল পদক -২০২২' এ 'ডিজিটাল স্কুল' ক্যাটাগরিতে এই প্রতিষ্ঠানের পদক প্রাপ্তিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। -

- \* ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণালগ্ন থেকেই কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রম ডিজিটাল মাধ্যমে করা শুরু হয়েছে।
- \* একে একে কলেজ ওয়েবসাইট, অনলাইন রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস, স্মার্ট ক্লাসরুম, সিসি ক্যামেরা, অ্যাকসেস কন্ট্রোল সিস্টেম, সাউন্ড সিস্টেমসহ অত্যাধুনিক সকল প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছে।
- \* ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ সবসময় প্রকাশিত সকল নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করে শিক্ষকগণকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে (সরকারি, বেসরকারি বা ইনহাউস ট্রেনিং) এবং শ্রেণিকক্ষে তা বাস্তবায়ন আরম্ভ করে।
- \* কলেজের অনেক দক্ষ শিক্ষক কেবল নিজ প্রতিষ্ঠানেই নয়, জাতীয়ভাবে বিভিন্ন সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে (টিচার্স ট্রেনিং কলেজ) এবং বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে আইসিটির মাস্টার ট্রেনার হিসেবে কাজ করে থাকেন।
- \* কলেজের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে একটি করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করা হয়।
- \* প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের জন্য সাউন্ড সিস্টেমসহ মাইক্রোফোন রয়েছে।
- ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য শিক্ষাভবন-১ এ দুইটি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' শিক্ষাভবন-২ এ একটি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' এবং শিক্ষাভবন-৩ এ একটি 'কয়িকা ল্যাব' রয়েছে।
- \* ছাত্রদের বিশেষ ক্লাস নেয়ার জন্য একটি স্মার্ট বোর্ড সংযুক্ত শ্রেণিকক্ষ রয়েছে।
- \* জীববিজ্ঞান ল্যাব, পদার্থবিজ্ঞান ল্যাব, রসায়ন ও ভূগোল ল্যাবে ০১টি করে ডেস্কটপ এবং ০১টি করে প্রিন্টার রয়েছে, যেখানে ছাত্রদের ব্যবহারিক সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।
- \* শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং কয়িকা ল্যাবে ৪৫ টি ডেস্কটপ, ৪৭টি ল্যাপটপ, ৯টি প্রিন্টার, ৪টি স্ক্যানার এবং ১টি থ্রিডি প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়।
- \* এই কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া ২০০৯ সাল থেকেই অনলাইনের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। এতে রয়েছে অনলাইনে ভর্তি আবেদন, অনলাইন আবেদন ফি, অনলাইন শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
- \* কলেজের সকল কার্যক্রমকে ২৭টি মডিউলে বিভক্ত করে একটি বৃহৎ কলেজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি করা হয়।
- \* এ কলেজে অনলাইনে রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেম, অনলাইন প্রশ্ন ব্যবস্থাপনা, কর্মী নিয়োগ ব্যবস্থাপনা, এইচ আর, ইনভেন্টরি, শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপনা, ভর্তি ব্যবস্থাপনা, কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট একাউন্টসসহ সবকিছু সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

- \* পরীক্ষা ব্যতীত কলেজের প্রায় সকল কাজই প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে ।
  - \* এছাড়া কলেজের রয়েছে একটি ডাইনামিক ওয়েবসাইট, যাতে শিক্ষক - শিক্ষার্থী ও অভিভাবক লগইন করে প্রত্যেকেই তাঁর নিজের কাজ সম্পন্ন করতে পারে ।
  - \* বিশেষ করে কলেজে শিক্ষার্থীদের বেতন-ফি প্রদান সম্পূর্ণ অনলাইন করা হয়েছে। অভিভাবকগণ বাংলাদেশের যেকোনো ব্যাংক, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং -এর মাধ্যমে খুব সহজেই একটি পোর্টালের মাধ্যমে স্বল্প খরচে পরিশোধ করতে পারেন। এতে করে অভিভাবকগণ কোনো রকম বিরক্তি ও কষ্ট ছাড়াই বেতন-ফি পরিশোধ করে থাকেন।
  - \* করোনাকালীন কলেজের নিয়মিত সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে।
  - \* রুটিন অনুযায়ী সকল শ্রেণির সকল ক্লাস নেয়া, ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সকল পরীক্ষা গ্রহণ, কলেজের ১৮ টি ক্লাবের কো-কারিকুলার কার্যক্রম (যেমন- মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনির সদয় উপস্থিতিতে 'ডিআরএমসি মেগা ফেস্টিভাল' এর আয়োজন) চালু রাখাসহ কলেজের সকল কার্যক্রম চালু ছিল।
  - \* এছাড়াও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল ডিভাইস সহজ কিস্তিতে দেয়া হয়েছে, যাতে করে কোনো শিক্ষার্থীই অনলাইনে ক্লাস, পরীক্ষা বা কোনো কো-কারিকুলার কার্যক্রম থেকে বাদ না পাবে।
  - \* এ কলেজের রয়েছে একটি নিজস্ব ডিজিটাল অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার, যা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালনা করা যায়। অ্যাপটিতে অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারের পাশাপাশি রয়েছে সকল শ্রেণির সিলেবাস, রুটিন এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য মোবাইল নম্বর।
  - \* এছাড়াও এ কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষের পরিচালনায় রয়েছে 'Report to Principal DRMC' নামে একটি ফেসবুক গ্রুপ, যেখানে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের সার্বক্ষণিক মতবিনিময়ের ব্যবস্থা রয়েছে।
  - \* আরও আছে মেসেঞ্জারে 'DRMC Official Group', 'Class teachers group', 'Teacher's center group'। এসব গ্রুপের মাধ্যমে শিক্ষকগণ এবং প্রশাসনের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষিত হয়।
  - \* এছাড়াও এই কলেজের প্রতিটি ক্লাসের প্রতিটি শাখার রয়েছে নিজস্ব মেসেঞ্জার ও Whatsapp group, যেখানে শ্রেণিশিক্ষক এবং বিষয়শিক্ষকগণ যুক্ত আছেন। এর মাধ্যমে যে কোনো সময় যেকোনো তথ্য, নোটিশ এবং পড়ালেখা সংক্রান্ত কোনো বিষয় ছাত্র-শিক্ষক সবাই জানতে পারে।
  - \* এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শিক্ষক নিয়মিত mmc-তে ক্লাস রিপোর্ট করেন। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষকেরই ইউটিউব চ্যানেলে ক্লাস আপলোড করা হয়েছে।
  - \* অধিকাংশ শিক্ষক 'শিক্ষক বাতায়নে'র সদস্য এবং অনেকেই 'শিক্ষক বাতায়নে' কনটেন্ট আপলোড করেন।
- ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো বিদ্যমান থাকায় এ প্রতিযোগিতার মানদণ্ডগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া ও আমাদের মান্যবর অধ্যক্ষ মহোদয়ের সুচিন্তিত ও বিজ্ঞ উপস্থাপনার সার্বিক বিচারে কর্তৃপক্ষ সারা দেশের মধ্যে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ডিজিটাল স্কুল' ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে শেখ রাসেল স্বর্ণপদক লাভ করে, যা বিগত ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা কলেজের অধ্যক্ষ স্যারের হাতে তুলে দেন। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তখনই দেশ গড়ার কারিগর তৈরিতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে, যখন তার অবকাঠামোগত এবং অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকে। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ সেই পরিবেশ তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। আর তাই তো আমরা সেরাদের সেরা।

## গ্রন্থনা ও সম্পাদনায়

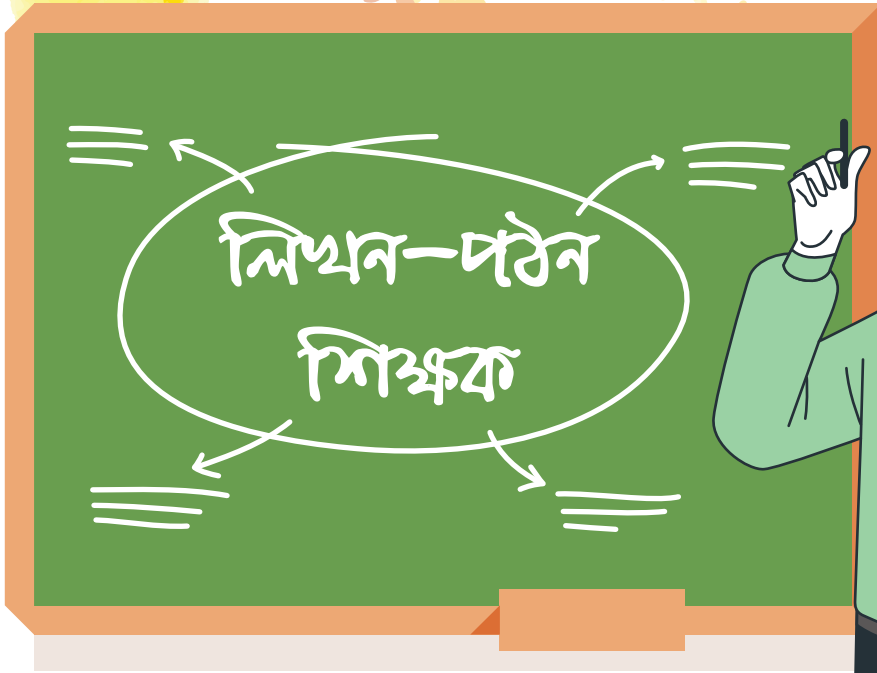


মোহাম্মদ নূরুলহুদী  
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ



ড. রুমানা আফরোজ  
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ







ব্রিগেডিয়ার জেনারেল  
কাজী শামীম ফরহাদ  
অধ্যক্ষ

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ



## ১৯৭১- এ ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

দেশের অন্যতম সেরা বিদ্যাপিঠ আমাদের ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। এর ঐতিহ্য আর গুণগত মান একে করেছে অনন্য। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে এ কলেজের সূর্য সন্তানেরা যেভাবে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন দেশের নতুন প্রজন্মের কাছে তা' তুলে ধরতেই এই প্রয়াশ। তখনকার সময়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের দুর্বিসহ জীবন আর আমাদের ছাত্রদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ফুটে উঠেছে এ লেখার পরতে পরতে। আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম তাঁদের পূর্বসূরীদের কীর্তিগাথা জেনে দেশপ্রেমে মহান আদর্শে আরো বলিয়ান হবে।

১৯৭১-এর মার্চ মাস। প্রকৃতি সেজে আছে বসন্তের রঙিন সাজে কিন্তু হঠাৎই সবুজে ঘেরা সোনার বাংলায় কারা যেন মুঠো মুঠো ধূসরতা ছড়িয়ে দিলো। থেমে গেল কোকিলের গান, দল বেধে নেমে এলো শকুন। মুহূর্তেই পুরো দেশটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকেই উদিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নতুন সূর্য। বিশ্বের ইতিহাসে গণহত্যার সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যে নতুন ইতিহাস রচনা করেছিল বাংলাদেশ এর একটি উল্লেখযোগ্য সাক্ষী তৎকালীন রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, ঢাকা সংক্ষেপে RMS (বর্তমানের ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ)।

২৫ শে মার্চ গভীর রাতে দানবের মতো চিৎকার করতে করতে শহরের বুকে যে জলপাইয়ের রঙের ট্যাঙ্ক এসেছিল তার আওয়াজে ঢাকা রেসিডেন্সিয়ালে মডেল কলেজও কেঁপে উঠেছিল। কলেজে বসবাসরত সকলের হঠাৎ ঘুম ভাঙে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ আর কলেজের সীমানা দেওয়ালের বাইরে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে। নিমিষেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো ক্যাম্পাসে। কী হচ্ছে কেউ যেন বুঝে উঠতে পারছেন না। মোহাম্মদপুর এলাকা তখন পাকিস্তানি অবাঙালি অধ্যুষিত। আর ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ পাকিস্তানি অবাঙালি পরিবেষ্টিত। সে রাতে গুলির আওয়াজ আর তাদের উল্লাস যেন স্তব্ধ করে দিয়েছিল মোহাম্মদপুরবাসীকে। রাতেই কার্যু জারি

করা হয়। নির্ধুম রাত কাটে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত সকলের। ২৬ মার্চ সকালে মোহাম্মদপুর এলাকার কয়েকশত বাঙালি আশ্রয় নেয় ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ প্রাঙ্গণে। রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ ফেরদৌস আরা বেগমের 'স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ' শিরোনামের লেখাটি থেকে জানা যায়, বর্তমান কুদরত-ই-খুদা হাউসের (তখনকার জিন্নাহ হাউস) তৎকালীন হাউস মাস্টার শাহ মোহাম্মদ জহুরুল হক হাউসের তালা খুলে বের করে দেন চাল ডাল। স্টাফদের সহযোগিতায় খিচুড়ি রান্না করে আশ্রয় নেয়া বাঙালিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। শিক্ষকরা পরিবার পরিজনসহ কলেজ বিল্ডিং এ আশ্রয় নেন। শ্রেনিকক্ষে, বারান্দায় অথবা শিক্ষক কক্ষে পরিবার পরিজনসহ অবর্ণনীয় দুর্দশার রাত কাটান। কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ অবস্থান করেছেন নিজ নিজ বাসগৃহে।

আজকের কুদরত-ই-খুদা হাউস পরিণত হয় বাঙালি শরণার্থী শিবিরে। ২৭ মার্চ সকাল ৮ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত কার্যু তুলে নেওয়া হয়। আশ্রিতরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে যান। কলেজ অরক্ষিত হয়ে যাবে ভেবে কলেজের অধ্যক্ষ কাজী নুরুল হক এবং উপাধ্যক্ষ কাজী আজিজুর রহমান কলেজেই অবস্থান করেন। সময় বয়ে যাচ্ছে একরাশ শঙ্কা আর অস্থিরতা নিয়ে। ভয়ে সকলেই মোহাম্মদপুর বাজারে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। নিতান্ত জরুরি প্রয়োজনে কলেজের পূর্ব দিকের গেট দিয়ে বের হয়ে নিউমার্কেট থেকে কেনাকাটা সারেন।

কলেজের কয়েকজন অকুতোভয় শিক্ষক রসায়ন ল্যাব-এ দেশীয় ককটেল বানিয়ে বর্তমান অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং-০১ এর পশ্চিম পার্শ্বের সিড়ির উপরের ছোট্ট কুঠুরিতে জমাতে শুরু করলেন। যদি অবাঙালিরা ক্যাম্পাস আক্রমণ করে তবে আত্মরক্ষার জন্য। সিড়ির গোড়ায় ভাঙ্গা চেয়ার দিয়ে উপরে ওঠা বন্ধ রাখা হয়, যেন কেউ বুঝতে না পারে। কিন্তু কি করে জানি বিষয়টা বাইরে জানাজানি হয়ে যায়। পাক বাহিনীর একটা দল কলেজে

এসে সেই ককটেল জন্ম করে। শিক্ষকদের মধ্যে ফিরোজ স্যার, জব্বার স্যার, আতাউল হক স্যারদের তারা সন্দেহ করে সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তাদের পরিবারে কান্নার রোল পরে যায়। তবে, ভাগ্য ভালো এক তরুন পাক ক্যাপ্টেন এর চোখে পরে ধৃত স্যাররা। তিনি তার সহকর্মীদের বোঝান, উনি নিজেই এই স্যারদের ছাত্র। এর সবাই সাচ্চা মুসলমান। তরুন ক্যাপ্টেন এর সেদিনকার নিজ শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা আর কলেজের প্রতি কৃতজ্ঞতার কারণে আটককৃত শিক্ষকদের পাক সেনারা ছেড়ে দেয়।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পুরো স্কুল ভবন জুড়ে আর্মি ক্যাম্প স্থাপিত হয়। কলেজের অভ্যন্তরে অবস্থানকারীদের জন্য সে এক বিভীষিকাময় সময়। একান্ত বাধ্য না হলে কেউ ঘর থেকে বের হয় না, কিশোররা মাঠে খেলতে ভয় পায়। এক সপ্তাহ পরেই অবশ্য আর্মিরা ক্যাম্প গুটিয়ে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে চলে যায়। পুরো দেশটার সাথে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজেও তখন মৃত্যুকূপ। ভয় আর শঙ্কা নিয়ে দুর্বিষহ দিন যাপন করছিলেন ক্যাম্পাসবাসী।

এই সময়ে ক্যাম্পাসে এলো এক মর্মান্তিক সংবাদ। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে প্রথম অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ মনজুর রহমান (১৯৬১- ১৯৬৪), (কর্নেল এম এম রহমান নামে তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন) তখন বিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ। প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণকে নিজের নিরাপত্তার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন নিবেদিত প্রাণ এই অধ্যক্ষ। কলেজের অভ্যন্তরে অবস্থান করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় অধ্যক্ষ কর্নেল এম এম রহমান পরিবার পরিজনকে পাঠিয়ে দেন সম্ভাব্য নিরাপদ আশ্রয়ে। শুভাখীরা তাঁকেও পরামর্শ দিয়েছেন কলেজ ত্যাগ করার জন্য। তিনি শোনেননি। পালিয়ে বাঁচার চেয়ে কর্তব্য বড়। প্রতিষ্ঠানটি যে তার সন্তানের মত। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে একেও মূলত গড়ে তুলেছিলেন তিনি। একাত্তরের ১৮ এপ্রিল বর্বর পাকিস্তানি সৈনিকরা প্রবেশ করে বিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে। অধ্যক্ষের বাসভবনের সামনে নৃশংসভাবে তারা খুন করে কর্নেল এম এম রহমানকে। শিক্ষক আব্দুল হালিম ছিলেন তাঁর সাথে। তাঁকেও হত্যা করে ঘাতকেরা। মুক্তিযুদ্ধের অগণিত শহীদের আত্মার সাথে शामिल হয়ে যান তাঁরা দুজন। তিন দিন তাঁদের লাশ পড়ে ছিল বাড়ির আঙ্গিনায়। ভয়ে কেউ স্পর্শ করেনি। আজও ঐ সময়ের শিক্ষক এবং ছাত্ররা নিঃস্বার্থ ও নিবেদিত প্রাণ এই শিক্ষাবিদের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম তার 'সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে আটাশ বছর' বইতে লিখেছেন,

“মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে উর্দুভাষী বিহারী মুসলমানরা বিনা দ্বিধাতেই পাকিস্তানকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের অনেক যুবক রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়। বিশেষ করে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে পাক কর্তৃপক্ষ তাদের মধ্যে প্রচুর অস্ত্র বিতরণ করে।” এদিকে মোহাম্মদপুর এলাকার পাকিস্তানি অবাঙালিরা দিন দিন আরো প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠে। ২৮ এপ্রিল সকাল থেকে পুরো এলাকা জুড়ে তারা সৃষ্টি করে তাড়ব। খুনের নেশায় উন্মুক্ত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তাদের নিধন যজ্ঞের কথা ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে সবাই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল ওঠে। শিক্ষক কাজী রেজাউল ইসলাম কলেজ ভবন থেকে কলেজের পূর্ব দিকের গেট দিয়ে বের হয়ে তাঁর কাকরাইলের বাসায় চলে যেতে চেয়েছিলেন। রাস্তা পার হয়েই দেখেন ছুরি হাতে ছুটে আসছে একদল অবাঙালি। তিনি ভয় পেয়ে আবার দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে প্রবেশ করেন কলেজে। দারোয়ান গেট বন্ধ করে দেয়।

জানামতে, কলেজের শিক্ষক জনাব আব্দুর রহিম অত্র কলেজের চাকুরীরতদের মধ্যে প্রথম শহীদ। তিনি ক্যাম্পাসের বাসা ছেড়ে গুলিস্তানে এক আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখান থেকে এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত তাঁর কিশোর পুত্রকে নিয়ে রিস্কায় কলেজে আসছিলেন। কলেজের দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা দেয়ালের বাইরে এই হিংস্র পাকিস্তানি অবাঙালিদের দ্বারা আক্রান্ত হন তাঁরা। ঘাতকদের হাতে এক সাথে শহীদ হন পিতা-পুত্র। রসায়নের শিক্ষক জনাব ফিরোজ আহমেদ চৌধুরী সোনালী ব্যাংকের ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল শাখার (দক্ষিণ পূর্ব কোণে ছিল ব্যাংকটি) আশ্রয় নেন। কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী গ্রাউন্ড ম্যান মোঃ জালাল উদ্দীন পূর্বদিকের গেট দিয়ে বের হয়ে তাঁর চাচার বাসায় আশ্রয় নিতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পাকিস্তানি অবাঙালিরা তাঁকে আক্রমণ করে। টেনে হিচড়ে নিয়ে আসে ব্যাংকের গেট পর্যন্ত। ব্যাংকের ভেতরে আটকে থাকেন অবাঙালি ম্যানেজার ও শিক্ষক জনাব ফিরোজ আহমেদ চৌধুরী। তিনি কলাপসিবল গেট ধরে কাঁদেন আর প্রাণ ভিক্ষা করেন, "স্যার, আমাকে বাঁচান"। অবাঙালি ম্যানেজার কিছু বলেন না, ফিরোজ আহমেদ চৌধুরীকে নিয়ে ভেতরে চলে যান। আতঙ্কিত তাঁরা ভাবেন এই বুঝি ঘাতকেরা এসে তাঁদেরও নিয়ে যাবে। মোঃ জালাল উদ্দীনকে রাস্তার পূর্বপাশে যেখানে এখন গণভবন সেখানে ইট পাথরের স্তুপের পাশে উপর্যুপরি ছুরির আঘাতে খুন করে অবাঙালিরা। সারাদিন চলে এই হত্যালীলা। বিকেলে পাক সেনাবাহিনীর গাড়ি এসে টহল দেয় পুরো এলাকা আর গাড়ি ভর্তি করে তুলে নেয় অগণিত লাশ। পরদিন সকালবেলা পৌর কর্মীরা রক্তের দাগ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাস্তা।

পাকিস্তান সরকার বহির্বিশ্বকে পরিস্থিতির স্বাভাবিকতা বোঝানোর জন্য মে মাসে সকল সরকারি, আধাসরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ জারি করে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার নির্দেশ দেয়। অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী জীবন ও জীবিকার তাগিদে কাজে যোগ দেন। যাঁরা প্রত্যন্ত গ্রামে বা ভারতে গিয়েছিলেন এদের অনেকেই যোগদান করতে পারেননি। চালু হয় কলেজের একটি ছাত্রাবাস। অল্পসংখ্যক ছাত্র আসে ছাত্রাবাসে। নামমাত্র শ্রেণি পাঠদান হয়। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র মোঃ ফরিদ বখ্তের (স্কুল নম্বর ৭৫৯) স্মৃতি চারণ থেকে জানা যায়, তিনি এবং আর তিনজন ছাত্র পুরো জুনিয়র উইং এ ক্লাস করেছেন। কীসের ক্লাস! শিক্ষকরা তাদের ইচ্ছেমতো খেলার এবং সময় কাটানোর অনুমতি দিয়ে দিতেন।

এর মধ্যে মে ও জুন মাসে সরকারি নির্দেশে অনুষ্ঠিত হয় এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা, যদিও তা পরবর্তীতে বাতিল হয়েছিল। অল্প সংখ্যক ছাত্র কেউ নিজ উদ্যোগে আবার কেউ ছাত্রাবাস থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এরই ফাঁকে একটু একটু করে জানা যায় এ কলেজের ছাত্ররা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এর জন্য ভারতে গিয়েছে প্রশিক্ষণে, অনেকে ফিরে এসে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

কলেজের অভ্যন্তরে অবস্থানকারীরা আত্মরক্ষার ন্যূনতম ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভব করেন। এসএসসি পরীক্ষার্থী ফিরোজ মাহমুদ হাসান (স্কুল নম্বর ২১১) তখন অবস্থান করছিলেন কলেজে। তিনি এবং শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত নেন যে কিছু আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রের ব্যবস্থা করবেন তাঁরা, যাতে আক্রান্ত হলে অন্তত শত্রুর মোকাবেলা করা যায়। কলেজের রসায়নের শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ চৌধুরীর কাছে ছিল পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া একটি বন্দুক। তিনি ছাত্রদের তা' প্রয়োজনে নিতে বলেন। কেমন করে যেন বাইরে প্রচার হয়ে পড়ে যে রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের অভ্যন্তরে মুক্তি বাহিনীর একটি প্রতিরক্ষা সেল গঠিত হয়েছে। একদিন মধ্যরাতে পাকিস্তানি কমান্ডোরা দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে ঘেরাও করে ফেলে শিক্ষকদের আবাসিক ভবনগুলো। পুরুষ সদস্যদের বাইরে আনার আদেশ দেয়া হয়। পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাঁরা বাড়ি থেকে বের হয়ে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ান। প্রত্যেকেই ভাবেন জীবনের অন্তিম মুহূর্ত সমাগত। কেউ সরবে কেউ নীরবে কলেমা তৈর্যবা পড়েন। এক কমান্ডো ফিরোজ স্যার-এর বাসা থেকে সেই বন্দুকটি বের করে আনে। অস্ত্রটি বহুদিন ব্যবহার করা হয় না বলে তিনি বারবার আর্মিকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কে শুনে কার কথা। কেউ ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দুতে তারা যে সাচ্চা মুসলমান, পাকিস্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করেন, তা বোঝানোর চেষ্টা করেন। এই ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দুই সেদিন তাঁদের রক্ষাকবচ হয়। উর্দুভাষী শিক্ষক ছিলেন কালিম আহমেদ। তিনি পাকিস্তানি কমান্ডোকে বোঝান এঁরা সবাই পাকিস্তান ভক্ত সহকর্মী। এদের

অনেক ছাত্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার। পাকিস্তানি কমান্ডোদের নেতা কালিম আহমেদের কথা বিশ্বাস করে তার বাহিনী নিয়ে পশ্চিম গেট দিয়ে বের হয়ে যায়।

এর মধ্যে একদিন কলেজ ক্যাম্পাসে আসেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মোঃ হাবিবুল আলম (স্কুল নম্বর ৭১) তিনি শিক্ষকদের সাহস ও ভরসা দেন, এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার ব্যাপারে নজর রাখছে। ১৯৭১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিলেন মোঃ হাবিবুল আলম। সবার চোখে ধুলো দিয়ে নিজের পাশ বালিশটিকে বিছানায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুইয়ে এপ্রিলের শুরুতে এক অন্ধকার ভোরে দেশ মাতৃকার মুক্তির শপথে বের হয়ে পড়েন। সেক্টর -২ এর অধিনায়ক খালেদ মোশাররফের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি। রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, বেদনাময় আত্মত্যাগ আর গৌরবময় জয়ের ইতিহাস অঙ্কিত আছে তাঁর গ্রন্থ BRAVE OF HEART (Academic Press and Publishers Library কর্তৃক প্রকাশিত) এ। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'বীর প্রতীক' উপাধি অর্জন করেন রেমিয়ান মোঃ হাবিবুল আলম।

কলেজের ছাত্ররা আরও জানতে পারে, এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মেজর শমসের মুবিন চৌধুরী (এসএসসি -৬৫, স্কুল নম্বর ২৮৩) যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীর বিক্রম' উপাধি অর্জন করেন। ছাত্ররা অনেকেই সব পিছুটান উপেক্ষা করে দেশমাতার মুক্তির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে ওঠে। অষ্টম শ্রেণির হাম্মাদুর রহমান রুপিন, এসএসসি পরীক্ষার্থী এ.কে.এম জামান, (স্কুল নম্বর - ৬৭৩), এসএসসি পরীক্ষার্থী সেলিম আহমেদ (স্কুল নম্বর-৫৯৪), এইচএসসি পরীক্ষার্থী জাকির আহমেদ (স্কুল নম্বর -১৭৪) এবং আরও অনেকেই সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নবম শ্রেণির আমান উল্লাহ খান আমান কলেজের অভ্যন্তরে থেকে আরও অনেকের সাথে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখেন। এসএসসি পরীক্ষার্থী ফিরোজ এম হাসান (স্কুল নম্বর -২১১), আরিফুল মাওলা চৌধুরী (স্কুল নম্বর - ৪২০), সোহেল সামাদ, (স্কুল নম্বর -৬৭৪), ঢাকার মানিকগঞ্জে বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এর দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল (স্কুল নম্বর-৫৯৮) এস. এস. সি পরীক্ষার্থী ছিলেন। তিনি ১৯৬৫ সালে অনাবাসিক ছাত্র হিসেবে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। বীর মুক্তিযোদ্ধা সেলিম আহমেদও ছিলেন তাঁর সহপাঠী। পঞ্চম শ্রেণির তৃতীয় পর্বে শেখ জামাল নজরুল ইসলাম হাউসের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। অত্যন্ত শান্ত ও নম্র-ভদ্র শেখ জামাল সহপাঠী ও শিক্ষকদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। ২৫শে মার্চের

কালরাত্রের পর পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পরিবারকে ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখে। সেখান থেকে শেখ জামাল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ খোঁজার জন্যেই স্কুলে আসতেন। তাঁর শ্রেণিশিক্ষক কাজী রেজাউল ইসলামের কাছ থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুর পুত্র হওয়ায় যেকোন সময় মিলিটারী বা বিহারিরা তাঁকে আক্রমণ করতে পারে, এজন্য তিনি প্রতিদিন ক্লাসে গিয়ে শেখ জামালের খবর নিতেন। একদিন দেখলেন শেখ জামাল অনুপস্থিত। সহপাঠীরা সমস্বরে জানালো, "শেখ জামাল মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে"। আজ ভাবতে অবাক লাগে একান্ত কিশোর শিক্ষার্থীরাও দেশপ্রেমের অমিত শক্তিতে কতটা অকুতোভয় হয়ে উঠেছিল। দেশ স্বাধীন করে দেশে ফিরে শেখ জামাল মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালে শেখ জামাল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত হন। লন্ডনের মিলিটারি একাডেমি Sandhurst থেকে তিনি সমর বিদ্যায় উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেন। একান্তরে শত্রু জয় করে বিজয়ীর বেশে ফিরলেও ৭৫ এর ১৫ই আগস্টের ভয়াবহ রাতে দেশপ্রেমহীন ঘাতকদের হাতে শহীদ হন লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল।

প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্ররা অনেকেই দেশমাতৃকার মুক্তির শপথে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ড: নিজাম উদ্দীন আহমেদ (স্কুল নম্বর ৩৫০), মেজর সৈয়দ মিজানুর রহমান (স্কুল নম্বর: ৮৩১), মেজর সৈয়দ মুনিবুর রহমান (স্কুল নম্বর: ৮৩২), মেজর আব্দুল কাইয়ুম খান (স্কুল নম্বর: ৭৯), পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখে যুদ্ধে আবতীর্ণ হন। ড. নিজাম উদ্দীন আহমেদ তখন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মেজর সৈয়দ মিজানুর রহমান ও মেজর সৈয়দ মুনিবুর রহমান ছিলেন যমজ ভ্রাতা। তাঁরা তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত ছিলেন। দুই ভাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম War Course এর সদস্য ছিলেন। মেজর আব্দুল কাইয়ুম খান (স্কুল নম্বর ৭৭৯) তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স (পদার্থবিদ্যা) প্রথম বর্ষের ছাত্র। তিনিও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম War course এর সদস্য ছিলেন। কলেজের ৬৮-৬৯ ব্যাচ (এইচএসসি-৬৯) জয়নাল আবেদীন, কলেজ নং-৯৬৫ সম্মুখ যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন মেজর হায়দার এর নেতৃত্বে সেক্টর-২ এ। তাঁর অকুতোভয় ও সাহসী যুদ্ধের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার তাঁকে 'বীর প্রতীক' খেতাব প্রদান করেন। দেশকে মুক্ত করার জন্য আপনজনের চোখের জল আর জীবনের মায়া তুচ্ছ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা। মেজর সৈয়দ মিজানুর রহমানের ভাষায়, "আমরা আমাদের সহজ সরল প্রাজ্ঞল তারুণ্যকে বিসর্জন দিয়ে এক দুর্ঘর্ষ গেরিলা বাহিনীতে পরিণত হলাম।"

১৯৭১- এ প্রাক্তন ছাত্র নিজাম উদ্দীন আজাদ তখন ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। বাবা মায়ের তিন পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। বোনটি তাঁর সতেরো বছরের ছোট। ছোটবেলা থেকেই পড়ালেখা, সহশিক্ষা কার্যক্রম ও নেতৃত্বসুলভ গুণাবলীর অধিকারী তুখোর ছাত্র ছিলেন সুদর্শন নিজাম উদ্দীন আজাদ। তাঁর শিক্ষক (কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক) জনাব মাহাবুর আমজাদের স্মৃতি থেকে জানা যায়, তিনি বর্তমান জয়নুল আবেদিন হাউস (তদানীন্তন আইয়ুব হাউস) এর হাউস প্রিফেক্ট ছিলেন। বাবা-মায়ের অত্যন্ত আদরের সন্তান তিনি। তিনি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর বাড়িতে ছিল একটি মুক্ত পরিবেশ। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে সকল মোহ তুচ্ছ করে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন নিজাম উদ্দীন আজাদ। বিজয়ের একবারে প্রাক্কালে ১৯৭১ এর ১১ই নভেম্বর চাঁদপুর জেলার মতলব থানায় সম্মুখযুদ্ধে আহত হন তিনি। শত্রুরা তাঁকে নিয়ে যায়। তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুত্র শোকে বাবা আর বেশিদিন বাঁচেননি। মা বেঁচে ছিলেন ষোলো বছর। কিন্তু এই ষোলো বছর তিনি বাড়ির দরজা খোলা রেখেছেন কারণ ছেলে যদি বাড়ি ফিরে দরজা বন্ধ দেখে চলে যায়...!

কলেজের ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছে জেনে কলেজের অভ্যন্তরস্থ বাসিন্দারা একদিকে যেমন আশ্বস্ত হন, অন্যদিকে তেমনি চিন্তিত হন তাঁদের জন্য। কলেজের ভেতরে অবস্থানকারী ছাত্ররাও সংঘবদ্ধ হয়। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ছাত্ররাও কেউ কেউ আসে, তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করে। অধিকৃত ঢাকায় যেসব অপারেশন হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো পরিচালিত হয়েছিল বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে। উদ্দেশ্য, দেশে যে স্বাভাবিকতা নেই তা প্রমাণ করা এবং স্কুলে যে দুয়েকজন ছাত্রছাত্রী যাচ্ছে তাদেরকে বিরত রাখা। এই কলেজে পরপর দু'বার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। প্রথমবার ১৮ই অক্টোবর এবং দ্বিতীয়বার দোসরা ডিসেম্বর।

সরকারী নির্দেশের পর ঢাকার আর সব স্কুলের মতো রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলও খুলেছিল। হাজির ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগই হলো অবাঙ্গালী। স্কুলের কয়েকটি বাঙ্গালী ছেলের কাছে ব্যাপারটি পছন্দ হয়নি। এত হাজিরা কেন? মনে হচ্ছে দেশে যেন কিছুই ঘটেনি। স্কুলের আবাঙ্গালি ছেলেগুলো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে। এদের একটা সমুচিত শিক্ষা দেয়া দরকার। নবম শ্রেণীর ছাত্র আমান উল্লাহ খান, ডাক নাম: আমান (সাংসদ রাশেদ খান মেননের ছোট ভাই) কিছু একটা ঘটানোর উদ্যোগ নিল। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের কাছে ছেলেটি তার মনোবাসনার কথা জানায়। তাঁরা ঘন্টা দুয়েক ট্রেনিংয়েই মোটামুটি জিনিসটা বুঝিয়ে দেয়। ছেলেটির বড় ভাইয়ের একটি মোটা বইয়ের ভেতরে গোল করে একটি গর্ত করা হলো। তার মধ্যে পুরে দেয়া হয় 'পি-কে' এবং আধ পাউন্ড

ইসপ্লিন্টার। ১৮ই অক্টোবর সেই বই নিয়ে ছেলেটি স্কুলে গেল। পরিকল্পনা ছিল স্কুল বাস ওড়ানো হবে। কিন্তু ও-জায়গায় লোক চলাচল বেশি ছিল। তাই বইটি নিয়ে লুকিয়ে রাখা হলো স্কুলের (বর্তমান অ্যাকাডেমিক ভবন-১) এক বাথরুমে। শেষ পিরিয়ডে যখন ক্লাস চলছে তখন ছেলেটি এক ফাঁকে চলে গেল বাথরুমে। প্রথমবার ইগনাইট করতে গিয়ে সে ব্যর্থ হল। ফিউজ ওয়্যারে আশুন লাগলোনা। একেই নবীশ, ভয়ে হাত কাঁপছে থরথর করে। কখন কে এসে পড়ে কে জানে। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় ইগনাইট হলো। বিস্ফোরণে বাথরুমের জানালা ৫০ গজ দূরে বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে (পুরাতন) গিয়ে পরল।

১৮ই অক্টোবরের বিস্ফোরণের পর স্কুলের গেটে রাজাকারদের পাহারা বসে গেল। ছাত্ররা ক্লাসে এলো না। কিন্তু সেটা মাত্র তিন চার দিনের জন্য। আবার স্কুলে হাজিরা পুরো জমে উঠল। সাতই ডিসেম্বর স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্কুলে বিস্ফোরণের আরেকটি সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। স্থির হলো রাজাকারদের নাকের ডগায়ই অপারেশন করতে হবে। তারিখ ঠিক হলো 'পয়লা' ডিসেম্বর। স্কুলের ছেলেটি এবারকার অপারেশনের কথা স্কুলের কয়েকজন সহমর্মী বন্ধুদের (আব্দুস সেলিম, তুশান, শুকরান, কবির হোসেন, আফতাব প্রমুখ) জানিয়ে রাখলো।

এবার দশ পাউন্ড 'পি-কে'। একটি মোটা ফিজিক্স বই এর মধ্যে ভরা হলো 'পি-কে'। পয়লা ডিসেম্বর স্কুলে গেটে গিয়ে হলো এক বিপত্তি। সেই ছেলেটির সাথে রয়েছে স্কুলেরই সহযোগী বন্ধু আসিফ কালিম। গেট দিয়ে ঢুকতে যেতেই একজন রাজাকার বলল কেতাব দেখাও? মহা মুশকিল কেতাবের মধ্যেই তো আসল জিনিস! ওরা তখন ঘামতে শুরু করেছে সহযোগী ছাত্রটি জিজ্ঞেস করল চেক করতে হবে? কার অর্ডারে চেক করতে হবে? কে অর্ডার দিয়েছে? সহযোগী ছাত্রটির রাজাকারদের লেগে গেল বাগড়া ফাঁকে 'পি-কে' ভরা বই নিয়ে শটকে পরল।

স্থির হলো ছেলেটির আত্মা অপারেশনে সহায়তা করবেন। দোসরা ডিসেম্বর এবার স্কুলে এলো তার মাকে সাথে নিয়ে। এলেন তাদের গাড়িতে। ছাত্রদের নিয়ে কোন গাড়িকে ঢুকতে দেওয়া হয় না কিন্তু কোন অভিভাবিকা যদি গাড়ি বা অটো রিক্সায় আসতেন তবে রাজাকাররা তাদের গাড়িটিকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিত না। সেদিনও বিনা বাধায় গাড়িটি ঢুকে গেল। মা এর বোরখার নিচে আনা 'পি-কে' ভরা বই নিয়ে স্বাভাবিকভাবে ছেলেটি ক্লাসে চলে গেল। আর মা স্কুলের শিক্ষকদের সাথে দু চারটি কথা বলে প্রস্থান করলেন। ছেলেটি খাতা পত্রের সাথে বিস্ফোরকসহ বইটি রেখে দিল ক্লাসের ডেস্কে। শেষ পিরিয়ডের ক্লাস যখন চলছে তখন ছেলেটি বই নিয়ে শিক্ষকদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ক্লাস কক্ষ থেকে। তারপর স্কুলের

অ্যাকাডেমিক ভবন-১ এর বায়োলজি ল্যাব এর পাশের কক্ষে বসানো হলো। দুপুর ১২:২০ মিনিটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল সারা স্কুল ভবনটি। পরের দিনের একাধিক জাতীয় পত্রিকাসমূহে খবরটি ছাপা হয়।

এ ঘটনার পর মোহাম্মদপুর এলাকার রাজাকারসহ কয়েকজন মিলিটারি কলেজে প্রবেশ করে। ঐ সময় কলেজ ভবন থেকে উপস্থিত শিক্ষক জনাব ফিরোজ আহমেদ চৌধুরী, জনাব আব্দুল জব্বার, জনাব মাহবুব আমজাদ, জনাব মাহমুদুজ্জামান, জনাব হেলালউদ্দীন, জনাব এ. কে. এম আব্দুল মান্নান কে এখন যেখানে শহীদ মিনার সেখানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। মিলিটারিরা রাইফেল তাঁদের দিকে তাক করলে সকলে ভয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। মিলিটারিদের সঙ্গে আসা রাজাকার কমান্ডার মিলিটারি কমান্ডারের কানে কিছু একটা বলার পর গালমন্দ করতে করতে রাইফেল নামায় মিলিটারিরা। কলেজের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মজিদ ও কয়েকজন কর্মচারিকে ধরে নিয়ে পশ্চিমের গেট দিয়ে বের হয়ে যায় তারা। বর্তমানে যেখানে পরিবার পরিকল্পনা অফিস তার দক্ষিণে একটি বেকারির মালিক ছিলেন এক পাকিস্তানি অবাঙালি। ঐ দোকান থেকে প্রায়ই কলেজের ছাত্রদের জন্য রুটি কেনা হতো। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও কিনতেন। বেকারির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মালিক এগিয়ে আসেন। মিলিটারিদেরকে তিনি উর্দুতে বলেন যে, এটি একটি খুব ভালো স্কুল, এখানে কোনো 'মুক্তি' নেই। এখানে অনেক উর্দুভাষী আছে। এখানকার সবাই পাকিস্তান চায়, বাংলাদেশ চায় না। বলা যায় এই হৃদয়বান লোকটির হস্তক্ষেপেই মিলিটারিরা তাঁদেরকে সেদিন ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

এ দিকে সারা দেশ জুড়ে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর হাতে পাকিস্তানবাহিনী ও রাজাকারদের পরাজয় হতে থাকে। কারো বুঝতে বাকি থাকে না বিজয় আসন্ন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শিক্ষকদের পরিবার পরিজন স্বগৃহে ফিরে আসেন। ছাত্রাবাসগুলো পূর্ণ হয়ে ওঠে। কলেজের শ্রেণিকক্ষ, বারান্দা এবং ঘাসে ঢাকা মাঠগুলো আবার শিশু-কিশোরদের কলকণ্ঠে আর পদচারণায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। কেবল ফেরে না সে মানুষগুলো যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এক টুকরো স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি।

এ লেখায় ঐ সময়ের যে সকল মুক্তিযোদ্ধার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা ছাড়াও এ কলেজের আরও অনেকেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ করেছেন বলে আমার বিশ্বাস। উপযুক্ত তথ্য ও উপাত্তের অভাবে তাঁদের নাম এ লেখায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এজন্য তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ভবিষ্যতে

আরো তথ্য পেলে তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে। স্বাধীনতার পর তদানিন্তন জিন্নাহ হাউস (বর্তমান কুদরত-ই-খুদা হাউস) কে শহীদ লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এম রহমানের নামে নামকরণ করা হয় এবং আয়ুব হাউস (বর্তমান জয়নুল আবেদীন হাউস) এর নাম শহিদ নিজাম উদ্দিন ভবন নামকরণ করা হয়। অথচ, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে সত্তর দশকের শেষে দু'জন বীর শহিদ এর নাম মুছে ফেলা হয়। এভাবেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় দেশের সূর্য সন্তানদের নাম। আজকের ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৫২ একরের স্বর্গভূমিতে যে সবুজ ঘাসের উপর ভোর হলেই শরতের কাশফুলের মতো সাদা ইউনিফর্মে তোমরা কোলাহলে মেতে ওঠো, মাথার উপরে যে একশুধ অশুধ মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বাধীন ভাবনায় ডুবে থাকো তার সবটাই এসেছে অসংখ্য জীবনের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে। এ কলেজের ছাত্ররা অকুতোভয় নির্ভিক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জীবন বাজি রেখে লড়েছেন।

পূর্বসূরীদের এই ঋণ অতীত প্রজন্মের সাথে ভবিষ্যত প্রজন্মের সেতুবন্ধন রচনা করেছে। রক্তের ঋণ শোধ করার দুঃসাধ্য কারো নেই। তবে স্বাধীনতার চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা তরুণ প্রজন্মের কর্তব্য। তারুণ্য এমন

একটি প্রাণশক্তি, যা অফুরন্ত সম্ভাবনা ও উদ্দীপনার মাধ্যমে বর্ণিল স্বপ্ন দ্বারা উজ্জীবিত থাকে। একটি স্কুলিঙ্গ তারুণ্যকে উদ্দীপ্ত শিখায় পরিণত করতে পারে, যা হয়ে উঠতে পারে নক্ষত্রের মতো সমুজ্জ্বল। নতুন প্রজন্মের উজ্জীবিত শক্তিতে বেঁচে থাকুক আত্মত্যাগী পূর্বসূরীরা।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এ লেখার উৎসাহদাতা আমারই বাংলা শিক্ষক ফেরদৌস আরা বেগম (প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ)। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় কলেজের সুবর্ণজয়ন্তীতে তাঁরই লেখা 'স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ' শিরোনামের লেখাটি হতে অনেক তথ্য এ লেখায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এসেছে। এর পাশাপাশি প্রাক্তন রেমিয়ান ভাইদের কাছ থেকে এবং কলেজের শিক্ষকদের পরিবার হতে অনেক তথ্য পেয়েছি। বিশেষ করে এ এস এম আমানুল্লাহ খান রচিত স্বাধীনতার সংগ্রামে ঢাকায় গেরিলা অপারেশন গ্রন্থ থেকে কলেজের অপারেশন এর দু'টি বিস্তারিত তথ্য পেয়েছি। যা লেখাটি পরিমার্জনে সহায়তা করেছে। তদুপরি, যেহেতু স্মৃতিচারণমূলক লেখা তথ্যগত কোনো ভুল থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো।]





**Rashed Al Mahmud**  
Associate Professor  
Department of English



## ONCE UPON A TIME IN DHAKA

The day did not dawn for me in a logical manner. Starting from placing one of the buttons of my shirt in a wrong buttonhole to traversing the whole city dropping CV and encountering gruesome interviews for a petty job very much close to my dream and desperation - I got hooked with experiences that challenged my way-of-the-world perspectives as well as maturity!

Who knew that a modest 'banana skin' was waiting to ambush my journey from home with a diffidence-soaked mind to meet the frowning reality? So when my foot slipped off allowing my tiny corpse to fly and then thud flat, I could not afford to lose my calmness thinking that the mentality of throwing garbage was a sort of 'national banana skin' and my superstitious mind took it as a bad omen that the day lying ahead would witness experiences of the similar nature that might make my humble dreams of life end in futility.

Collecting myself was not so easy as a number of intriguing eyes with glints of humour were following my efforts to rescue myself from this mortifying situation.

This was how life truly appeared to me!

Anyway, amidst the drizzling sporadically turning to pouring, I was heading for the nearest

bus stop aiming at reaching my coveted career destinations where I planned to knock at the doors of my prospective employers and drop my slim curriculum vitae hopefully to be perused and eyed with compassion. Waking up from slumber, the city, despite the incessant rain, already turned into a perilous sea for the two-wheelers, three-wheelers, motorists and above all for the trudging pedestrians including a tramp like me who always felt heedless in the unwelcoming mazes of this urban ambient.

Living in this city gave me a kind of emotional resilience; say for example, I did not lose my composure when I was encountered with something weird or freaky in terms of my conception of the standard behaviour in a city. So I quickly dragged my body aside when the pestering honking of the horns of a long procession of motorcycles heroically plying on the footpath to dose the traffic jam hurt my ears. I was deeply convinced that owning a motorcycle was much smarter and more convenient than possessing a car, because this amazing two-wheeler could give you the leeway of an airborne creature, the audacity of a daredevil giving a damn to earthly regulations and the shameless mobility to squeeze through any visible space on the street.

Heading for Motijheel on a 'Gate-locked' bus



seemed a never-ending journey as the vehicle had to navigate through the wide road stuffed with vendors' vans and makeshift shops narrowing it down to a long bottleneck. And as for 'Gate-locked', it was a transport service supposed to carry passengers from the starting point to drop at the destination without allowing anyone to ride from any other pick-up points in between. However, with reality making faces at the company commitments, the front door of the bus was kept open as wide as possible to let the stray passengers get in at their sweet will to feed the seemingly abysmal void of the bus as well as that of the greed of the transport operators!

It is always interesting to watch the world outside as you are pressed tight in a commuting public transport, because your journey by the bus introduces your eyes to the most surprising as well as entertaining experiences to let you raise a number of storms over many a cup of tea you might take with your office buddies during or after office hours (your chances of doing this before office hours are very low, because traffic congestion does not allow you to reach your desk in time) to put your sugar level at high risk.

A middle aged man was sitting at the roadside with a large umbrella overhead and shouting on the small microphone imploring for a sum of donation for some mosque cum madrasa (a theological school) the whereabouts of which was known maybe only to him. He was luring the passersby with his promise of making 'dua' to enable them to go to paradise; the sole ticket for this heaven-bound journey was to contribute to this would-be religious edifice. I only wondered - who had given him the lease of the land of paradise! Anyway, that's none of my business!

As the sound of a little heated altercation floated to my ears, I volunteered to help albeit courage hardly accompanied me in such cases; to my surprise, I found an able bodied middle aged man vehemently trying to defend his stance on retaining one of the seats marked under 'Women,

Children & Handicapped Only'. Since that human was seemingly neither a woman nor a child, I concluded that he was definitely psychologically disabled as he was persistently shouting to justify his transgressions as his rights. Anyway, after some angry outbursts from the other passengers on board watching this nuisance with disgust, he sank into silence and then suddenly disappeared, thanks to the social watchdogs whose hardship of life didn't rob them of their sense of humanity!

As the sultry weather was soothed by the morning-long torrential rain, I was yet to experience more urban odds. I must phrase it as an 'urban paradox'. Here, rains pour in plenty just to put people's lives in peril.

As our bus reached the posh Dhanmondi residential area, all of a sudden, I had a feeling that we were sort of floating! As the incapacities fueled by extreme insincerity of the municipality clogged the drainage system of one of the most aristocratic areas of the capital city, rain water was making a devilish show-off thereby rendering the avenue a semblance of a river overflowing its banks. My dread and dejection deepened when two young street boys dipping themselves in the waist-deep black water were already with a boat-like thing, offering cheap short-distance river cruises to the stunned pedestrians willing to go along or across the wide submerged Dhanmondi Satmasjid road, yet wondering how. The message I got from the boys' improvisation was that this water would not recede within a few hours.

Panic sneaked into my soul when, after several hiccups of the engine, our bus came to a standstill. Black, filthy water was dashing against the last step of the bus's entrance.

I slid my hand into my pocket to see how many hours I still had to reach my interviewer. I froze with fear when my pocket felt empty. Just to be sure, I again drove my hand deep inside the two pockets of my trousers, then those of my shirt and the poor-looking handbag. Oh, no! My

second-hand android mobile phone was nowhere. To my utter horror, I could realize that my invaluable phone set was now nestling in the deepest recess of the thief's attire. I was supposed to receive an important phone call from my interviewer's office about the ensuing meeting. Now, what!?! I was completely unreachable!

On a desperate move, I jumped out of the public transport into almost waist-deep sewerage water! Who cared! My age to hunt for a decent job was on the fringe. And no sooner had a tiny ray of hope peeped over the horizon regarding my hopeless career than I proved myself a sheer duffer.

With sewage-soaked trousers, I crept up to the edge of the high footpath and hauled my body on to it and started walking quickly. I didn't care whether others were looking at me with wonder and fun. I only knew I had to reach that office as per schedule.

Walking on the footpath, especially when it was under nearly knee-deep water, wasn't so easy as I found a series of motorcycles (an omnipresent nuisance!) plying past me at an inconsiderate speed sprinkling dirty water. Nevertheless, I was trying to trot on the flooded footpath in order to catch the bus waiting half a kilometre ahead. I realized that I was making a freak show with my wet dirty dress.

When I arrived at the door of the recruiter's office, I felt relieved to find the office-boy still there. At last, I had an opportunity to be interviewed. With an ingratiating smile I was about to explain the reason for my delay. The sly-looking boy gave me a condescending smile

in return and whispered in my ears, "We didn't take the interview. See, the weather is so inhospitable! The interview has been delayed for the time being. Maybe soon, maybe a far cry. Why wasting time and energy? Grow up, man! Be wise!" Then he patted my back uttering 'Good luck!'

'Good luck' or no luck, I realized that I had no place in a world where potentials were overpowered by nepotism, eligibility was usurped by snobbery and hush-money and politeness was regarded as lack of self-assertiveness.

I was still keeping a tiny wick of hope dimly burning in my bosom that though delayed, I would be called for the interview that might end my status as an unemployed youth. But, I was probably destined to be a victim of ill-luck induced by my very familiar environment.

After a month or so, a front page newspaper article that gnawed at my heart read: Recruitment Fraud: Million Dreams Shattered

Now I am a small entrepreneur in my village. Nevertheless, I still dream! I must echo the famous poet's message - 'If dreams die, life is a broken-winged bird'.

I am now well aware that living in a corner of the world which the earth's inhabitants recognize as the third world and where every indicator ranks the third in quality, the only way to keep our head above water in all indicators is to stop being thick to our shortcomings and keep making dogged endeavours to pursue the best practices with splashes of courage and sprinkle of confidence so as to make our dreams come true someday.



**Prasun Goswami**  
Assistant Professor  
Department of English



## Whispering Secrets: A Mystery Uncovered

Oh, how the night did seem so ordinary at the Dhaka Residential Model College, with its halls and classrooms cloaked in darkness. Yet, little did Adib and Rakin know that a whisper, so faint and ethereal, would pierce the veil of tranquility and awaken the eerie presence that lurked within those walls.

At the stroke of midnight, as Adib and Rakin toiled over their books in preparation for their upcoming exams, a whisper broke through the stillness of the night. Oh, how it sent a shiver down Adib's spine, for it was unmistakable in its otherworldly nature.

Rakin, so engrossed in his studies, had not sensed a thing and inquired of Adib, "What troubles you, my friend?"

Adib paused, his senses on high alert as he whispered, "I heard something, a faint whisper."

Their teacher, Mr. Rahman, suddenly appeared in the room, his presence a shock to the young students. "What are you still doing here?" he inquired, his eyes wide in surprise.

"We have finished our studies, sir, and are about to leave," Rakin quickly responded, his voice trembling ever so slightly.

As they made their way to the door, the whispering grew louder, its haunting melody

now more distinct, yet still too soft to decipher. Rakin, shaken by the spectral atmosphere, shuddered and urged his companions, "Let us leave, this is too strange."

But Adib was not one to shy away from a mystery. "No, we must investigate. We cannot abandon this mystery." Mr. Rahman nodded in agreement, "Indeed, we must discover what is causing this disturbance."

And so, with their hearts filled with both fear and curiosity, the trio ventured out into the inky blackness of the night. What secrets awaited them in the murky abyss? They were soon to find out, for the whispers that haunted the halls of the Dhaka Residential Model College were not of this world, and their journey into the unknown was only just beginning.

(2)

In the melancholy classroom, the students and their teacher sat in a state of trepidation, their hearts beating with a sense of unease. Silence reigned, for the atmosphere was dense with an ominous aura. Suddenly, from the shadows at the back of the room, they heard a faint whispering.

With a determined countenance, Mr. Rahman rose to his feet and took hold of a flashlight,

striding purposefully towards the source of the sound. He scanned the room, scrutinizing each window and door, but no trace of an intruder could be found. "The source of this disturbance lies within these walls," he intoned, turning to face his pupils.

The whispering grew louder, multiple voices now distinguishable. The students and their teacher exchanged apprehensive glances; their nerves frayed as they endeavored to locate the origin of the sounds. Suddenly, Rakin drew their attention to a corner of the room. "Look, there's a draft emanating from that spot!"

Mr. Rahman shone his flashlight into the crevice, but no tangible evidence could be found. "We must uncover the truth of what lies beyond that wall," he declared, his determination unshakeable.

For countless hours, the students and their teacher sought a way to enter the other side of the wall, but all their efforts proved futile. As they reluctantly withdrew from the premises, the whispers continued to haunt them, like a phantom of the unknown.

(3)

The whispers, mysterious and unsettling, had seized the students and their teacher, stirring within them a sense of unease. They were shrouded in ignorance, left to grapple with the enigma that plagued them until, at last, they stumbled upon the truth that lay at the heart of their disquiet.

Their search for answers led them deep into the annals of their college's history, poring over dusty records and ancient archives. It was there that they chanced upon an article in a yellowing newspaper, a tale that sent a shiver down their spines.

The piece recounted a tragedy that had befallen the very classroom in which they stood, where a student, driven to despair by his academic failures, had taken his own life. The students and their teacher stood aghast, realizing that the whispers they had heard could be none other than

the anguished lamentations of the tormented soul that had perished in that very place.

Adib spoke out, his voice laced with a solemn sense of duty. "We must aid this lost spirit in finding peace. It is our solemn responsibility."

Rakin glanced around the still library, unsure of how to proceed. It was Mr. Rahman who broke the heavy silence with his answer. "We must call forth the spirits through a séance, and help this ghost to find the rest that eludes them."

The students and their teacher nodded in

agreement, and that very night, they gathered in the haunted classroom to perform the séance, calling forth the restless spirit and offering it a path towards a peaceful afterlife. They hoped that, through their intervention, the tormented soul would at last be able to find the rest that it so sorely sought.

(4)

On the night when the students and their teacher had gathered within the walls of the classroom for the purpose of a spiritual communion, the air was thick with anticipation. The candles burned with a steady flame and each individual clasped tightly to the hand of their neighbour, their eyes tightly shut in a silent supplication, entreating the spirit of the student who had met an untimely end. For a moment, there was no sound to be heard, and the space was still and hushed. But then, as if materialising from the shadows, a chill descended upon them all.

The candles flickered and danced in the dimness, and all at once, a figure manifested before them. It was the specter of the pupil who had taken his own life. His demeanour was one of sadness and perplexity, and in his grasp, he clung to a scrap of parchment. The astute Mr. Rahman was the first to speak, his voice a soft and soothing whisper, "We acknowledge that you are the spirit of the student who departed from this very classroom. We wish to assist you in finding peace and tranquillity, so that you may depart from this earthly plane."

The ghost regarded them with mournful eyes and then turned his attention to the parchment in his hand, extending it to the group. When Mr. Rahman accepted it, they all saw that it was an examination result - and that the student had, in fact, passed the test, contrary to his belief that he had failed. Adib gasped, tears brimming in his eyes, "We are deeply remorseful. You did not fail the examination; it was nothing but a mistake."

The spirit looked upon them with a tranquil countenance, and then he smiled. The space brightened, the chill dissipating, and he murmured gently, "Thank you." And then, as if he had never been there, he disappeared.

In the aftermath of that spiritual gathering, the students and their teacher felt a sense of peace and closure. They understood that they had aided the ghost of the pupil in finding serenity, allowing him to depart from this world. From that day forward, the whispers were never heard again, and the classroom was imbued with a sense of tranquillity and composure.

(5)

The phantasmal visitation had drawn to a close, and a sense of tranquility and serenity now

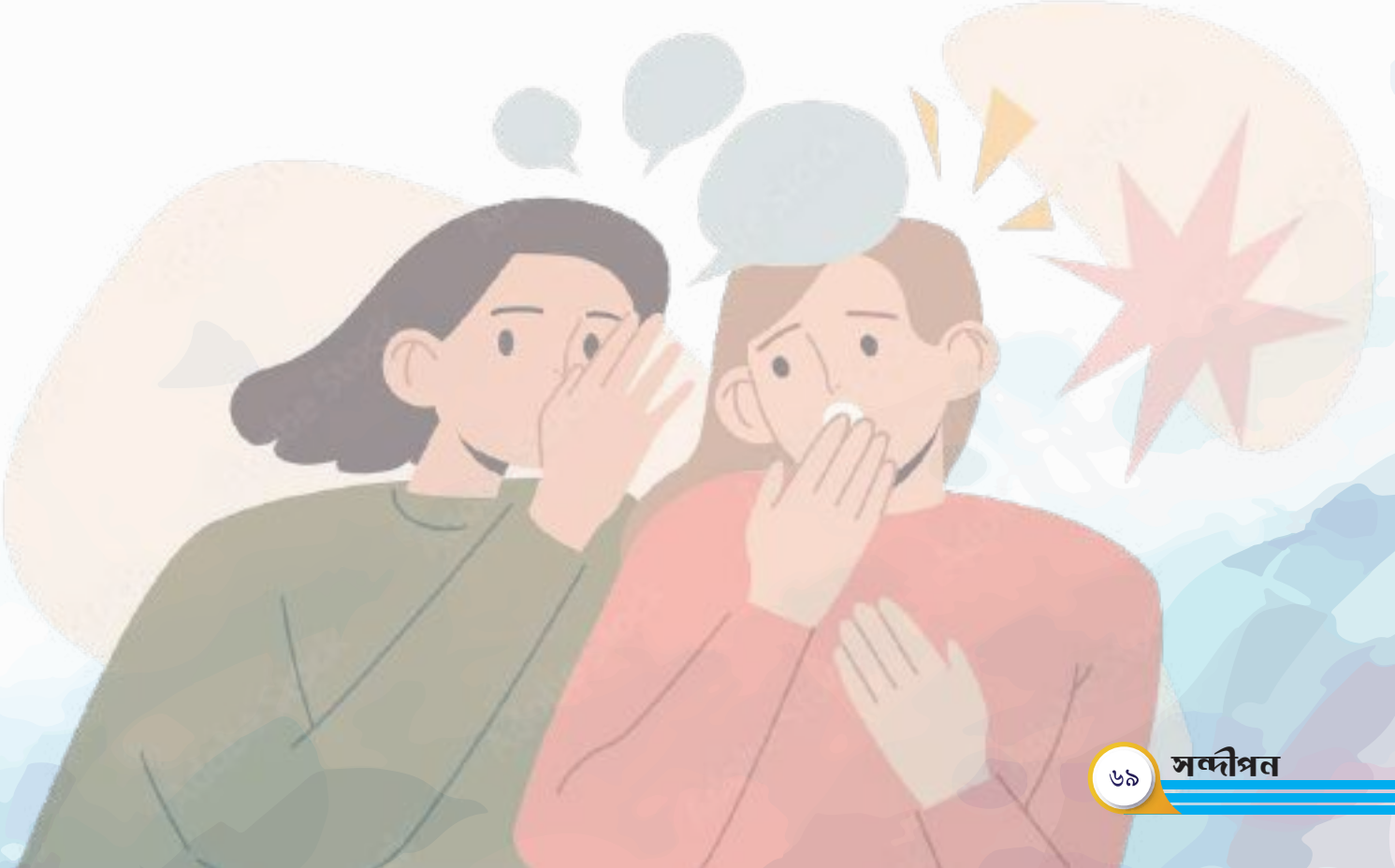
reigned over the classroom. The students and their teacher were awash with relief and elation, having provided succour and resolution to the restless spirit that had haunted them.

From that moment on, a newfound reverence for the antiquity and enigmas of the college took root in their hearts. They comprehended the gravity of acknowledging and honouring the bygone era, and were forever transformed by the experience.

The tale of the ghost of Dhaka Residential Model College persisted, weaving its way into the fabric of the school's lore and metamorphosing into a fable passed down from one generation to the next.

Though the memory of the spectral encounter was indelible, they were grateful for the enlightenment they had garnered and the solace they had imparted to the forlorn student's apparition.

As they left the classroom, the students and their teacher were acutely aware that they would forever be haunted by the murmurings of the yesteryears and the ghostly visitation that had so profoundly touched their lives.





সাবরিনা শরমিন  
প্রভাষক, ভূগোল (প্রভাতি)



## ব্যঙ্গালোরের দিনগুলো

২০০৭ সালে আমি একটি এনজিও তে কাজ করতাম। সেখান থেকে নরওয়ের সরকারি একটি প্রজেক্টের (8th fk South to South Volunteer Exchange Program) আওতায় দেশের বাইরে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের ১ বছরের জন্য অন্য দেশের প্রতিষ্ঠানে পোস্টিং দেওয়া হত। যেন সেখানকার প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তাদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে সেখানে কাজে লাগাতে পারে। পরবর্তীতে দেশে ফিরে আরও দক্ষতার সাথে নিজ দেশে কাজ করতে পারে। প্রতিবছর এই প্রোগ্রামের আওতায় North to North, North to South, South to South ভলেন্টিয়ার এক্সচেঞ্জ (Volunteer Exchange) করা হত। আমি ছিলাম South to South ভলেন্টিয়ার এক্সচেঞ্জ (Volunteer Exchange) এর আওতায়।

আমার অফিসের নাম ছিল 'শিশউক'। মূলত অভিবাসন (Migration) নিয়ে কাজ করত। নেপালের এমনই একটি প্রতিষ্ঠান 'POWRAKHI'। প্রতিষ্ঠানটি মহিলা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার দ্বারা পরিচালিত। তাঁরা দীর্ঘদিন বিদেশে কর্মরত থেকে দেশে ফিরে এসেছেন ও মহিলা প্রবাসীদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। সেখানে আমার ১০ মাসের জন্য পোস্টিং হল।

এই পোস্টিং এর পূর্বে শর্ত ছিল ৩ সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রশিক্ষণটি হবে ইন্ডিয়ার ব্যঙ্গালোরে। একই প্রোগ্রামের আওতায় দক্ষিণ এশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দুইজন করে প্রতিনিধি যারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে কাজ করবে তারা সকলে এই প্রশিক্ষণে বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করবে।

২১ শে সেপ্টেম্বর ২০০৭ বিকেলের ফ্লাইটে কলকাতা হয়ে ব্যঙ্গালোরে যাবো। আমার সহকর্মীর ভিসা সমস্যার কারণে আমাকে একা যেতে হবে। জীবনে প্রথম ও একা দেশের বাইরে যাবো। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কলকাতা হয়ে ব্যঙ্গালোরে পৌঁছাতে রাত প্রায় বারোটা। খুব ভয় ও উৎকণ্ঠা দুটোই কাজ করছিল। এত রাতে কে আসবে আমাকে নিতে, কিছই বুঝতে পারছিলাম না।

যদিও আমি জানতাম আমাদের প্রশিক্ষণ ও থাকার ব্যবস্থা ব্যঙ্গালোরের "ক্রাইস্ট কলেজে", তবুও এত রাতে খুব ভয় করছিল। ব্যঙ্গালোর এয়ারপোর্টের বাইরে এসে ভয় একেবারে কেটে গেল। বাইরে একজন বড় কাগজে আমার নাম লিখে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ছিল দুজন। ওরা ক্রাইস্ট কলেজের ছাত্র। বিভিন্ন ফ্লাইটে যারা আসছে তাদেরকে রিসিভ করা ও যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া ও তাদের তদারকি করার জন্য কিছু ছেলে-মেয়েকে ভলেন্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া ছিল। আমার দায়িত্বে যে দুজন ছিল তারা অসাধারণ মেধাবী ও দায়িত্বশীল। আমাকে আমার জন্য নির্ধারিত কক্ষে পৌঁছে দিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করে। এরপর বাংলাদেশে আমার বাসায় ফোনে কথা বলার ব্যবস্থা করে তারা বিদায় নিয়ে চলে যায়। প্রতিটা কক্ষে দুইজনের থাকার ব্যবস্থা করা ছিল। আমার কক্ষে থাকার ব্যবস্থা ছিল নেপালী মেয়ে 'অনিতা গুরুং' এর। নেপালে আমি যে অফিসে কাজ করব, সে সেখানকার প্রতিনিধি এবং আমি বাংলাদেশে যে অফিসে আছি সেখানে কাজ করবে। সবার জন্যই একই নিয়ম মেনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে পোস্টিং এর পূর্বেই আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্র, দেশ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানতে পারি। অনিতা এসে পৌঁছাতে সময় লেগে গেল প্রায় রাত তিনটা। আমার রুমমেটের সাথে বেশ ভালো

হৃদয়তা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ও খুব মিশুক ছিল। পরবর্তীতে আমাদের সম্পর্ক এত ভালো হয় যে, আমরা দুইজন দুই দেশের তা বোঝাই যেত না। আমরা দুজন দুজনের কাছে ভাষা শিখতাম ও বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা শেয়ার করতাম।

পরদিন সকালে আমাদের ওরিয়েন্টেশন। সকাল সাতটার মধ্যে ডাইনিং হলে পৌঁছাতে হবে। সকালে নাস্তার পর আমাদেরকে ওখানকার ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে ফুলের মালা ও চন্দনের টিপ পরিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে খুবই আন্তরিকতার সাথে বরণ করা হল। এরপর দুইদিন চলল সকল প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ভলেন্টারিয়ার ও অফিসিয়াল প্রতিনিধি সহ কিছু সেশন ও অফিসিয়াল এগ্রিমেন্টের কাজ। দুদিন পর অফিসের প্রতিনিধিগণ চলে গেলে আমাদের প্রশিক্ষণের মূল পর্ব শুরু হল। সকাল সাতটা থেকে বিকলে পাঁচটা পর্যন্ত সেশন চলত। সন্ধ্যা ৭টায় ছিল ডিনার।

মাঝে মাঝে ডিনারের পরও সেশন চলত। আমরা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ফিলিপিন, কেনিয়া, থাইল্যান্ডের প্রায় ২০/২২ জন। আমাদের এই প্রশিক্ষণটি মূলত পরিচালিত হত থাইল্যান্ডের কয়েকজন প্রশিক্ষক দ্বারা। এছাড়াও বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রশিক্ষকগণ সেশন পরিচালনা করতেন। অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল সেই সময়গুলো।

প্রথম দিকে অস্থি লাগলেও পরে সবার সাথে সবার খুব ভালো আন্তরিকতা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। মনেই হয়নি আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি আলাদা। আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল ক্রাইস্ট কলেজের ভলেন্টারিয়ারদের কাজ ও স্মার্টনেস। তারা এই প্রোগ্রামের অফিসিয়াল কোন প্রতিনিধি না হয়েছেও সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেছে। ২৪ ঘণ্টা পালা করে রিসিপশনে থেকেছে। কারও কোনো অসুবিধা হয় কিনা খেয়াল রেখেছে। রবিবার করে আমাদের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ঘুরতে নিয়ে গিয়েছে। এছাড়া প্রতিদিনের সেশনগুলো নিয়ে এবং একজন করে প্রশিক্ষণার্থীর সাক্ষাৎকারসহ প্রতিদিন একটি করে খুবই উন্নতমানের নিউজলেটার বের করত তারা। অসাধারণ ছিল তাদের এসব কাজের তৎপরতা।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল অনেক উন্নতমানের। একই ভবনে বিশাল অডিটোরিয়াম, সেখানেই নীচতলায় আধুনিক টেকনোলজিযুক্ত কক্ষে আমাদের সেশনগুলো অনুষ্ঠিত হত। আরেক পাশে উন্নতমানের আবাসিক হোটেলের মত থাকার ব্যবস্থা। মূলত এটি তৈরি ছিল বিভিন্ন সময়ে দেশি বিদেশি প্রশিক্ষণ ও সমাবেশ সেমিনার করার জন্য। সবমিলিয়ে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। বিশাল বড় পরিসরে এই ভবন ছাড়াও আরও অনেক আকর্ষণীয় ভবন ও স্থাপনাও ছিল। ছিল আবাসিক হোস্টেল। দেখতে দেখতে তিন সপ্তাহ কিভাবে

পার হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না।

এই প্রশিক্ষণের সবচেয়ে কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং একটা অংশ ছিল দুই দিনের জন্য ফিল্ড ট্রিপ। একা এমন এক দুর্গম স্থানে অবস্থান করা, যেখানে কোনো মানুষ ইংরেজিতে কথা বলতে পারবে না এবং তাদের ভাষাও কেউ জানবে না। বিষয়টি এমন ছিল যে, প্রত্যেককে প্রত্যন্ত এক এলাকায় এক একটা আলাদা পরিবারে রেখে আসবে। দুই দিনের জন্য তারা হবেন আমাদের অভিভাবক। কিন্তু আমরা কেউ কারো ভাষা জানব না। ঐ দুই দিন আমাদেরকে তাদের সাথে থেকে বিভিন্নভাবে ভাবের আদান-প্রদান করে থাকতে হবে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল। আমরা যেহেতু বিভিন্ন দেশে নতুন পরিবেশে গিয়ে কাজ করব, তাই অজানা স্থান ও ভাষার মানুষ এবং প্রতিকূল পরিবেশের সাথে কিভাবে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হবে তার বাস্তব একটা পরীক্ষা নেওয়া। যাই হোক, একদিন সেশন শেষ করে সন্ধ্যার পর আমাদেরকে একটি বসে করে অজানা স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। ভারতের কর্ণাটকের কোন এক গহীন গ্রাম। যেখানে কোন শিক্ষার আলো নেই। তাদের ভাষাও কেউ জানিনা। ইন্ডিয়ার ভেতর হলেও ঐ এলাকায় কেউ হিন্দি জানে না। ইংরেজি তো প্রশ্নই নেই।

কত রাত হবে কোনো ধারণা নেই। আমাদের নিয়ে আসা হল একটি লোকাল অফিসে এবং সবাইকে একটি করে খাবারের প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট কাভার্ড ভ্যানে উঠিয়ে গভীর অন্ধকারে জেলখানার কয়েদিদের মত করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

তখন থেকেই প্রচণ্ড ভয় লাগছিল। মনে হচ্ছিল, কেন আমি এমন একটা চ্যালেঞ্জিং কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেললাম? বাইরে ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের একজন একজন করে এক একটা পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটছিল। আমি খুবই ভয় পাচ্ছিলাম। কেমন পরিবারে আমার থাকার ব্যবস্থা হবে? একসময় আমার পালা ঘনিয়ে এল। আমাকেও নামিয়ে দেওয়া হল এক পরিবারের কাছে। সেখানে পৌঁছে আমার শুধু কান্না পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ঐ মুহূর্তে পালিয়ে চলে আসি। কিন্তু কোনো সুযোগ নেই, কারণ এত কিছুর মধ্যেও আমাদের মনিটরিং করা হচ্ছে সেটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম। আমার পরিবারটি বেশ ভালোই ছিল। বাবা-মা ও দুই মেয়ে। বড় মেয়ে বিবাহিত ও তার ছোট একটা বাচ্চা, আর এক মেয়ে ক্লাস এইটে পড়ে। বাড়ির অবস্থা খুবই শোচনীয়। চারদিকে ইটের দেওয়াল দিয়ে দুইটা কক্ষ। আলাদা কোন রান্নাঘর ছিল না। এর মধ্যে মা ও ছোট মেয়ে সহ আমি একটিতে ঘুমাতাম। বাকিরা অন্যটাতে। আমার জন্য একটা বালিশ, তোশক ও একটা চাদর বরাদ্দ ছিল। পরিবারে কোন খাট বা ফার্নিচার নেই। তার চেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে

অত্র অঞ্চলে টয়লেটের কোন ব্যবস্থা নেই। সবাই বনে জঙ্গলে টয়লেট করে। ভয়াবহ রকমের দরিদ্র ও অনুন্নত জায়গা। আমি হতভম্ব হয়ে আছি, আর শ্রুতাকে ডাকছি। ওদের সাথে ইশারায় কথা বলতে হয়। বলা যায়, আমার ভাগ্য কিছুটা ভালো ছিল। কারণ, ছোট মেয়েটা কিছুটা ইংরেজি বুঝত। সে বলল, কয়েকটা বাড়ি পরে একটা বাড়ি আছে, যাদের একটা টয়লেট আছে। কিন্তু সেটা সবসময় তালা দেওয়া থাকে। মেয়েটি আমার জন্য ঐ বাড়িতে কথা বলে চাবি সংগ্রহ করে এনেছিল। বড় একটা সমস্যা মিটল। আমার পরিবারের সবাই আমাকে তাদের সাধ্যমত সমাদর করার চেষ্টা করছিল। তাদের বিশেষ খাবার 'রাখি বল' ও চিকেন রান্না করেছে, যদিও ওটা মুখে দিয়ে আমার বমি চলে এসেছিল। আমি বলতে গেলে দুই দিন না খেয়েই ছিলাম। সারাদিন ছোট মেয়েটা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেত। অনেক আন্তরিক ছিল পরিবারের সকলে। আসার সময় খুব খারাপ লাগছিল। বার বার মনে হচ্ছিল এদের জন্য কিছু করতে পারলে ভালো লাগত। এই যুগেও এত অনুন্নত কোন জায়গা থাকতে পারে?

দুইদিন পরে সবাই ফেরার পর জানতে পারলাম সবার অভিজ্ঞতা। আমি বেশ ভালো ছিলাম। অনেকের পরিবার তাদেরকে সহযোগিতা করেনি। কাউকে কাউকে গোয়াল ঘরে পর্যন্ত থাকতে দিয়েছে। সেই তুলনায় আমার অবস্থা অনেক ভালো ছিল।

আমার জীবনের অনেক চিন্তা ও দর্শন বদলে গেছে এই তিন সপ্তাহে। অনেক ধরনের কাজ, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণসহ অনেক অনেক অভিজ্ঞতার ঝুড়ি নিয়ে দেশে ফিরলাম। যদিও ব্যাঙ্গালোর থেকে সরাসরি নেপাল যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে নেপালের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দশাই উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দুই সপ্তাহের ছুটি ছিল। তাই দেশে দুই সপ্তাহ থেকে ২৮ অক্টোবর ২০০৭ আবার নেপাল চলে গেলাম। সেটাও অসাধারণ অভিজ্ঞতা। পরবর্তীতে নিশ্চয় কোনো লেখায় সেই সময়ের স্মৃতি সকলের কাছে তুলে ধরব।







**Dewan Shamsudduha**  
Lecturer,  
Department of English

## Swift's 'Yahoos' and We

On his fourth voyage, Lemuel Gulliver, the central character in Gulliver's Travels by Jonathan Swift, reached to the land of the Houyhnhnms, a peculiar piece of land. Here he encountered two sorts of beings - one in human shape having all the apparent ingredients resemble a human whom Gulliver named 'Yahoos.' Another one is with the structure of horses called as Houyhnhnms. Interestingly and ironically, the horses had all the good virtues especially 'reason'. The Yahoos, on the other hand, were devoid of all positive human qualities. They were a brutish, filthy, greedy, and degenerate humanoid race. As soon as Gulliver reached there, he was attacked by a Yahoo. However, he was rescued by the Houyhnhnms. It might be a little bit puzzling to find the presence of the imaginary creatures here and their connectivity with us. But, puzzled or not, I dare to say, you need not travel to a remote bizarre island to see the present-day real Yahoos. Observing the current state of the society, its inhabitants, their traits, their impulses and desires, acts and activities, can we disregard the presence of 'Yahoos' among us?

One day, one of my favourite teachers in my college said, 'Character is lost nothing is

lost/Health is lost something is lost / Money is lost everything is lost! 'Hearing this, first we laughed, then stopped and then repented. We failed to make out the essence of his words. But before long, we were brought to our senses by the knowledgeable and witty explanation of our esteemed teacher. The teaching that we received earlier- Money is lost, nothing is lost/ Health is lost, something is lost/Character is lost, everything is lost - was going to lose its value and significance. At that time, it was really tough to realize the ironical expression it because honesty, social values and other human qualities were still prevalent in the society. The students did not hesitate to show respect to their teachers. The elders were esteemed. Parents were like parents.

But now? I, you and all can, and should confess that we possess many things in and within us but not the character. The basic trait of a good character, honesty is vanishing from us. Ethics are on the wane. Lies, lies and lies; everywhere

there are lies. Our life is encircled and engrossed in lies. Parents lie to their children, children to their parents.

Students to their teachers and vice versa. Employees to their bosses and vice versa. Facebook has appeared as a blessing (!) to multiply lies in multidimensional ways. It is full of phoniness.

You go to the market to purchase any product; the most rotten and invalid thing will be presented before you with the best appealing appearance! Try to seek your teacher's advice, you may be motivated directly or indirectly to enroll in his/ her coaching. Go to consult a doctor for the interpretation of your maladies, a host of unnecessary tastes will appear before you. In fact, if you want to list all the ailments based on dishonesty or immorality of your society, you will need thousands of pages to present them but still it will not come to an end. One day, Hazrat Mohammad (SM) said to his companions that there would be a time when an honest man would be very rare. Cities after cities, villages after villages will be unable to bear an honest man. Aren't we heading towards this?

One morning, being in a hurry, I got ready quickly and left home and hired a rickshaw. Reaching the destination, I got off and started looking for the fair in my pocket. I found the money but alas! I had no change. The fair was 30 taka. The rickshaw puller had no change either. What was to be done? Though it was morning, all the shops around were open. With the puller's permission, I went to the first shop. The cashier was before the cash with sleepy eyes. Seeing me he tried to remove his drowsiness probably thinking me as his first customer to open for the day. But hearing my problem, he replied straight that he was unable to give the change. Finding no way, I requested him to lend me 30 taka but he

denied. I searched for the change in almost all the shops and the response was the same. Being helpless and finding no other way, I came

back home, took the money and restarted my journey by the same rickshaw. You, I am sure, if you die for any change in your beloved Dhaka city, you will get no change. Because none is here to believe none. Why should they trust you? I deceive you, you deceive him, he deceives others. We feel an utter joy in spoiling other's rights. In fact, like the Yahoos, we are human in form but inhuman in nature.

Now what happened to Gulliver at the end? He left the strange land and reached his own county, his family - his own abode. He got his wife, children and his known faces back again. But alas! He is unable to mix with the human beings now because they resemble the 'Yahoos'! He is unable to mix, unable to talk, unable to share. So, what is to be done? Gulliver, leaving his wife and children, go to the stable and start to reside with the horses!

Should we abandon our society? Is that the solution? No. As a super being, you definitely have something to be done. First of all, we have to raise our own conscience. Without knowing and evaluating oneself, one cannot; rather should not judge others. It is easy to pick up on the faults of others. But it is much more difficult to do the same with oneself. Attaining the necessary moral qualities, we should help others in achieving them. If we can adapt to the saying of Rasul (SM) that we should do the things for others which we do not like for ourselves, then the change will definitely come.



জি এম এনায়ত আলী  
প্রভাষক, উদ্ভিদবিদ্যা



## ২২২২ সালের পৃথিবী কেমন হবে?

আগামী ২২২২ সালের পৃথিবী দেখতে কেমন হবে তা আমরা কেউ কি জানি? আসুন জেনে নেই ২০০ বছর পর আমাদের এই পৃথিবী কেমন হতে পারে। আমাদের অনুপস্থিতির সেই সময়টা কেমন হবে তা জানতে ইচ্ছে হয়। টাইম মেশিনে চড়ে অতীত বা ভবিষ্যতের দিনগুলিতে পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু তা তো বাস্তবে সম্ভব নয়।

ফলে অতীত সম্পর্কে নানা কথা জানা গেলেও, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানা বড়ই কঠিন। তবে ভবিষ্যৎ কেমন হবে, সেই সময়ের মানুষ কেমন হবে এবং পৃথিবী এখন ঠিক কোনদিকে এগোচ্ছে? এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি।

# সবার চেহারা প্রায় একই রকম হয়ে যাবে--- কী? শুনে অবাধ হচ্চেন? হ্যাঁ! অবাধ তো হওয়ারই কথা। কারণ ভবিষ্যতে আমাদের সবার চেহারা দেখতে প্রায় একই রকম হয়ে যাবে। এমনকি আমাদের গায়ের রং থাকবে অভিন্ন। পিতা-মাতারা তাদের সন্তানের চেহারাটি নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী যাতে বেছে নিতে পারেন সেজন্যই বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে জিনোম সিকোয়েন্সিং ম্যাপিং বের করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

১৯৯৬ সালের ৫ জুলাই ডলি নামের এক ভেড়ার জন্ম হয় গবেষণাগারে। ক্লোনিং পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীরা ডলির জন্ম দেন। আরেকটি ভেড়ার স্তনগ্রন্থি থেকে কোষ নিয়ে, সে কোষ ক্লোন করে বিজ্ঞানীরা ডলিকে তৈরি করেন। মার্কিন সঙ্গীতশিল্পী ডলি প্যাটনের নামে নাম রাখা হয় ডলির। স্কটল্যান্ডের রসলিন ইনস্টিটিউট ইন মিডলোথিয়ান-এর গবেষকদের গবেষণার অংশ হিসেবে ডলির জন্ম হয়। যেকোনো জীবন্ত প্রাণীর জিন থেকে অবিকল আরেকটি প্রাণী তৈরি করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াই হচ্ছে ক্লোনিং।

দীর্ঘদিনের চিন্তা-ভাবনা, কাটাছেঁড়া, তর্ক-বিতর্কের বেড়া জাল

পেরিয়ে বিজ্ঞানীদেরই হাত ধরে জন্ম হয়েছে এই বাঁদর শিশুদের। এরা দেখতেও ছবছ এক। চোখ, কান, নাক, চালচলন- কেথাও এতটুকু ফারাক নেই। ঠিক যেন একটি, অন্যটির 'ছবছ কপি'। আদর করে তাদের নাম রাখা হয়েছে 'ঝং ঝং' এবং 'ছ্যা ছ্যা'।

সেই আবিষ্কারের খবর গত ২৪ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'দ্য সেল'-এ।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় 'ঝং ঝং' আর 'ছ্যা ছ্যা' কি যমজ? উত্তর হবে- হ্যাঁ। তবে এরা একে অপরের 'অনুরূপ প্রতিলিপি'। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে 'ক্লোন'।

বায়োনিক চোখ-পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শরীরেও পরিবর্তন সংঘটিত হয়। একদল গবেষক 'বায়োনিক চোখ' নামে একধরনের যন্ত্র তৈরি করছেন যার মাধ্যমে অন্ধরাও দৃষ্টি ফিরে পাবে। এমনও হতে পারে বায়োনিক চোখের উন্নতির মাধ্যমে দৃশ্যমান আলোর বাইরের আলোও মানুষ দেখতে পারবে। যেমন ইনফ্রারেড রশ্মি কিংবা এক্স-রে। ইনফ্রারেড রশ্মি বা অবলোহিত আলোর প্রতি চোখ সংবেদনশীল হলে মানুষ অন্ধকারেও দেখতে পাবে।

# মানব শিশুর জন্ম হবে রোবটে প্রতিস্থাপিত জরায়ুতে- সুইডেনের গথেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সলগ্লেনস্কা একাডেমি হাসপাতালে কিছুদিন পূর্বে এক ছেলেশিশু জন্মগ্রহণ করেছে। তাকে আর দশটা সাধারণ শিশুর মতোই দেখালেও এই ছোট শিশুটি মানব ইতিহাসে প্রথম শিশু, যাকে একটি রোবট জরায়ু প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচার করে জন্ম দিয়েছে। শিশুটির ওজন ৬ পাউন্ডের কিছু বেশি। তার মায়ের জরায়ুর সমস্যা থাকার কারণে রোবটে প্রতিস্থাপিত জরায়ুতে তার জন্ম হয়। নারীরা নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত কৃত্রিম প্রজনন দ্বারা গর্ভধারণ করবে।

# মানুষের বসবাস-পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এক বক্তব্যে বলেছিলেন, পৃথিবী আর সর্বোচ্চ এক হাজার বছর বাঁচবে। এই কথাটি যদি সত্য বলে ধরে নেই, তাহলে আজ থেকে এক হাজার বছর পরে মানব জাতির বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হতে পারে মহাকাশে নতুন বসতি স্থাপন করা। যেহেতু আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটি রীতিমত বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে, তাই মানুষ পৃথিবী ছেড়ে বসবাস শুরু করবে অন্য গ্রহে। পৃথিবীর গণ্ডি পেরিয়ে অন্য কোনো গ্রহে মানব বসতি স্থাপন করা এখন সময়ের ব্যাপার। এক হাজার বছরের মধ্যে গ্রহে গ্রহে ভ্রমণ হয়ে যাবে আজকের দিনে পিকনিক স্পট ভ্রমণের মতো। বেশি দূরে না গিয়ে মঙ্গল গ্রহের কথাই বিবেচনা করি। মঙ্গল গ্রহে মানুষ বসবাস করার জোর সম্ভাবনা আছে। সেখানে বসবাসকারী মানুষের শারীরিক পরিবর্তন, পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের শারীরিক পরিবর্তনের চেয়ে ভিন্নভাবে হবে।

\* ফ্লেক্সিবল বিল্ডিং- কমান্ডের মাধ্যমে বিল্ডিং ছোট-বড় করা যাবে, কথাটি শুনে বেশ অবাক লাগলেও প্রযুক্তির আদলে বিল্ডিংগুলো ভাঙ করে ছোট কিংবা বড় করতে পারবে। বর্তমানেই কিছু ফার্নিচার প্রয়োজনে ফোল্ড করে রাখতে পারি, আবার চাইলে বড়ও করতে পারি। ঠিক তেমনি বিল্ডিংগুলো ভাঙ হয়ে থাকবে সেগুলো কে নির্দেশ দিলেই বহুতল ভবনের মতো উঁচু হয়ে উঠবে। শীতকালে তাপ সংরক্ষণ করতে এবং গ্রীষ্মে তাপকে দূরে রাখার জন্য বেশিরভাগ ভবন সংস্কার করা হবে। ১০০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর বিল্ডিং গুলো ফ্লেক্সিবল হতে পারে, যা ইচ্ছেমতো ভাঙ করে ছোট বড় করা যাবে।

\* সমুদ্রের পানিতে ডুবে যাবে - গ্রীষ্মকাল আরও উষ্ণ এবং শীতকাল আরও শীতল হয়ে উঠবে। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে হিমবাহ গলবে যার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। খরা ও বনের দাবানল বাড়তে থাকবে।

বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, বৈশ্বিক উষ্ণতায় সমুদ্রপৃষ্ঠ আগামী ২০০ বছরে পৃথিবীর অনেক দেশই সমুদ্রের পানিতে ডুবে যাবে।

# কৃত্রিম খাদ্যের বিকাশ-কীভাবে কৃত্রিম খাদ্যের বিকাশ ঘটবে এবং মানুষ ভবিষ্যতে কী ধরনের খাদ্য খাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন বলে মনে করি, কারণ "কৃত্রিম খাদ্য" শব্দটি বোঝা খুব কঠিন। প্রত্যেকেই তাদের শরীরের জন্য ঠিক কতগুলি কার্বোহাইড্রেট, চর্বি, প্রোটিন, ভিটামিন এবং অন্যান্য পুষ্টির প্রয়োজন তা জানতে পারবে সহজে। আমাদের দেহগুলি ডিটেকটিভ সেন্সর দিয়ে সজ্জিত থাকবে, যা আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় কিছুর অনুপস্থিতি বা অস্বাভাবিকতা ঘটলেই তাৎক্ষণিক এলার্ম দিয়ে জানাতে পারবে।

# মানুষ বেঁচে থাকবে প্রায় ২০০ বছর অথবা তার বেশি- বৃদ্ধ

হতে আমরা কেউই চাই না, আর তাই বৃদ্ধ হওয়াটাকে পুরোপুরিভাবে ধীরগতি করার বা থামানোর জন্য চলছে বিস্তারিত গবেষণা। এই গবেষণার ইন্ধন যোগাচ্ছেন বৃদ্ধ হতে না চাওয়া বড় বড় ধনী ব্যক্তিরা। যে ক্রোমোজোম বা সোম্যাটিক টিস্যুর কারণে আমাদের দেহ বা বয়স বেড়ে যায়, সেই জিনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই গবেষণা করে যাচ্ছেন গবেষকরা। এই গবেষণার ফল হয়তো আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে প্রায় ২০০ বছর অথবা তার বেশি সময় বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে। মানুষের দেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত আর এই অসংখ্য কোষের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমের একটি অংশ হল টেলোমিয়ার। টেলোমিয়ার বিভাজিত হওয়ার ভিত্তিতে মানুষের বেঁচে থাকা নির্ভর করে। বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছে এই টেলোমিয়ারের বিভাজনকে বিপরীত দিকে পরিচালিত করে অথবা টেলোমিয়ারের বিভাজন রোধিত করে গড় আয়ু ২০০ বছর বা তার অধিক করা যায় কিনা? মানুষ এমনও চিন্তা করছে যে কিভাবে অমরত্ব লাভ করা যায়। তা নিয়েও গবেষণা চলছে প্রতিনিয়ত।

# বুদ্ধিমান কম্পিউটার-২০১৪ সালের একটি সুপার কম্পিউটার আজ অবধি মানব মস্তিষ্কের সর্বাধিক নির্ভুল সিমুলেশন তৈরি করেছিল। এখন থেকে ঠিক এক হাজার বছর পর কম্পিউটার কাজ করবে এমন গতিতে যা সাধারণ কম্পিউটারের করতে প্রায় দশবছর সময়ের প্রয়োজন। কোয়ান্টাম কম্পিউটারগুলি স্থান অনুসন্ধান, কার্যকর ঔষধ ও রোগ নির্ণয়ে রাখবে কার্যকর ভূমিকা। এই সুপারফাস্ট ও বুদ্ধিমান কম্পিউটার নিজেই মোটর গাড়ি চালাতে সক্ষম হবে। তবে একইসাথে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং গোপনীয়তা ও তথ্য সুরক্ষার জন্য হুমকির কারণও হতে পারে।

# সব ধরনের ভাষা বুঝতে পারবে মানুষ--

ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, এখন থেকে ১০০০ বছর পর মোট ভাষার প্রায় ৯০ শতাংশ কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে এবং বাকি ভাষাগুলো থাকবে সবার বোধগম্য। আবার এমনটিও হতে পারে যে, আমাদের সবাইকে মাত্র একটি ভাষা ব্যবহার করে ভাবের আদান-প্রদান করতে হবে। আবার এমনটিও হতে পারে যে, যেকোনো ভাষাকে ট্রান্সলেশন এর মাধ্যমে তার নিজের ভাষায় পরিণত হবে অটোমেটিক্যালি।

# দেড়শ বছর বয়স্ক যুবক-একদল গবেষক আফ্রিকায় এমন কিছু শিশুর সন্ধান পেয়েছেন যারা HIV- তে আক্রান্ত হয়েও দিব্যি সুস্থ জীবন পার করেছে। তাদের জিনে এমন কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে যেটি HIV ভাইরাসকে প্রতিহত করে এবং

দেহ থেকে এইডসকে দূরে রাখে। জিনের কোন অংশে কোন ধরনের কাজ সম্পাদন করলে, কোন রোগ প্রতিহত হবে এটা জানতে পারলে মানুষ নিজেরাই দেহের মাঝে অনেক নিশ্চিত প্রাণঘাতী রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে। এই প্রক্রিয়া ব্যবহারে মানুষের বৃদ্ধি হবার প্রক্রিয়াকেও থামিয়ে দেয়া সম্ভব। তখন সকল মানুষ হবে চির তরুণ। দেখা যেতে পারে দেড়শ বছর বয়স্ক যুবক।

রোবট টেকনোলজি/ন্যানোবট- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে এমন রোবট উৎপাদন করা সম্ভব হবে যাতে মানুষকে আর নিজে কোন কাজ করতে হবে না। গৃহস্থলীর সব কাজই রোবট করবে। মানুষের শয্যাসজিনী, বিনোদন, সন্তান উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে এমন কোনো কাজ থাকবে না যা রোবট করতে পারবে না।

# পৃথিবীর পরিণতি-

কোরআনের ভাষ্য, 'যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে।' (সুরা তাকবির : ১১)।

'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার

মতো হয়ে যাবে।' (সুরা রহমান : ৩৭)।

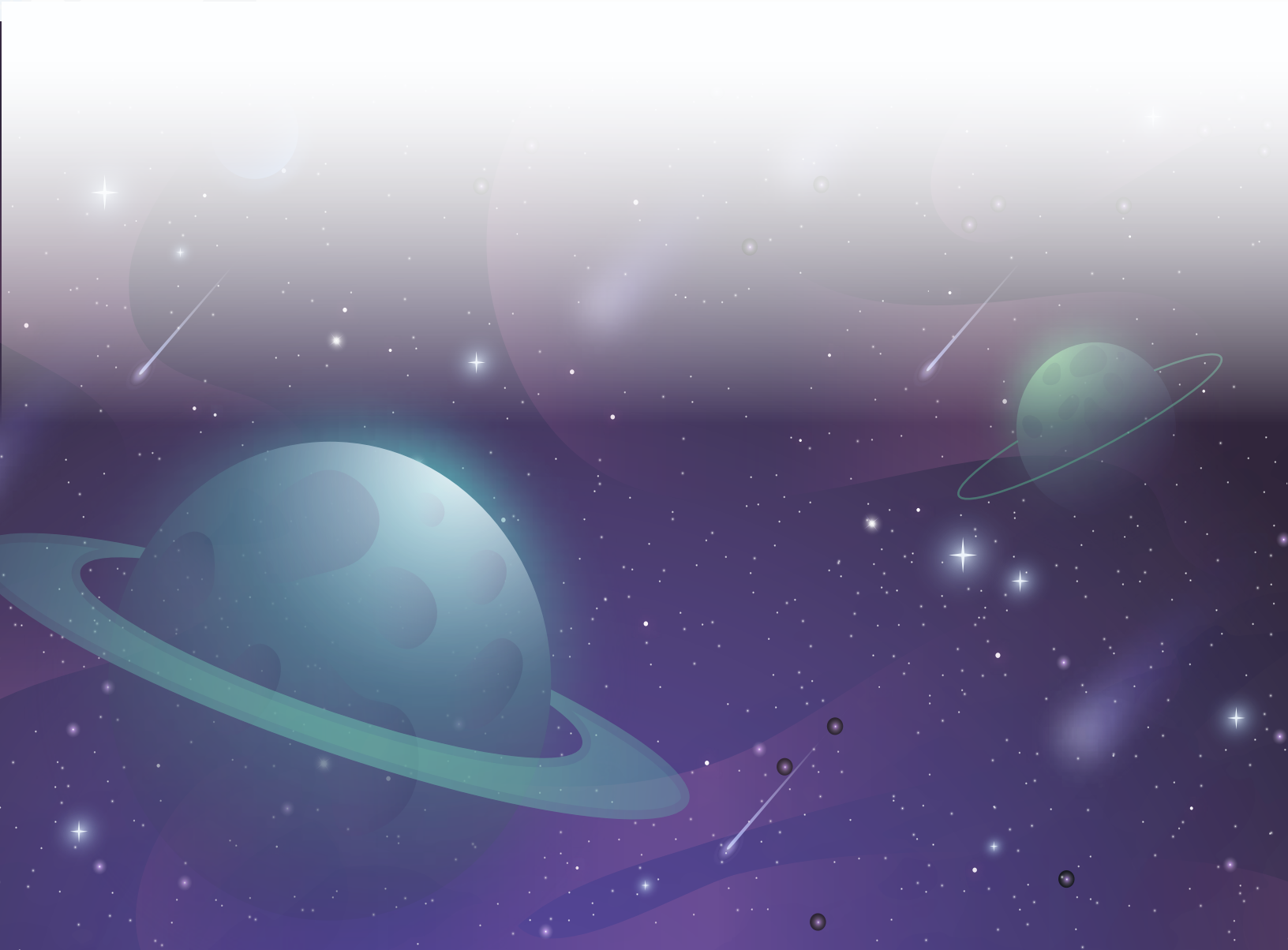
'সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মতো।' (সুরা মাআরিজ : ৮)।

'পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো।' (সুরা কারেয়া : ৫)।

'যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে।' (সুরা তাকবির : ১-২)

শুধু প্রাণের অস্তিত্ব-ই শেষ নয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সূর্যের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে সৌরজগতের সবচেয়ে সুন্দর গ্রহটি। কার্যত গোটা সৌরজগৎ-ই সে সময় ধ্বংসের মুখে পড়বে। ছাড় পাবেনা একটি গ্রহ-ও। কিন্তু কবে আসবে সেই দিন?

বহুদিন ধরে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মানুষ। অবশেষে বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন সেই উত্তর। আমাদের নক্ষত্র সূর্য এখনও যৌবন অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু আজ থেকে সাড়ে ৫ বিলিয়ন বছর পর বদলাবে সমগ্র চিত্র। সূর্য নিজের শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করবে।





ড. আবদুল কুদ্দুস  
প্রভাষক, দর্শন

## কষ্টের প্রতি ভালোবাসা

“আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি”-কথাটি কবি নজরুল যে কারণেই বলেছিলেন এর সহজ অর্থ হচ্ছে প্রচণ্ড কষ্টের ভেতরও সুখে থাকা যায়। আসলে যারা সব সময় সুখে থাকেন তাদের কাছে সুখ আসে না, বরং পরিশ্রম ও কষ্টের মাঝেই সুখ যদি সেটি করা হয় কোনো ভালো কাজের জন্য। তবে পরিশ্রম অবশ্যই শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের হতে হবে।

আমরা জানি, পৃথিবীর মহামানবদের সফলতার প্রধান কারণ কঠোর পরিশ্রম। উন্নত রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা প্রায়শ অভিভূত হই; অথচ সেগুলোর উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রমই ছিল বেশি দায়ী। কিন্তু আমরা সবাই খুব অল্প পরিশ্রমে মহামানব কিংবা উন্নত জাতি হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি। ইউরোপ-আমেরিকা-চীন-জাপানের গগণচুম্বী অটালিকা ও বর্তমান নাগরিকদের বিলাসী জীবন দেখে আমরা ভাবি এটাই তো আমাদের হওয়া উচিত। কিন্তু ভাবি না, এই অবস্থায় আসতে তাদের পূর্বপুরুষদের কী পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে। এখন তাদের অনেকেই এত বেশি উপার্জন করেন যে, স্বাভাবিক ব্যয় বাদ দিয়েও পরিবারসহ প্রতি মাসে বিদেশ ভ্রমণ করার মতো যথেষ্ট অর্থ-কড়ি তাদের হাতে থাকে, যা আমাদের মতো গরীব রাষ্ট্রের মানুষ ভাবতেও পারে না। তবে আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ অচেনা সম্পদের মালিক হয়ে তাদের মতো বিলাসিতায় বাঁপিয়ে পড়ছেন। আর অন্যরা তাদের দেখে শুধু হাছাকার করছেন, কেন আমাকে খোদা তাদের মতো সম্পদ দিল না! তবে একটি সংখ্যা আছে, যদিও তারা সামান্য, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নিজেকে এবং দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিতে।

একজন আব্রাহাম লিংকন, নিউটন, আইনস্টাইন, স্টিভ জবস, মাহাথির মোহাম্মদ, আবদুর রহমান সুমাইত কিংবা ম্যারাডোনা,

রোনাল্ডো, মেসি হওয়ার জন্য জীবনে কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টকে ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই। অন্যের সুন্দর জামা কাপড়, বাড়ি গাড়ি, সাজ সজ্জা দেখে দুশ্চিন্তা ও হতাশায় পড়ার কী দরকার? বরং নিজের আত্মসম্মান বা প্রেস্টিজের চিন্তা বাদ দিয়ে কাজের মধ্যে ডুব দিলেই তো মণিমুক্তা আহরণ করা যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকালীন খন্দকের যুদ্ধের সময় একদিকে লিডিং দিচ্ছেন অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করছেন। না খেয়ে মাটি খননের কাজ করতে গিয়ে তিনি পেটে দুটি পাথর বাঁধেন ক্ষুধার কষ্ট দূর করার জন্য। একজন সঙ্গী অভুক্ত থেকে একটি পাথর পেটে বেঁধে লিডারকে দেখাতে এলেন তাঁর কত কষ্ট হচ্ছে। নবীজী শুধু নিজের পেটের কাপড়টুকু উঠিয়ে

দেখালেন, আর কিছু বললেন না। তাঁর প্রেসিডেন্সির দায়িত্ব পালনের সময় লেবারের মতো খাটতে একটুও প্রেস্টিজে বাঁধেনি। তিনি দীর্ঘ জীবন পাননি, কিন্তু যতদিন জীবিত ছিলেন সুশৃঙ্খল চলাফেরার কারণে দুর্বলতা, রোগব্যাদি, জ্বর স্পর্শ করতে পারেনি, কখনো শরীরে মেদ জমতে দেননি। তাঁর হাটার সময় সাহাবীরা পেরে উঠতেন না, মাঝে মাঝে দৌড়াতে হতো তাদের। পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি তাঁর হাতে ছিল, কিন্তু সামান্যতম বিলাসিতারও আশ্রয় নেননি, বরং তিনি বিলাসিতাকেই মুসলিম জাতির অধঃপতনের বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করে যান। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বচন। পৃথিবীর সব উন্নত সভ্যতা বা ব্যক্তির অধঃপতনে বিলাসিতা সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে।

সক্রেটিস তাঁর সৈনিক জীবনে শীতের দিনে বরফের উপর খালি পায়ে প্যারেড করতেন; শত্রুর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে কীভাবে সহজে যুদ্ধ জয় করা যায় তাও তিনি রপ্ত করেন। কখনো

বিশৃঙ্খলাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু এই পরিশ্রমী সৈনিকই যখন ভাবনার জগতে চলে যেতেন তখন তাঁর সামনে দিয়ে কে হেঁটে গেল তিনি দেখতেন না। অর্থাৎ তাঁর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম প্রায় একই রকম ছিল। আমরা সাধারণত রিকশাওয়ালা বা নির্মাণ শ্রমিকদের পরিশ্রম দেখে মনে করি তারা কত কঠিন পরিশ্রম করছেন। কিন্তু তারা অধিকাংশই তাদের অবসর সময় বা বিরতির সময়টাকে অলসভাবে ব্যয় করেন। একারণে তাদের জীবনে যতটা স্বচ্ছলতা, সুখ বা সৌন্দর্য সম্ভব ছিল সেটি থেকে তারা বঞ্চিত হন। আবার অনেক চাকুরিজীবী, ডাক্তার, স্থপতি, শিক্ষক, অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এতটাই মানসিক কাজে ব্যস্ত সময় কাটান যে, তাঁরা শরীরকে শ্রমে নিয়োগের কথা একেবারে ভুলে যান, নানান পুষ্টিকর খাবার খান, কিন্তু সেগুলো শরীরের বরং ক্ষতি করে। ফলে তাঁরা নিজেরা যে সুখ পাওয়ার কথা সেটি পান না। হেলিকপ্টার বিমানে চড়েন, এসি গাড়ি-বাড়িতে থাকেন; কিন্তু দেহে শক্তি নেই, তাই মনেও অশক্তি।

আমরা নিজেরা যখন দেহ ও মনকে সমানভাবে পরিশ্রমী করে তুলতে পারবো তখন আমাদের নিজেদের ও দেশের অনেক দ্রুত উন্নয়ন করতে পারবো। উন্নয়ন বলতে আবার বিশাল বড় ফ্ল্যাটের মালিক, গাড়ির, বাড়ির মালিক হওয়া নয়, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি নয়। বরং মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। আমার হাতে যে বাড়তি পয়সা আছে সেগুলো অনাগত দুর্ঘটনা বা বিপদের জন্য কিংবা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য কিংবা কোটিপতি হওয়ার জন্য সঞ্চয় করে নয়, বরং হাসপাতালে যে শিশুটি অর্থের অভাবে ঔষধ কিনতে পারছে না, মায়ের চোখের সামনে তিলে তিলে সন্তান জীবন দিচ্ছে তার জন্য ফান্ড তৈরি করে, দরিদ্র যে শিশুটির অর্থের অভাবে পড়া লেখা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার জন্য ব্যয় করে উন্নত সমাজ গড়া যায়। মহানবী (সা.) তাঁর সময়ের দরিদ্র সঙ্গীদের অভাবের কারণে কখনো দুশ্চিন্তা করেননি, বরং দুশ্চিন্তা করেছেন কিছু দিন পরে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম যে বিশাল সম্পদের মালিক হয়ে বিলাসিতা করে ধ্বংস হয়ে যাবে তার জন্য।

মানুষ কোন কাজে পরিশ্রম করবে? একসময় মানুষ ভাবল, প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবেশ তাদেরকে বিপদে ফেলছে। যেমন, পাহাড়ের কারণে রাস্তা বানানো যাচ্ছে না, নদীর কারণে তীর ভেঙে বাড়িঘর ধ্বংস হয় ইত্যাদি। এজন্য মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে পাহাড় কেটে রাস্তা বানালো, নদীতে বাঁধ দিয়ে নদীকে মেরে ফেলল, বাঘ-সিংহ, সাপ-নেউলকে ইচ্ছে মতো মারল, বন-গাছপালা উজাড় করে তৈরি করল বাড়ি। এখন ভাবছে, তারা বড় ভুল করে ফেলেছে। তাই এবার এগুলোকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ শুরু করল। বর্তমানকালের যুবসমাজ আরেক ধরনের নতুন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে: নিজের দেহের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও

দাবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কঠোর পরিশ্রমের এই যুদ্ধ এখন তাদের নিকট খুব জনপ্রিয়। সংক্ষেপে সেটি হচ্ছে, রাতে ঘুমের পরিবর্তে দিনে ঘুম, ভোরে নাশ্তার পরিবর্তে দুপুর বেলায় নাশ্তা, সন্ধ্যায় নৈশ খাবারের পরিবর্তে শেষ রাতে খেয়ে ঘুমানো। কী বিচিত্র মানুষের পরিশ্রম! বৃক্ষের সবুজের পরিবর্তে যান্ত্রিক সবুজে, পাখি-ভ্রমরের গানের পরিবর্তে অডুত যন্ত্র কানে লাগিয়ে, স্বাভাবিক পানির পরিবর্তে শক্তিবর্ধক পানি (!) বা বায়ুতে এখন তারা মজা পায় বেশি। চোখ, নাক, কান, জিহ্বা, পেট ও ত্বকের সুখের জন্য এতই অস্থির হয়ে পড়ছে যে, এগুলোকে ধ্বংসই করে দিচ্ছে। আশি বছর বয়সেও যেগুলোর সুখের প্রয়োজন, অথচ পনের/বিশ বছরেই সেগুলো নষ্ট করে ফেলছে। মাট-সত্তর বছরে হাসপাতালের বিছানায় গড়াতে গড়াতে জীবন যাবে, পরের সাহায্যের আশায় হা করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কিছু করার থাকবে না। আমরা অনেকেই জানি না, প্রকৃতির রাজ্যে লক্ষ বছরেও কখনো নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি, ভবিষ্যতেও ঘটবে না। সুতরাং প্রকৃতির নিয়মের সাথে অহেতুক যুদ্ধ না করে বরং খাপ খাইয়ে নিজের শ্রমের পরিকল্পনাই হচ্ছে সবচেয়ে গর্বের ও বুদ্ধিমানের কাজ।

পরিশ্রম করা আমরা কখন শিখবো বা কে শেখাবে? উত্তর হচ্ছে ছোট বেলাতেই শিখতে হবে এবং সবার আগে বাবা-মায়ের কাছ থেকেই শিখতে হবে। নিজের পায়ে স্বনির্ভর হয়ে চলার যোগ্যতা সৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব বাবা-মায়ের। যে কাজগুলো কর্মচারী দিয়ে আমরা করিয়ে থাকি সেই কাজগুলোর অধিকাংশই আমরা নিজেরা ও সন্তানকে দিয়ে করাতে পারি। নিজের খাবার নিজে খাওয়া, খাবারের পাত্রগুলো ধুয়ে পরিচ্ছন্ন রাখা, নিজের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা, জুতা পরিষ্কার রাখা, ঘর পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে রাখা- এই কাজগুলোতে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কারো জন্য কখনো কল্যাণকর নয়। কাজের জন্য অভ্যাস করা শিখতে হয়। সন্তানকে শেখাতে হলে অবশ্যই বাবা-মাকে আদর্শ হতে হয়। আমার সন্তানকে আমার চেয়ে পৃথিবীর কেউ বেশি ভালোবাসে না। সেই সন্তানের সুন্দর চরিত্রের জন্য আমার খারাপ স্বভাবগুলো আজ থেকে বাদ দিতে শুরু করি।

ভালো কাজের অভ্যাসই আমাদের চরিত্র গঠনের প্রধান উপায়। অভ্যাস তৈরি হয় দিনের পর দিন একই সময় একইভাবে একই কাজ করার মাধ্যমে। ছোট বেলা থেকে সেটি শুরু করলে সেটি সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়। সারা জীবন প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে উঠতে হলে এবং রাত এগারোটায় আগে ঘুমাতে হলে সাত-আট বছর বয়স থেকে ক্রমাগত পনেরো বছর পর্যন্ত অভ্যাস করতে হবে। তাহলে বাকী জীবন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই নিয়মের অধীনে চলে যাবে। এভাবে নিয়মিত একই সময়

গোসলের অভ্যাস, খাবারের অভ্যাস, শরীর চর্চার অভ্যাস মানুষকে আমৃত্যু সুস্থ জীবন যাপনে সাহায্য করে। তবে এজন্য অবশ্যই দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির প্রয়োজন আছে।

মানুষের মানবিক মূল্যবোধগুলো কখনো পরিবর্তন হয় না এবং হবেও না। সত্য কথা বলা ও অন্যের ক্ষতি না করা এমন চিরন্তন মানবীয় মূল্যবোধ যা দেশ-কাল-ধর্ম-সভ্যতা-দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য সবকিছুর উপরে। পাশ্চাত্যের একজন মনীষী বলেছেন, “তুমি সন্তানকে যদি তিনটি R শিক্ষা দাও এবং চতুর্থ R বাদ দাও তাহলে পঞ্চম R পাবে। তিনটি R হচ্ছে Reading, Writing, Arithmetic, চতুর্থ R হচ্ছে Religion, পঞ্চম R হচ্ছে Rascal বা বদমাশ”। বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট প্রায় দশ বছর গবেষণা করে একটি বই লেখেন, যেখানে তিনি দেখান ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। নাস্তিকগণ তাঁর যুক্তিগুলো পেয়ে ভীষণ খুশি হন। কিন্তু তিনি লক্ষ করেন, যে ভৃত্য তাঁকে প্রতিদিন খাবার পানীয় তৈরি করে দিচ্ছে সে এখন প্রায়ই কান্না করছে। তিনি জানতে পারলেন আসলে ঈশ্বরকে নিয়েই এই ভৃত্যের জীবনটা এতদিন আনন্দময় ছিল, কিন্তু এখন সেই ঈশ্বরকেই তার মনিব অস্বীকার করে বসল। কান্ট এই কান্নায় প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে গেলেন। আবার ভাবনার জগতে ডুবে গেলেন কয়েক বছরের জন্য। লিখলেন এক অমর রচনা, যেখানে তিনি প্রমাণ করলেন, ঈশ্বর ও পরকালের ধারণা ছাড়া নৈতিকতার ধারণা একেবারেই অপূর্ণ থেকে যায়।

যে বাবা-মা মনে করেন সন্তান সব শিখুক কিন্তু ধর্মটা পরিণত বয়সে গিয়ে শিখলেই চলবে তাঁরা আসলে সন্তানের ক্ষতি করে ফেলেন। ধর্ম আমাদের মনের ভেতর এমন এক অদৃশ্য কিন্তু সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সত্তার অনুভূতি সৃষ্টি করে যিনি সব

সময় আমাদের সমস্ত কথা ও কাজকর্ম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তাঁর সামনে একদিন সমস্ত মন্দ ও দায়িত্বহীন কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এই অনুভূতির চর্চা ও অভ্যাস শৈশব থেকেই শুরু করতে হয়। বিবেক বুদ্ধির উন্নতির সাথে সাথে এই অনুভূতির উন্নতির সমন্বয় হলে বাবা-মা, শিক্ষক এমনকি সিসি ক্যামেরাকে ফাঁকি দিয়ে কেউ অন্যায় কাজে আনন্দ পাবে না, বরং এক অজানা ভয় তাকে ধীরে ধীরে সংশোধন করে দেবে। ইসলামে এই অনুভূতি সৃষ্টির জন্য শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায অত্যাবশ্যিক করা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মেও আছে বিভিন্ন রীতি পদ্ধতি।

আবারও বলছি, মানুষের চরিত্র গঠিত হয় অভ্যাসের মাধ্যমে। অভ্যাস সৃষ্টিতে প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রমের। এটি মনোবিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব। বিগত প্রায় একশত বছর মনোবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে এবং ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে। পবিত্র কুরআনের ধর্মীয় বা পরকাল কেন্দ্রিক অদৃশ্য বিষয়াবলির ধারণাকে বাদ দিলেও দেখা যায়, এটি এমন এক উন্নত মনোবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নির্দেশনায় পূর্ণ যার সাথে আধুনিক শরীর ও মনস্তত্ত্ববিদগণের কথাগুলো অনেকাংশে মিলে যাচ্ছে। মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ভালো ও চরিত্রবান মানুষ গড়তে কুরআনের এসব ফর্মুলা অত্যন্ত কার্যকরী। আমরা সবাই নিজেদের ও আমাদের সন্তানদের উপর এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে আরো সুন্দর হতে পারি। এভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র একদিন সত্যিকার উন্নয়নের স্বাদ পাবে। সেই লক্ষ্যে অন্তত আশি বছরের শ্রমের একটি পরিকল্পনা করি। তারপর দৈনিক, মাসিক ও বার্ষিক কাজের রুটিন করে ধারাবাহিকভাবে এগুতে থাকি।







ফাহমিদা আক্তার  
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ



## ‘আমি কখনো শিক্ষক হতে চাই নি, কিন্তু...’

যাত্রাটা শুরু ২০১১ থেকে।

কলেজের পিছনের গেইট দিয়ে কলেজের ভেতর ঢুকেছিলাম। ২ নাম্বার বিল্ডিংয়ে (এরকমই বলেছিল লাভণি, জাবি ৩৪) যাব। হাঁটছি ত হাঁটছিই। অনভ্যস্ত শাড়ি পরা হাঁটা যাকে বলে। গলা শুকিয়ে গেছে অলরেডি। কুদরতের পাশ দিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে (তখন অবশ্য জানতাম না মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটা নিষেধ) ২ নাম্বার খ্যাত বিল্ডিংয়ে ঢুকলাম। লাভণি বলল ১ নাম্বার বিল্ডিংয়ে যা, এবি ম্যাডামের সাথে যোগাযোগ করবি। আমি ভেবেছিলাম এবি হয়ত বিদেশি কোনো নাম। নামের শর্ট ফরমের বিষয়টা তখন জানতামই না। গেলাম। ডেমো, ভাইভা। আমার চাকরি হয়ে গেল দিবা শাখায়। সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম জীবন বড় অদ্ভুত কিছুই সম্মিলন। তখন পার করছিলাম আমার জীবনের সবচেয়ে জঘন্য সময়। পাশ করেছে ৩ মাস, চাকরি নাই, টাকা নাই, বাসায় মা বোন কিভাবে দিন গুজরান করছে জানি না। বিশাল জাহাঙ্গীরনগর স্বর্গ থেকে এসে পড়লাম একেবারে যুপচি আজিমপুরে। আমাদের হলের টয়লেটের চেয়ে ইঞ্চি কয়েক বড় একটা রুমে অচেনা দুই মেয়ের সাথে থাকতাম। ডিপ্রেশনের চরমে চলে গিয়েছিলাম। প্রায় রাত না খেয়ে টাকা বাঁচাতাম। রাতে খুব খিদা লাগলে ছাদে গিয়ে বসে একা একা কাঁদতাম। হয়ত মরেই যেতে চাইতাম, সাহস ছিল না। ধর্মের ভয় ত ছিলই। বরাবরই আমি আল্লাহকে বেশ ভয় পাই। কারণ আমি ইনস্ট্যান্ট শাস্তি পাই আমার খারাপ কৃতকর্মের। যাই হোক। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ আমাকে ডিপ্রেশন থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। ১০০০০ টাকার চাকরি আমার কাছে

তপ্ত মরুভূমিতে দিক হারিয়ে যাওয়া এক মেয়ের বেঁচে থাকার জীবনকাঠি ছিল। তাই আমৃত্যু আমি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ এর কাছে ঋণী থাকব। আর তাই আমার টানটাও একটু বেশিই মনে হয়। পরদিন আমার জীবনের চরম একটা দিন ছিল। শুরু করলাম ক্লাস। অবাধ হলাম এই দেখে যে এই কলেজের ছাত্ররা এত জানে কীভাবে!! আমি ত গ্রামের স্কুলে পড়েছি। আমাদের স্যাররা (ম্যাডাম ছিল ২জন, তাও তাদের ক্লাস পাইনি) ক্লাসে এসে পড়া দিয়ে ঘুমাত নয়ত মারত। পরে বুঝেছি। বলছি না শতভাগ, তবে এই স্কুলের ৯৫% শিক্ষক আমার কাছে ছিল বিস্ময়ের বস্তু। ধীরে শুরু হল আমার শিক্ষক হবার শিক্ষা। দিবা শাখার স্টাফ হেমায়েত ভাই আর সুমন ভাইয়ের হাতে আমার হাতেখড়ি। তারা আমাকে শেখালেন এই কলেজের তরিকা। হেমায়েত ভাইয়ের ডায়লগটা আজো মনে আছে- "ম্যাডাম রেসিডেন্সিয়াল এমন এক জায়গা, এখানে আপনি ৩ মাস কাজ করলে পৃথিবীর কোনো জায়গার কাজ আপনার প্রেশার মনে হইব না। আপনার জাহান্নামে পাঠাইলেও আপনি জাহান্নামের দারোয়ানের লগে দু চারটা কথা কইয়া আসতে পারবেন"। মন্দ বলে নাই বা ভুল বলে নাই। ঘটনা সত্য। ৭ দিন পর জয়নুল আবেদিন হাউজে থাকার অনুমতি পেলাম কিন্তু প্রিন্সিপাল স্যারের আদেশ - কাল থেকে আপনি মর্নিং এ ক্লাস নিবেন। আমার মাথায় বাজ পড়ল। এত সকালে শাড়ি কখন পড়ব? (কারণ আমার শাড়ি পরতে তখন কমপক্ষে দেড়/২ঘণ্টা লাগত) কখন খাবো? কখন আসবো?? যাইহোক আসলাম। জেহিন ম্যাডামকে মিস ডাকায় খুব বিরক্ত হলেন। বললেন, আমি

বুড়ি মানুষ, আমাকে আপা বা ম্যাডাম ডাকবা। তারপর আমার প্রভাতি শাখায় যাত্রা শুরু হল।

মন খারাপ ছিল। ভোর ৪.৩০ এ উঠে ৬.৪৫ এ ঘর থেকে বের হয়েছি। ঘুম কাটেনা। আমি ছাড়া সবাই পার্মানেন্ট টিচার। অসহায় লাগছিল। কিছুক্ষণ পর টুকটাক কথা দিয়ে শুরু হল যাত্রা। মাহবুব হাবিব ম্যাডাম, জেহিন ম্যাডাম আশু আশু টাইপ আদর করতেন। তানবীরা ম্যাডামের কথা বলব না (বললে কম বলা হবে, সি ওয়াজ এন্ড ইজ মাই এঞ্জেল গার্ডিয়ান)। ধীরে ধীরে ভাল লাগা তীব্র হল। হাউজে থাকা, সেই ভাল লাগার সাথে বিক্রিয়া করল, সৃষ্টি হল ভালবাসা। আবাসিক ছেলেগুলো আমাকে একটু দূর দূর ভাবে লাগল (পরে অবশ্য ঠিক হয়ে গিয়েছিল)। আমি শিক্ষক হওয়া শিখতে লাগলাম। প্রথমে আমার ছেলেদের শিক্ষক, পরে বন্ধু, শেষে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত-‘মা’ হতে শিখে গেলাম। মনের অজান্তে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমার ছাত্র থেকে আমার ছেলে হয়ে গেল রেমিয়েনরা। এরপর বছর ঘুরতে লাগল আমার কখনো হল্লা করে, কখনো রাগ করে, কখনো হেসে, কখনোবা ওদের চলে যাওয়ায় কেঁদে (অবশ্যই লুকিয়ে)।

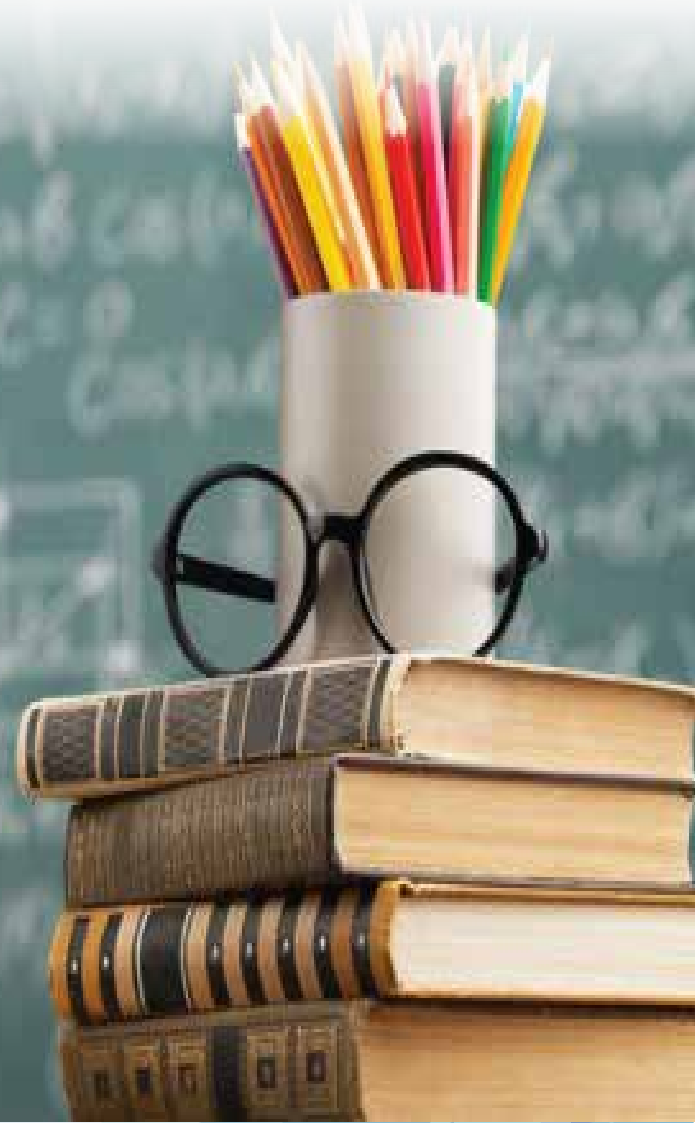
এখনো কোনো এক ক্লাস পিরিয়ডের ফাঁকা সময় জানালা গলে চোখ যায় মাঠের দূর সীমায়। ক্লাস থিতে পাওয়া আমার কবজি সমান বাচ্চাগুলো এই মাঠেই খেলতে খেলতে আমার মাথা ছাড়িয়ে বড় হয়ে গেছে। ওরা আমার চোখের সামনে বড় হল যাদের চোখের সামনে আমি বুড়ি হলাম।

আরো বড় হ তোরা। আমার আত্মার সন্তানেরা। একদিন দেখা হলে যখন আমায় দেখে বলবি, ম্যাডাম, এফএবি ম্যাডাম আমি!! তখন আমার ঈশ্বরের দেয়া ঝাপসা চোখ দুটো যেন তোদের মায়ায় আরো ঝাপসা হয়ে যায়। গলা ধরে আসায় কাঁপা গলায় তখন না চিনতে পারলেও দেখিস ঠিকই বলে উঠব- আমার বাচ্চা রে। কত বড় হয়ে গেসিস!! চুল কাটিস না কেন!!!

আমৃত্যু ভালবাসা তোদের জন্য, আমার শিক্ষক হবার বিদ্যাপীঠের জন্য।

আমি কখনো শিক্ষক হতে চাইনি, কিন্তু রেমিয়েনদের শিক্ষক হবার পর আর কখনো অন্য কিছু হতে চাই নি।

জয়তু



କବିତା

ଢ଼ଞ୍ଜା

ଲିଖନ-ପଠନ  
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ

ଧାଁଧା

କୌତୁକ





নাম: আজমাইন রহমান  
কলেজ নম্বর : ১৩৭৯৪  
শ্রেণি: ৩য়, শাখা : গ (দিবা)

## বাংলাদেশ

আমার প্রিয় সবুজ দেশ,  
বাংলাদেশ।

রক্ত দিয়ে কেনা দেশ,  
বাংলাদেশ।

বীরের দেশ নদীর দেশ,  
বাংলাদেশ।

ছবির দেশ কবির দেশ  
বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর সোনার দেশ,  
বাংলাদেশ।

তোমার আমার সবার দেশ,  
অমর হোক বাংলাদেশ।



নাম: কে এম শিমুল তাজ  
কলেজ নম্বর: ১৩১২৮  
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: খ (দিবা)

## মায়ের আশীর্বাদ

আশীর্বাদ কর মা আমাকে  
আশীর্বাদ কর সবে,

আমি যেন পৌছাতে পারি  
লক্ষ্যে।

নবতরী ডাকছে আমায়-  
করবো এখন যাত্রা,

পারবে না কেউ বুখতে আমায়-  
করুক মিছে ঠাট্টা।

স্বপ্ন জালে রেখেছি চরণ-  
উড়িয়ে দিলাম পাল,

ঝড়-তুফানে সাহস দিও মা,  
ছাড়বো না'তো হাল।

তোমার দোয়া আমার সাথে-  
কিসের আবার ভয়,

একদিন দেখবে তোমার ছেলে।  
আনবে ছিনিয়ে জয়।





নাম: মাহিম হোসাইন  
কলেজ নম্বর: ১৮৬৮৩  
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: খ (দিবা)

## স্বপ্ন

স্বপ্ন আছে, মনের ভিতর  
অনেক বড় হব।

বড় হয়ে নিজের জগৎ  
নিজেই আমি গড়বো।

লেখা পড়া করবো আমি  
রাখব সবার মান।

বড় হয়ে যুদ্ধে আমি  
লড়বো আশ্রাণ।

বড় হয়ে মানুষের পাশে  
থাকবো আজীবন।

মানুষের মতো মানুষ হব  
এটাই আমার পণ।



আহনাফ কবীর নিহাল  
কলেজ নম্বর: ১৩০৭২  
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: খ (দিবা)

## আমাদের দেশ

আমাদের দেশ স্বাধীন দেশ  
এই কথাটি বলতে আমার  
ভালো লাগে বেশ।

সবুজ ঘাসের ছায়ায় ঢাকা  
গাঁয়ের পথ আঁকা-বাঁকা,  
পাখিদের কলধ্বনি  
কান পেতে আমি শুনি।

যতই দেখি ততই আমার  
হয় না দেখার শেষ,  
সুন্দর একটি দেশ  
নাম তার বাংলাদেশ।



নাম: গাজী সামিউল হক  
কলেজ নম্বর: ১৭৮০৭  
শ্রেণি : ৫ম, শাখা : খ (প্রভাতি)

## মায়ের ভালোবাসা

ছোট্ট বেলায় আমায় যে মানুষ করেছে  
সে শুধু আমায় আদর করতে চেয়েছে।

আমায় আদব-কায়দা শেখায় যে  
দিতে চাই না তো কষ্ট সে।

পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেলে  
সে বলে এ যে আমার ছেলে।

আমার জন্ম তো তাঁর দ্বারা কৃত  
তাকে ছাড়া মনে হয় আমি মৃত।

নিজে না খেয়ে, বলে সে  
বাবা তুই খা।  
সে তো আর কেউ নয়  
সে আমার মা।



নাম: শারাব আলম  
কলেজ নম্বর: ১৭৮৮৬  
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

## চলো কিছু করি

যত দিন আছি আমি এই পৃথিবীতে  
সময় কাটাই মজা করে

সময় একবার শেষ হলে,  
পাবো নাকো আর ফিরে।

খেলবো ফুটবল, খেলবো ক্রিকেট  
আর খেলবো বুদ্ধির খেলা।

কিছুই করবো না বেশিক্ষণ  
যাতে কেটে যায় সারা বেলা।

মা-বাবাকে করবো শ্রদ্ধা  
বিধাতাকে করবো ভয়।

ভয়কে কখনো ভয় পাবো না,  
ভয়কে করবো জয়।

শিক্ষকের কথা মানবো চলে  
উপদেশ মানবো সবসময়।

এমন কিছু করবো না,  
যাতে শিক্ষক অসন্তুষ্ট হয়।

মন্দকে কখনো ভালোবাসব না  
মন্দর বিরুদ্ধে লড়ি,

জীবনটা ফুরিয়ে যাওয়ার আগে,  
চলো ভালো কিছু করি।



উজান মজুমদার  
কলেজ নম্বর- ১৭৮৫৬  
শ্রেণী: ষষ্ঠ, শাখা-গ (প্রভাতি)

## কালবৈশাখী

এলো এলো এলো রে  
কালবৈশাখী ঝড়  
মা দিল হুংকার  
দরজা বন্ধ কর  
বাবার কথা কত শুনছি  
আম কুড়ানোর গল্প  
আমরা থাকি দালান-কোঠায়  
বুঝি কি তার মর্ম?  
ঝড়ের দিনে আমার দেশে  
আম কুড়াতে সুখ  
বইয়ের কথা বইতে থাকে  
মনে লাগে দুখ।

দালান কোটা ছেড়ে দিয়ে  
এমন যদি হতো  
বজ্রপাতে ভয় না পেয়ে  
ছুটতাম ইচ্ছে মতো।



নাম: হাসনাইন নূর প্লাবন  
কলেজ নম্বর: ১৭৮৮০  
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

## চাঁদনি রাত

চাঁদনি রাতের মিষ্টি আলোয়  
ঝাঁঝিঁ পোকা ডাকে।

ঝাঁঝিঁ পোকাকার, ডাকটা শুনেই  
মনটা মেতে ওঠে।

রাতের আকাশে তারা যত,  
ঝিলমিল করে উঠে,  
অন্ধকার রাতে প্রকৃতি যেন  
নিসর্গ হয়ে ওঠে।

চাঁদনি রাতে চাঁদ হয়ে উঠে,  
সবার আপন মামা  
তাই তো সবাই মিষ্টি করে বলে  
চাঁদ মামা চাঁদ মামা।



নাম: সাদমান শাকিব রোহান  
কলেজ নম্বর : ১৮৬৬৫  
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: সি (প্রভাতি)

## হৃদয়ে ৫২ একর

উৎকর্ষ সাধনে অদম্য নীতি  
বুকে ধারণ করে,  
৫২ একরে প্রবেশ করি  
জ্ঞান অর্জনের তরে।  
প্রবেশপথে পা ফেলতেই  
সবুজ ঘাসের বুক  
৫২ একরের সবুজ বাগান  
মনে জাগায় সুখ  
জ্ঞানের পথে দাঁড়িয়ে আছে  
সবুজ গাছের সারি  
৫২ একর মোদের কাছে  
যেনো নিজের বাড়ি।  
মাঠে সবুজ, গাছে সবুজ  
সবুজ মোদের সবই  
৫২ একরে জেগে থাকে  
বাংলাদেশের ছবি।  
সবুজ ঘাসের গালিচাতে  
হৃদয় বাঁধা জানি,

৫২ একর মোদের কাছে  
মায়ের আঁচলখানি।  
জ্ঞানের সাধক শিক্ষাগুরু  
পিতা-মাতা তুমি,  
৫২ একর মোদের কাছে  
জ্ঞানের পুণ্যভূমি।  
সবুজের মাঝে জাগ্রত আছে  
লালন, জসীম, জয়নুলসহ কতো মহান নাম,  
৫২ একর মোদের কাছে  
প্রেরণার এক নাম।  
দক্ষ নাবিক আগলে রেখেছে  
সবুজ জ্ঞানের তরী  
৫২ একর পূর্ণ হবে  
জ্ঞানের ফসল ভরি।  
এমনি করেই মজবুত হোক  
শুদ্ধ জ্ঞানের শিকড়,  
কোটি মানুষের হৃদয়ে থাক  
আমাদের ৫২ একর।



নাম: আজমাইন চৌধুরী  
কলেজ নম্বর : ১০২৫৫  
শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: খ (দিবা)

## চিরঞ্জীব বুদ্ধিজীবীগণ

শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ  
৭১ এর মার্চে,  
প্রাণ হারালো কত ছেলে  
কত অভাগিনী মায়ের,  
ছাত্র-কৃষক-বুদ্ধিজীবী  
মায়ের ছেলে ছিল যারা,  
বিলিয়ে দিল প্রাণ  
অকাতরে তারা।  
বাঙালি জাতি ছিল  
কত জ্ঞানী-গুণীর ভাণ্ডার,  
কিন্তু তারা ভোগ করল  
মরণ মৃত্যু-যন্ত্রণা।  
বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল যারা  
তারা সেই বর্বর পাক বাহিনী,  
দেশকে মেধাশূন্য করতে  
হত্যা করেছে অনেক জ্ঞানী-গুণী।  
কিন্তু এ কাজ কি তারা একা করেছিল?  
না, তারা করেনি,  
দেশের মধ্যেই ছিল কত  
ষড়যন্ত্রকারী বাহিনী।  
বর্বর হত্যাকাণ্ডের সম্মুখীন হয়  
শহিদুল্লাহ, মুনীর, পারভীন,  
তাদের এ আত্মত্যাগের কথা  
বাঙালিরা মনে রাখবে চিরদিন।

বুদ্ধিজীবীদের হারিয়ে সেদিন  
আমরা হয়েছিলাম স্তব্ধ,  
আমাদের এ স্তব্ধতা  
কাটবে না কখনও।  
বাঙালিরা হারালো ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক  
শিক্ষক, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী,  
তাদের এ ত্যাগে যেন  
মন মরা হয়ে উঠেছিল বাঙালি জাতি।  
সেদিনের কথা মনে পড়লে  
বাঙালির মনে এখনও হাহাকার,  
সেদিন বর্বর পাক বাহিনীর  
মেরে ফেলল বুদ্ধিজীবীদের।  
এ দিন স্মৃতিসৌধ ভরে যায়  
পুষ্পমাল্য অর্পণ ও শ্রদ্ধায়,  
তাদের এ শ্রদ্ধার পেছনে রয়েছে  
শত শোকগাঁথা,  
রক্ত দিয়েও শহিদদের ঋণ  
শোধের নয়,  
প্রতিবছর আসে ১৪ ডিসেম্বর  
শহিদ স্মৃতির অমলিন দিন।  
রইল তাঁদের প্রতি শোক,  
রইল তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা,  
তাঁদের অবদান স্মরণ করে  
আমরা হয়ে উঠি যেন তাঁদের আশা।





নাম: আহম্মদ বেলাল  
কলেজ নম্বর : ১২৮৭১  
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: বি (দিবা)

### পড়ালেখা

আবু বলেন, রেগে রেগে  
অংক ইংরেজি পড়তে।

আম্মু বলেন, ভালো করে  
সমাজ-বিজ্ঞান পড়তে।

স্যার বলেন, পরীক্ষা সামনে  
তাড়াতাড়ি পড়ো।

ম্যাডাম বলেন, লক্ষ্মী সোনা  
বাংলাটা ধরো।

কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়ি  
চিন্তার নেইতো শেষ।

জীবনটাকে গড়তে হলে  
পড়ার নেইতো শেষ।



নাম : মো: রেদওয়ান হক  
কলেজ নম্বর: ১০২৫৮  
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: খ (দিবা)

### স্বপ্ন পূরণ

স্বপ্ন ছিল বাল্যকালের,  
হব আমি মস্ত কবি।

সেই স্বপ্ন করতে পূরণ,  
হন্য হয়ে পাগল আমি।

আঁকবো ছবি পদ্যরূপে,  
তুলি বানবো কলমকে

রং হবে আজ শব্দকথা,  
লিখব আমি শব্দকোষ।

রঙিন ছবি সাদা কাগজে,  
শব্দরূপে আসবে উড়ে।

কলমের কালি শেষ হবে আজ  
তলিয়ে যাবে ছন্দ-সাগরে।

রাত্রি সারা চলবে এ কাজ,  
ঘুম হবে না একটি ক্ষণ।

স্বপ্ন করতে বাস্তব আজ,  
ব্যাকুল হবে নীল গগণ।

রাত পেরিয়ে সকাল হবে,  
আলোকিত হবে সাফল্য কিরণে।

সকাল হবে স্বর্গীয় আজ,  
সফল হবে স্বপ্নপূরণ।



নাম: মো: রেদওয়ান হক  
কলেজ নম্বর: ১০২৫৮  
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: সি (দিবা)

## কবিতা

যে কবিতা মুখস্থ করে, সে মূর্খ বড়।  
বার বার পড়ে যে,  
করে সে যে অনুভব,  
ফুঁটে উঠে সৌন্দর্য তার,  
কবিতা হয়ে যায় সার্থক।

বড় বড় কবিতা,  
লেখে যে, সে হয় না কবি,  
কবি হবে সার্থক তবে,  
পাঠক সে কবিতা,  
বার বার পড়ে যদি।

সুকাণ্ডের এক কবিতা তেমনি,  
'হে মহাজীবন'।

ছোট্ট এক টুকরো খানি,  
পড়ি বারবার, যেন লাগে মধুর।

বড় বিস্ময়কর এ পঙক্তিগুলো!  
কাউকে করে মুগ্ধ, কাউকে করে কবি,  
কত অদ্ভুত এ বিষয়!

শব্দে শব্দে আঁকা,  
রঙিন ছবি,  
কী মধুর এ স্নিগ্ধতা!

হে কলম, হে কালি  
ভাবনার মুলে বেষ্টিত,  
এরই নাম কবিতা!



এ.এ. সিফাত জাহাঙ্গীর খান  
কলেজ নম্বর: ১৭৯৬৬  
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: গ (প্রভাতি)

## ২৪ মায়াবান ও বসন্ত

বসন্তে মায়াবান-

ঠিক যেন এক মাটির শরীরের মতো রং  
হয়ত আমার মিস্তি-মেটে রঙের পাতলা ফতুয়ার মতো।  
বনের আড়ালে, গাছপালার ফাঁকে কিছু উজ্জ্বল চোখ,  
কিছু মায়াবী হরিণ!

সেই হরিণের দু' চোখে, এই গাছের বাকলে,  
এই রূপসী বসুধা, কিংবা এই স্বর্ণ-বর্ণ-আলোকে!  
প্রকৃতি সেজেছে বসন্ত সাজে, সেজেছে বসন্ত রঙে-  
শিল্পীর তুলির আলসে আঁচড়ে, অবহেলায় অবসরে!  
এই প্রকৃতির রং, মায়াবির পশম!

সোনালি ধন্য বিকেল, ও শুকনো ঝরাপাতার মতো মর্মর শব্দ  
বসন্তের এই সুগন্ধভরা বাতাসে  
আমার প্রাণ- মন উছলিয়ে উঠে!  
একেবারে ভোরে, কোকিলের ডাকে, বসন্ত-মায়া-রাঙা ভোরে,  
কৃষ্ণচূড়া ও শিমুলতুলার শুকনো ঝরাপাতা মাড়িয়ে  
শিশির ভেজা ঘাসে জুতোর তলা ভিজিয়ে  
হয়ে ভবঘুরে, মায়াবান ঘুরে, হয়েছে নিরুদ্দেশ।

করেছি আকুল পাগল পাড়া, প্রকৃতির মায়াবেশ  
আজকের বিশাল আকাশ রাঙা, মায়াবনে সুখ বাঁধ ভাঙা  
প্রকৃতি আজ চারদিকে ছড়িয়েছে মায়া।

প্রকৃতির মায়া যেন জননীর ছায়া।

এইতো কাঁদিন আগে, হেটেছি এ পথ ধরে-

হিম-শীতল কুয়াশা ফুঁড়ে, মৃত-নিঃশল বনের মাঝে  
শুক- ঠান্ডা বাতাস উপেক্ষা করে, মোটা সোয়েটার গায়ে চেপে  
এই মৃত-জীর্ণ রং গায়ে মাখিয়ে, ফিরে গেছি লোকালয়ে।

মাত্র কাঁদিন আগে, যখনও প্রকৃতিতে বসন্তের সম্ভার আসেনি-  
সেই দরিদ্র-দুঃখিনী-বিধবা নারীর ঘরের, ছোট কিশোরী মেয়ের  
বিবর্ণ ঠোঁট- জোড়ার, পত্র-শূন্য মৃত গাছেরা আতর্নাদের মতো রং,  
ফেটে পড়া বাকল, ঝরে পড়া পাতার মতোন তার চামড়ার রং,  
তার দুটি চোখের অশ্রু নদী শুকিয়ে গেছে  
ভুলে গেছে সে কাঁদতে, হয়ে গেছে হাসিহীন, নিষ্প্রাণ,  
এক জমাট- বাঁধা শক্ত-শীতল হৃদয়ের এক বিষধর সাপ-  
একজন শিশু শ্রমিক!



নাম: লিসান আহমেদ  
কলেজ নম্বর: ১৫৩১৪  
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: সি (প্রভাতি)

## স্বপ্নবাজ

যারা ফেল করেছে তারা তো ফুর্তিবাজ  
যারা পাস করেছে তারাই তো ফাঁকিবাজ  
যারা প্লাস পেয়েছে তারাই তো রংবাজ  
আর যারা পেয়েছে সর্বোচ্চ তারাই তো স্বপ্নবাজ!

একসাথে সব রংবাজ-সকল ফুর্তিবাজ  
হয়ে যেতে চায় সবাই তারা বিরাট স্বপ্নবাজ।  
স্বপ্নের বাজিতে তারা হেরে যাবে বার বার  
তাদেরকে চোখ রাঙাবে জীবনের কঠিন হার।  
হেরে যায় তারা তাদের হারানোর কিছুই নাই  
তাই বলবে তারা অতীতকে ফেয়ারওয়াল  
এন্ড গুডবাই।

এগিয়ে যায় তারাই যাদের মনে নেই কোনো ভয়  
বুকের মধ্যে সাহস থাকলে ভয়-ডর আর কোথায় রয়।  
সাহসী এবং পরিশ্রমীরাই তো বিজয়ী হয়  
জ্ঞানের অমরত্ব এমন এক সুধা,  
যার নেই কোনো অবক্ষয়।

নিজেকে প্রমাণের সুযোগ সবার সামনেই আসে  
কিন্তু কতজন প্রমাণ দিতে পারে মাঠে এবং ঘাসে  
যারা তারুণ্যে করে বেশি পরিমাণে ডিল  
তাদের চাকুরির জন্য মাঠ-ঘাট, খাল-বিল!

যারা ঙ্গলের মতো উড়তে চায়,  
তারাই তো প্রকৃত স্বপ্নবাজ।

এ বাজ যে সে বাজ নয়,  
যেন এক বিধ্বংসী শিকারি বাজ।

রংবাজেরা রং ছড়ায়  
স্বপ্নবাজেরা স্বপ্ন দেখায়।

ফুর্তিবাজেরা করে ফুর্তি  
ফাঁকিবাজেরা ফাঁকি দেয়।

সময় চলে যায় নিজের ধারায়।  
আমরা ঢাকা পড়ি নিজেদের ছায়ায়।

সব মিলেই আমরা মিশ্র-মানুষ।  
চলো ওড়ায় একত্রে বিজয়ের ফানুস।



নাম: মাহদিউর রহমান  
কলেজ নম্বর: ১৮৯১১  
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: ও (প্রভাতি)

## স্বপ্নের স্বাধীনতা

এ আমার ভায়ের রক্তের খেলা-  
আমি প্রতিদিন স্বপ্নে দেখি কাল বিজয়ের মেলা  
কিন্তু না, আমি মনে মনে বলি-  
স্বাধীনতা তুমি কবে আসবে ?

সেই দিনই আসবে স্বাধীনতা-  
সেদিন আসবে ঘরে ঘরে শান্তি ও সততা।  
যুদ্ধ করে আনবো বিজয়, শত্রু হবে শেষ।  
ইতিহাসে লেখা হবে নতুন বাংলাদেশ।

বিজয় এলেই হয় না শেষ,  
যাত্রা হয় শুরু-

পথিক মোরা সেই যাত্রার, মুজিব মোদের গুরু।



নাম: তাহমিদ জারিফ  
কলেজ নম্বর: ১৫০০০৪  
শ্রেণি: ১০ম, শাখা: ই (প্রভাতি)

## প্রতিসরণ/প্রতিবিম্ব

অচেনা পথের ভিটে মাটির পান্থ হয়ে সেই পরিচিতি ছায়া বুকের  
মাঝে খামচে ধরে প্রবেশ পথ নাহি পেয়েও যায়নি ভুলে।  
এটা তো কোন অচেনা ছায়া নয়,  
এটা আমারই প্রতিবিম্ব।

জলছবির ক্যানভাস আঁকা মধুর দৃশ্য যা বাস্তব নাহি হবে কভুও।  
হাজারো অনুভূতি রয়েছে জীবনে মাঝে  
তবুও নিজেকে আগলে রেখেছি নানান সাজে।

চলো ছুঁড়ে ফেলি রহস্যময় ব্যক্তিত্বের মুখোশটাকে  
যা পুড়িয়ে দিয়েছে আমাদের অন্তরঙ্গকে।  
নিজস্ব রূপে সাজিয়ে তুলি জগতটাকে,  
ভালোবাসার পরিপূর্ণ অর্থ তুলে ধরি আমাদের অস্তিত্বে।

জানো কী?  
জীবন তো এক রংহীন ছায়াছবির মেলা,  
যাহার মাঝে রয়েছে মানুষের হাজারো কারবালা  
তোমার প্রিয়জন কারো দ্বারা কষ্ট পেয়ে  
আছে গম্ভীর হয়ে,

তবুও তুমি কেন তাহার ক্রেশে  
নিজেকে রেখেছো দুঃখে?  
সব ভয় কাটিয়ে উঠেছি  
এবার বিশ্ব করিব জয়।

তবুও তাদের খোয়াবার ভয়,  
এনে দেয় জীবন সমরাজনে পরাজয়।



নাম : মঈন আহম্মেদ  
কলেজ নম্বর : ১৯৩৫৪  
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: মানবিক (দিবা)

## ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ,  
তোমার সুনিবিড় ছায়ায় মোদের শীতল আশ্রয়।  
প্রথম যেদিন এসেছি তোমার কূলে  
হয়েছি মুগ্ধ সতেজ।

সেইদিনই বুঝেছি সূর্যের মতো তীব্র তোমার তেজ।  
মানুষ তো আমরা জন্ম থেকেই  
কিন্তু তোমার কাছে এসে পেয়েছি মনুষ্যত্ব।

জন্ম নিয়ে মোরা পৃথিবীতে ছিলাম না পূর্ণ,  
তোমার পরশে এসে মোদের জীবন হল ধন্য।

শত চেষ্টা করেও শোধ করতে পারবো না তোমার ঋণ  
ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ,  
তোমায় ভালোবেসে যাব চিরদিন।



নাম: তকী তাহমিদ  
কলেজ নম্বর: ১৯৩৭৬  
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: এ (মানবিক)

## হে বিজয়, তোমার কাছে খোলা চিঠি

হে বিজয় জানো কি তুমি কে?  
কীভাবেই-বা আসলে এই বাংলায়?  
জানো না তো?  
তবে বলছি আমি শোনো-  
বিজয় তুমি লাখো শহিদের  
রক্তে মাখা প্রাণ  
বিজয় তুমি সোনার বাংলার  
সরষে ফুলের ঘ্রাণ।  
তুমি শহিদ মিনার, স্মৃতিসৌধের  
রঞ্জিত ইটের খঞ্জিত এক নাম  
তুমি শহিদ জননীর হাতে থাকা  
চোখের জলে ভেজা এক চিঠির খাম।  
তুমি প্রিয়তমার বুকের হাহাকার আর  
ভাই হারানোর বেদনা,  
তুমি বৃদ্ধ পিতার সন্তান হারানোর  
এক নিশ্চুপ কান্না।  
জানো তুমি কে? কীভাবে আসলে?  
তুমি রবি-ঠাকুরের সোনার বাংলা  
আর নজরুলের বিদ্রোহী  
তুমি মুনীর চৌধুরী, আলতাফ মাহমুদের  
সাদা কাগজ আর কালো কলমের কালি।

বিজয় তুমি লাখো শহিদের রক্তে ভেজা গান  
তুমি দুই লাখ মা বোনের হারানো  
সম্রমের বিনিময়ে অর্জিত এক মহাকাব্যের নাম।  
অবশেষে! অবশেষে শত সংগ্রাম শেষে  
লাখো শহিদের রক্তে ভিজে তুমি আসলে!  
আসলে এই বাংলায়।

হে বিজয় তুমি যে শেখ মুজিবের স্বপ্নে দেখা দেশ  
তুমি লজ্জাবতী পল্লির তরুণীর মেঘ বরণ কেশ  
বিজয় তুমি বাংলার কৃষকের ভুবন ভোলানো হাসি  
তাই তো তোমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখে লাখো-কোটি বাঙালি।

বিজয় তুমি সুন্দর বনের চিত্রা হরিণ আর  
দোয়েল, শ্যামা, টিয়া  
তুমি উত্তাল সমুদ্রে ঘেরা  
সেন্ট মার্টিন-কতুবদিয়া।

এবারে শেষ করি.....

জানো বিজয়, তুমি আজও আমাদের আছো, আর  
আজীবন থাকবে।

কীভাবে? চলো তবে শেষটা তোমায় বলি...

বিজয় তুমি রেসকোর্স ময়দানে ঘোষিত সেই মহান ধ্বনি  
যা আজ নবীণ প্রজন্মের কাছে  
শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চে ধ্বনিত প্রতিধ্বনি!



শেখ শাহজালাল মাহমুদ  
কলেজ নম্বর: ১৩৭৩৫  
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ক (দিবা)

## অলো

উড়ে যায় জোনাকি,  
নিভে যায় মোমবাতি,  
শুধু সলতে থেকে উড়ে যায় ধোঁয়া  
উবে যাওয়া মোমে আর নিভে যাওয়া রঙে,  
হারিয়ে যায় ক্ষণ,  
ভালো লাগে না আঁধার,  
ওগো!! রঙ-তুলি আমার,  
“ছিটিয়ে দাওনা আলোর বাহার।”



মো: নাইম  
কলেজ নম্বর: ১২৭৬০  
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: এ (দিবা)

## বাংলার স্বাধীনতা

বিশ্বমানচিত্র বাংলা কাব্যখানা  
কার হাতে রচিত আছে কি জানা ?  
সে আর কেউ নয়, সে তো জাতির পিতা  
খোকা নাম চিনতো গুরুজন  
বিশ্ববাসী জানে সে শেখ মুজিবুর রহমান।  
১৯৫১ হতে ১৯৫২ আমরা হয়েছি নিপীড়িত-নির্ধাতিত  
যখন বাঙালি পিঠ দেয়াল বরাবর  
সময় এসেছিল বুখে দাঁড়াবার।  
বাংলার ভাগ্যাকাশে আবির্ভাব যখন কালো মেঘের  
তখন মোদের দরকার ছিল শেখ মুজিবের।  
মুজিব পারলো না বসে থাকতে এই গৃহে  
জনতাকে নিয়ে নামলো বাংলার বিজয়ে।  
যেই দেশ ছিল মুজিব নামক সিংহের  
সেই দেশ থেকে বিজয় হয় কীভাবে অন্যের?  
যার জন্য পেলাম আমরা সোনার বাংলাদেশ  
তাকে আমরা মনে রাখবো যতদিন প্রাণ না হয় নিঃশেষ।



মোঃ কামরুল হাসান  
কলেজ নম্বর: ১৯১১৩  
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: সি (প্রভাতি)

### কলম বন

সিন্ধুতীরে এসে দেখিনি তাকে পাশে,  
অস্থির বিচলিত হয়ে পাবো কি তারে শেষে?  
সে তো দেখা দেয় না, কী করি বলো !!!  
রূপের মায়ায় রূপবতী হয়ে রূপ ছড়াচ্ছে আরও  
পাবো কি তারে ঐ কলম বনের মায়ায়  
যার চঞ্চলতায় মাতিয়ে রাখে,  
দুর্ভাগা এই আমায়  
কোথায় তুমি ?  
প্রকৃতি ব্যস্ত তার বিকেল বেলার সাজে ,  
মাঝির নয়ন তারই মাঝে প্রকৃতিরেই খোঁজে ।



মোঃ সানজিদ রেজা  
কলেজ নম্বর: ১৩৬৯২  
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বি (দিবা)

### জয় বাংলা জয়

জীবন দিয়ে যারা এদেশ,  
করে গেছে স্বাধীন,  
তাদের কাছে মোদের  
আছে  
অনেক বেশি ঋণ ।  
দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া  
তো  
সহজ কথা নয়,  
সবার মাঝে সদাই থাকে  
প্রাণ হারানোর ভয় ।  
যারা জীবন তুচ্ছ করে  
যুদ্ধে দিল ঝাঁপ,  
তাদের তরে হৃদয় মাঝে  
করছে অনুতাপ ।





নাম: কারীব আবরার  
কলেজ নম্বর: ১৩৪২২  
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ই (প্রভাতি)

## ২২ বি লীন আর্তনাদ

ব্যথিত সত্তার বি লীন আর্তনাদ  
কে শুনে বলো?  
কার গো এত সময়!

মানব সত্তার ঘরে কি আর মানবতার সূর্য  
কখনোই হবে না উদয়?  
শিক্ষার অভাব?  
নাকি মনুষ্যত্বের বিসর্জন?  
কলুষিত চিন্তার দ্বারে যে  
প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাচ্ছে মানবতার চিহ্ন।

অসহায়দের করে তাড়না  
বিবেকহীন জাতির পুলকদীপ্তি ব্যঞ্জন  
একটি বারও কী করেনা তোমায় মন-ক্ষুন্ন?  
অসহায়তার আড়ালে গুটিয়া থাকা মানুষগুলোদের  
প্রাপ্য হয় না মর্যাদা।  
প্রাপ্য হয় না, একটি সুন্দর জীবন।  
কেউ কেউ নির্লিপ্ত মনে ভাগ্যকে করে নেয় বরণ।  
আবার অনেকেই সইতে না পেরে এই দহন  
দেয় স্থায়ী জীবন বিসর্জন।

বিভবান সমাজ কখনোই বুঝবেনা  
কতটা বেদনাময় এই হত-দরিদ্রের জীবন।  
কষ্ট ও হতাশায় আগাগোড়া মাথা  
তাদের জীবনের প্রতিটি প্রহর।

ক্লান্ত শ্রীহীন শিথিল জীবনে  
নেই বিন্দু পরিমাণ আড়ম্বর।  
সাদামাটা জীবন যাপনের পরেও,  
মাঝে মাঝে স্তব্ধ রাত কাটে  
শয্যা শায়িত নিথর ক্ষুধার্ত দেহের।  
কষ্ট বুকে চেপে শুধু প্রার্থনায় মাতে,  
যেন আঁধার কেটে নতুন সূর্যে আলোকিত হয়  
ভোর।  
শ্রমের বদলে পায় তারা ভর্ৎসনা আর কিছু কড়ি  
যা দিয়ে কোনো ভাবে চলে যায় সংসার  
পেটের দায়ে মাথা পেতে নেয় তারা সব  
তিরস্কার।

তবে আজ দারিদ্র্যের কবলে পড়ে  
কী হারিয়েছে তারা 'মানুষ' নামটির সকল  
অধিকার?  
জনাকীর্ণ এই শহরে হাজারো মানুষের ভীড়ে  
কত জীবনের গল্প ধাঁমাচাপা খেয়ে যায়  
তবে মানুষ ভেদে জীবনের মানে কী পাট্টায়?  
একটিবার শুধু দরিদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে দেখো  
দেখবে কল্যাণের আলো আসছে সম্ভাবনার কড়া  
নেড়ে নেড়ে  
আর শুভ দিন ভিড়ছে, নব জয়ের সুবাস  
ছড়িয়ে।





আব্দুল্লাহ আল ইসতিয়াক আলভি  
কলেজ নম্বর: ১২৮২৩  
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ই (দিবা)

## ধাঁধা

১। তিন বর্ণের নাম তার, থাকে কৃষকের ঘরে,  
লেজ কাটলে সেই ব্যাটা লাখি খেয়ে মরে।  
পেট কাটলে ঘৃণা করে দুনিয়ার সবে,  
ভেবেচিন্তে বলো দেখি- কী নাম তার হবে?  
উত্তর: বলদ।

২। তিন অক্ষরে নাম মোর বিদ্বানের সাথী,  
মাথা মোর কেটে নিলে হই মাপকাঠি।  
উত্তর: কাগজ।

৩। জগতে আছি পৃথিবীতে নাই, গগনে আছি  
আকাশেতে নাই। সাগরেতে আছি আমি,  
সমুদ্রেতে নাই, কী নাম আমার, বল দেখি  
ভাই।  
উত্তর: 'গ'

৪। Can you solve this ?  
One =Three  
Three= Five  
Nine=Four  
Ten=?  
Ans: 3

৫। IQ-Test:

$$৩+৩=১২$$

$$৫+৫=৪০$$

$$৭+৭=৮৪$$

$$৯+৯=১৪৪$$

$$২+২=?$$

$$উত্তর: ২২$$



নাম: আহমদ বেলাল  
কলেজ নম্বর: ১২৮৭১  
শ্রেণী: ৮ম, শাখা: বি (দিবা)

## ধাঁধা

১। পাখা আছে পাখি নয়, গুঁড় আছে হাতি নয়?  
উত্তর: মশা।

২। কোন ফল খাওয়া যায় না?  
উত্তর: বিফল।

৩। কেনা যায় না কী?  
উত্তর: মন।

৪। বাঁধা যায় না কী?  
উত্তর: সময়।

৫। লাল গরু সব খায়, পানি খেলে মারা যায়?  
উত্তর: আগুন।

৬। কোনটি যায় কিন্তু ফিরে আসে না?  
উত্তর: বয়স।





আরাফাত রহমান  
কলেজ নং : ১৮৪৫৪  
শ্রেণি : ৭ম, শাখা: খ (প্রভাতি)

## জানা অজানা

- ১। পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪ শত ৫০ কোটি বছর।
- ২। ডায়নামো যন্ত্র দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।
- ৩। মানুষের বুকের দুই পাশে ১২ টি করে হাড় আছে।
- ৪। মানব দেহে প্রায় ৭০ লক্ষ লোমকূপ আছে।
- ৫। উইপোকা এমন একটি প্রাণী যে দেখতে পায় না।
- ৬। হাঙ্গেরির রাজধানীর নাম বুদাপেস্ট। আয়তন প্রায় ৯৩০০০ বর্গ কি.মি.।
- ৭। আটলান্টিক মহাসাগরের আয়তন প্রায় ৯২,৩৭৩,০০০ বর্গ কি.মি.।
- ৮। পৃথিবী পৃষ্ঠের মোট আয়তন প্রায় ৫১০,১০০,৫০০ বর্গ কি.মি.।
- ৯। ফিলিপাইন এর মারিয়ানা খাতের আয়তন প্রায় ১১০৩৩ মিটার।
- ১০। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের মানুষ শিস দিয়ে কথা বলে।
- ১১। কাঁকড়া এমন একটি প্রাণী যার মাথা নেই।
- ১২। পানি ছাড়া একটি হাঁদুর উটের চেয়েও বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারে।
- ১৩। রেশম মথ নামের প্রাণীর ১১ টি মাথা।
- ১৪। অক্টোপাস এমন একটি সামুদ্রিক প্রাণী যার ৩ টি হৃদয়।
- ১৫। হাঙ্গরের প্রায় ২২৫ টি প্রজাতি রয়েছে।
- ১৬। ইউরেনাস এমন একটি গ্রহ যা শুধু বরফ ও গ্যাস দ্বারা গঠিত।
- ১৭। সৌরজগতে প্রায় ৪১ টি উপগ্রহ রয়েছে।
- ১৮। বানর এমন একটি প্রাণী যার কেনো পা নেই।
- ১৯। প্যারাডাইস ট্রি স্নেক সাপের এমন একটি প্রজাতি যারা আকাশে উড়তে পারে।
- ২০। উলুকা এমন একটি প্রাণী যার ৮ শত ৮৬টি পা আছে।



ଗମ୍ଭୀର

ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ

ଅଭିପ୍ରାୟ





নাম: আব্দুল্লাহ আস সামি  
কলেজ নম্বর : ১৮৬৬৫  
শ্রেণি: তৃতীয়, শাখা: খ (প্রভাতি)

## কক্সবাজার ভ্রমণ

ভ্রমণ করতে সবারই ভালো লাগে। আমারও প্রতিটি শিশুর মতো ভ্রমণ করতে খুবই ভালো লাগে। এ বছর আমি কক্সবাজারে গিয়েছিলাম। একদিন রাতে হঠাৎ আকস্মিক বললেন, ‘আমি আগামী ৩রা মে, ২০২২ কক্সবাজারে যেতে চাই। কেমন হবে বলতো? তুমি কী যাবে আমার সাথে?’ আমি তো মহা খুশি। আমার আনন্দ দেখে কে! সঙ্গে সঙ্গে আমি আম্মুকে গিয়ে সংবাদটি দিলাম। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, আমরা সবাই যাব। আমার ছোট বোন তো আরও খুশি। এমন কী ওইদিন রাতে আমাদের ঘুমই আসছিল না। পরের দিন সকালে আমরা কেনাকাটা করতে গেলাম। দুপুরে বাসায় ফিরে এলাম। ৩রা মে, ২০২২ ছিল ইদের দিন। তাই কোনো বিমানের টিকিট পাইনি। অবশেষে আমি আকস্মিক সাথে বসে অনলাইনে বাসের টিকিট নিশ্চিত করলাম। কিন্তু তিন তারিখ যেন আসতেই চাইছিল না। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতে আবার যাওয়ার অপেক্ষা শেষ হতে চায় না। অবশেষে এলো ৩রা মে, ২০২২। আমি আর আমার ছোট বোন জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। কারণ জিনিসপত্র গোছানোর দায়িত্ব ছিল আমাদের উপর। এরপর সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করলাম পাহুপথের সেইন্ট মার্টিন হেরিটেজ ট্রাভেলস এর কাউন্টার এর দিকে। সেখানে একটু আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। এরপর বাস আমাদের নিতে আসল। এটি ছিল স্লিপার কোচ। আমরা বাসে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে আমরা বাস থেকে কক্সবাজারে নামলাম। কিন্তু কক্সবাজারে যখন আমরা বাস থেকে নামলাম তখন অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল। আকস্মিক ছাতা মাথায় দিয়ে একটি অটোরিকশা ভাড়া করে আনলেন। আমরা বৃষ্টির মধ্যেই প্রাসাদ প্যারাডাইস এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। হোটেলটি হচ্ছে আকস্মিক একজন ছাত্রের। তিনি আমাদের নাফি ভাই। তিনি সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পর অটোরিকশাওয়ালা মামা আমাদের হোটেলের সামনে নামিয়ে দিলেন। হোটেলের প্রবেশ করার পর অভ্যর্থনা কক্ষে আকস্মিক কয়েকটা কাগজে স্বাক্ষর করেছিলেন। আমি ততক্ষণে এক গ্লাস শরবত পান করলাম। এর কিছুক্ষণ পর একজন ভদ্রলোক এসে আমাদের রুমে নিয়ে গেলেন। রুমে ঢুকে আমরা একটু বিশ্রাম নিলাম। তারপর লাবনী সমুদ্রসৈকতে গেলাম। সমুদ্রসৈকতে অনেক মজা করলাম। বিশাল বিশাল সমুদ্রের ঢেউগুলো তীরে এসে বালুর সাথে মিশে যাচ্ছিল। আমরা সমুদ্রের পানিতে অনেক মজা করেছিলাম। তবে ২০২০ সালের মতো একটুও ভয় পাইনি। সমুদ্র সৈকতে খেলা করতেও অনেক ভালো লাগে। তারপর আমরা হোটেলের এসে সুইমিং পুলে সাঁতার

কাটলাম। আমার বোন সুইমিং পুলে ভয় পাচ্ছিল। ও সাঁতার পারে না; অবশ্য আমিও পারি না। সুইমিং পুল হতে নিজেদের কক্ষে এসে ফ্রেশ হয়ে আবার নিচে নেমে রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খেলাম। এরপর নিজ কক্ষে এসে একটু টিভি দেখলাম। বিকালে ইনানী সমুদ্র সৈকতে গেলাম। সেখান থেকে সূর্যাস্ত দেখতে অনেক ভালো লাগছিল। সেখানে আমরা সি বিচ বাইকে উঠলাম। সেখান থেকে লাবনী সমুদ্র সৈকতে আসতে রাত হয়ে গিয়েছিল। রাতে আবারো গেলাম সমুদ্রের তীরে। দিনের সমুদ্রের গর্জনের থেকে রাতের গর্জন অনেক বেশি। সমুদ্র সৈকত থেকে রাতে ফিরে ‘সল্ট বিস্ট্রো এ্যান্ড ক্যাফে’ তে রাতের খাবার খেলাম। পরের দিনও একই রকমভাবে সমুদ্র সৈকতে গেলাম। কিন্তু সেদিন আর পানিতে নামিনি। শুধুই সমুদ্রের ঢেউ দেখেছি। নীল আকাশ আর সমুদ্রের নীল রং দেখতে খুব ভালো লাগছিল। বিকালে ‘রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ড’ এ গেলাম। সেখানে প্রবেশ করে দেখলাম সেখানে দায়িত্বরত একজন মাছগুলোকে ফিডারের মাধ্যমে খাবার খাওয়াচ্ছিল। আমিও বিশ টাকা দিয়ে খাবার খাওয়ালাম। মাছগুলো অনেক বেশি ভালো। রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ডের ভিতরে প্রবেশ করেছিলাম। আমাদের চারপাশ দিয়ে শুধু মাছ আর মাছ। সেখানে অনেক প্রজাতির মাছ ছিল। যেমন: স্টারফিশ, জেলিফিশ, গোল্ডফিশ, ইলফিশ, হাঙর, পিরানহা মাছ ইত্যাদি। মাছ দেখতেও আমার অনেক ভালো লাগছিল। আমরা ‘রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ড’ থেকে ফিরে রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খেয়ে হোটেলের গিয়ে ফ্রেশ হয়ে রামুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। সেখানে রাশেদুল মনসুর স্যারদের গ্রামের বাড়ি। স্যার নিজে আমাদের রামু সেনানিবাস, রাবার বাগান, রামু বৌদ্ধমন্দির সহ অনেক কিছু দেখালেন। পরে স্যারের বাড়িতে গেলাম। সেখানেও অনেক মজা হয়েছিল। ম্যাডাম নিজের হাতে তৈরি নানা রকম খাবার পরিবেশন করলেন। স্যারের গ্রামের বাড়িটিও অনেক সুন্দর। রামু থেকে হোটেলের ফিরে আসতে আসতে রাত সাড়ে নয়টা বেজে গিয়েছিল। রাতে হোটেলের রেস্টুরেন্টে খাওয়া শেষে কক্ষে এসে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি। এভাবে কক্সবাজার ভ্রমণের সময় বিভিন্ন জায়গা দেখলাম। হোটেলের পরিবেশ ছিল অনেক ভালো। আফেলরাও খুব ভাল। ৭ মে ২০২২ সকালের বাসে কক্সবাজার থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম এবং রাত দশটার দিকে বাসায় পৌঁছাই। কক্সবাজার ভ্রমণের স্মৃতি আমি কখনোই ভুলবো না। কক্সবাজার এমন একটি জায়গা যেখানে সমুদ্রের টানে বারবার যেতে ইচ্ছে করে। আমি বারবার যেতে চাই দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের টানে।



কাজী আরহাম সাদিক  
কলেজ নম্বর : ১৮৩৬৬,  
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: খ (প্রভাতি)



## কাতার বিশ্বকাপ ২০২২

কাতার বিশ্বকাপ-উত্তর গোলার্ধে শীতকালে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বকাপ। আরব বিশ্বেও প্রথম বিশ্বকাপ। এই প্রথম আরব দেশে ফুটবল বিশ্বকাপ হলো। এ আসরটি ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর হতে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাতারের ৫ টি শহরের ৮টি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি মে, জুন বা জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত না হওয়া প্রথম আসর। প্রায় ২৯ দিনের সময়সীমায় এ বিশ্বকাপটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে কাতারের জাতীয় দিবসে অনুষ্ঠিত হয়েছে এর ফাইনাল ম্যাচ। আয়োজক কাতারের আনুমানিক ব্যয় হয়েছে ২২ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের মুদ্রায় যা ২২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। সংখ্যাটা রাশিয়া বিশ্বকাপের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ বেশি।

লোগো:

২০২২ বিশ্বকাপ যে আরব বিশ্বে হচ্ছে, সেটি লোগো দেখলেই স্পষ্ট। কাতারের ঐতিহ্যই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ২০১৯ সালে উন্মোচিত লোগোতে। শ্বেতশুভ্র পটভূমিতে কাতারের জাতীয় পতাকার লাল রঙের বিভিন্ন প্রতীক দিয়ে নকশা করা হয়েছে লোগোর। ইংরেজি ৮ সংখ্যাটি দিয়ে বিশ্বকাপ ট্রফির আদলে বানানো হয়েছে এই লোগো। আট ভেন্যুতে হয়েছে এবারের বিশ্বকাপ, সেটি বোঝাতেই 'এইট'। একটু ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে, পুরো লোগোটাই ভাঁজ করা একটা শাল ছাড়া আর কিছু নয়। শীতকালে সারা বিশ্বের মতো মধ্যপ্রাচ্যের মানুষও শাল পরেন শীত থেকে বাঁচতে। কাতারের ঐতিহ্যবাহী সেই শালের ফুলের নকশা স্থান পেয়েছে লোগোতে। আর নিচের অংশে ইংরেজিতে 'Qatar ২০২২' লেখা হয়েছে আরবি ক্যালিগ্রাফি অনুসরণ করে।

বল:

আল রিহলা: আরবি শব্দ 'আল রিহলা' মানে সফর। সেই ১৩ শতকেই এই নামে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে গেছেন বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা। এক জীবনে প্রায় ৭০ হাজার মাইল ভ্রমণ

করেছেন, কিছুটা সময় এই বাংলাদেশ ভুখণ্ডেও বাস করা মরোক্কন-আরব পর্যটক। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বলের নামও আল রিহলা। ফুটবল মাঠে বলের চেয়ে ভ্রমণ কে আর বেশি করে?

আল হিলম: সেমি ফাইনাল এবং ফাইনালে যে বলটি ব্যবহার করা হয়েছে সে বলটির নাম আল হিলম। আল হিলম আরবি শব্দ, যার অর্থ স্বপ্ন। আল রিহলার মতোই এ বলটির উপরেও ত্রিভুজ আকৃতির প্যাটার্ন রয়েছে। এ বলটিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে অফসাইড হলে রেফারি সহজেই বুঝতে পারেন।

মাসকট:

ফুটবল নিয়ে উড়ন্ত জিনভূত! প্রথমবার দেখলে 'লা'য়িব' কে এমনটা মনে হতেই পারে। তবে ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে, আরবের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরা 'লা'য়িব' একজন ফুটবলার। আরবি ভাষায় লা'য়িব মানে অসাধারণ দক্ষ এক খেলোয়াড়।

স্টেডিয়াম:

এবারের বিশ্বকাপ কাতারের ৫টি শহরের ৮টি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে ৮টি স্টেডিয়ামে এবারের বিশ্বকাপ হয়েছে সে স্টেডিয়ামগুলো হলো-লুসাইল স্টেডিয়াম, আহমেদ বিন আলী স্টেডিয়াম, আল বায়ত স্টেডিয়াম, খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, স্টেডিয়াম ৯৭৪, এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম, আল তুমামা স্টেডিয়াম ও আল জানুব স্টেডিয়াম। লুসাইল ও আল বায়ত স্টেডিয়ামের ধারণক্ষমতা যথাক্রমে আশি হাজার ও ষাট হাজার; বাকি ছয়টি স্টেডিয়ামের প্রত্যেকটির ধারণক্ষমতা হলো চল্লিশ হাজার।

এই বিশ্বকাপে নতুন যা ঘটেছে-

১। এবার প্রায় ২৯ লাখ টিকিট বিক্রি হয়েছে। কাতারের জনসংখ্যাও প্রায় ২৯ লাখ।

২। বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ম্যাচ পরিচালনা

করেছেন নারী রেফারিরাও। ৩৬ জন রেফারির মধ্যে ৩ জন নারী ছিলেন এবার।

৩। এবারই প্রথম এক ম্যাচে সর্বোচ্চ পাঁচজন খেলোয়াড় বদলি হিসেবে নামাতে পেরেছে দলগুলো। গতবার প্রথম ৯০ মিনিটে তিনজন ও অতিরিক্ত সময়ে বাড়তি একজন বদলি নামানোর সুযোগ ছিল।

৪। ফিফার ধারণা এবার বিশ্বজুড়ে ৫০০ কোটি দর্শক টেলিভিশন বা অন্যকোনো মাধ্যমে বিশ্বকাপ দেখেছেন। ২০১৮ সালে দেখেছিলেন ৩৫৭ কোটি দর্শক।

৫। প্রতি দলের খেলোয়াড় সংখ্যা গতবারের চেয়ে তিনজন বেড়েছে।

একনজরে কাতার বিশ্বকাপ ২০২২-

১। এবারের কাতার বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনা, রানার্স আপ হয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স, তৃতীয় হয়েছে গতবারের রানার্স আপ ক্রোয়েশিয়া এবং প্রথমবারের মতো চতুর্থ হয়েছে মরক্কো।

২। গোলের রেকর্ড গড়লো কাতার বিশ্বকাপ। মোট ১৭২টি গোল হয়েছে এবার। এর আগে ২০১৪ ও ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপে ১৭১টি গোল রেকর্ড ছিল।

৩। ফ্রান্সকে হারিয়ে ৩৬ বছর পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলো

আর্জেন্টিনা।

৪। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়লেন লিওনেল মেসি।

৫। মেসি প্রথম খেলোয়াড় যিনি বিশ্বকাপে দুবার গোल्ডেন বল জিতেছেন।

৬। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের গোल्ডেন গ্লোবস পেলেন আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

৭। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের গোल्ডেন বুট পেলেন ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পে।

৮। ১৯৬৬ সালের পর বিশ্বকাপ ফাইনালে প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে।

৯। বিশ্বকাপের সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেলেন আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্দেজ।

১০। এবারের বিশ্বকাপের সেরা গোলটি ছিল ব্রাজিলের রিচার্লিসনের।

তথ্যসূত্র :

১. 'দৈনিক প্রথম আলো'

২. 'দৈনিক সমকাল' ৩. 'উইকিপিডিয়া'

৪. 'সময় টিভি' ৫. 'চ্যানেল ২৪'





নাম: রিদওয়ান রহমান  
কলেজ নম্বর : ১৮৩৭৫  
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: খ (প্রভাতি)

## একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন: মহাস্থানগড়

অবস্থান : মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। প্রসিদ্ধ এই নগরী পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর নামেও পরিচিত ছিল। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এখানে সভ্য জনপদ গড়ে উঠেছিল প্রত্নতাত্ত্বিক ভাবেই তার প্রমাণ মিলেছে। ২০১৬ সালে এটিকে সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এখানে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন সাম্রাজ্যের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কি.মি উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় মহাস্থানগড় অবস্থিত।

ইতিহাস : বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়ান সাঙ ৬৩৯ থেকে ৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পুণ্ড্রনগরে এসেছিলেন। ভ্রমণের ধারাবিবরণীতে তিনি তখনকার প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার উল্লেখ করে বর্ণনা দেন। বৌদ্ধ শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ হওয়ায় চীন ও তিব্বত থেকে ভিক্ষুরা তখন মহাস্থানগড়ে আসতেন লেখাপড়া করতে। সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন (১০৮২-১১২৫) যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন তখন এই গড় অরক্ষিত ছিল। মহাস্থানের রাজা ছিলেন নল যার বিরোধ লেগে থাকত তার ভাই নীল এর সাথে। এসময় ভারতের দাক্ষিণাত্যের শ্রীক্ষেত্র নামক স্থান থেকে এক ব্রাহ্মণ এখানে আসেন এবং তিনি এই দুই ভাইয়ের বিরোধের অবসান ঘটান এবং রাজা হন। এই ব্রাহ্মণের নাম ছিল রাম। ইতিহাসে তিনি পরশুরাম নামে পরিচিত। হযরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী (র.) এবং তার শিষ্য ফকিরবেশী দরবেশ ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে মহাস্থানগড়ে আসেন। রাজা পরশুরামের সাথে শাহ সুলতানের বিরোধ হয়। ফলে পরশুরামের সাথে ফকিরবেশী দরবেশ হযরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী (র.) এর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরশুরাম পরাজিত ও নিহত হন।

দর্শনীয় স্থানসমূহ :

(১) মাহী সওয়ার মাজার শরিফ: মহাস্থানগড়ের একটি ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান হল হযরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী (র.) এর মাজার। মহাস্থান বাসস্ট্যান্ড থেকে কিছুটা পশ্চিমে এ মাজার শরিফ অবস্থিত। শাহ সুলতান বলখী (র.) ১৪শ শতাব্দির একজন ইসলাম ধর্ম প্রচারক ছিলেন। কথিত আছে মাছ আকৃতির নৌকাতে করে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বরেন্দ্র ভূমিতে আসেন। সেখান থেকে তার নাম এসেছে মাহিসাওয়ার (মাছের পিঠে করে আগমনকারী)।

(২) কালীদহ সাগর: গড়ের পশ্চিম অংশে রয়েছে ঐতিহাসিক কালীদহ সাগর এবং পদ্মাদেবীর বাসভবন।

(৩) শীলাদেবীর ঘাট: গড়ের পূর্বপাশে রয়েছে করতোয়া নদী যার তীরে 'শীলাদেবীর ঘাট'। শীলাদেবী ছিলেন পরশুরামের বোন।

(৪) জিউৎকুন্ড কূপ: মহাস্থানগড়ের শীলাদেবীর ঘাটের পশ্চিমে জিউৎকুন্ড নামে একটি বড় কূপ আছে। কথিত আছে এই কূপের পানি পান করে পরশুরামের আহত সৈন্যরা সুস্থ হয়ে যেত।

(৫) জাদুঘর: মহাস্থানগড় খননের ফলে মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন যুগের বিভিন্ন দ্রব্যাদিসহ অনেক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে যা গড়ের উত্তরে অবস্থিত জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

(৬) গোবিন্দভিটা: মহাস্থানগড় জাদুঘরের ঠিক সামনেই গোবিন্দভিটা অবস্থিত। এ ভিটা একটি খননকৃত প্রত্নস্থল।

(৭) ভিমের জঙ্গল: মহাস্থানগড় এর তিন দিক পরিবেষ্টিত এবং অসংখ্য কালোত্তীর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপনাসমৃদ্ধ এই ভিমের জঙ্গল।

(৮) বেহুলার বাসরঘর: মহাস্থানগড় বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রায় ২কি.মি দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বৌদ্ধস্তম্ভ রয়েছে যা সম্রাট অশোক নির্মাণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। স্তম্ভের উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট। স্তম্ভের পূর্বার্ধে রয়েছে ২৪ কোণ বিশিষ্ট চৌবাচ্চা সদৃশ একটি গোসলখানা। এটি বেহুলার বাসরঘর নামেই বেশি পরিচিত।

(৯) পরশুরামের প্রাসাদ: পরশুরামের প্রাসাদ ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ের সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত ভিতরে যেসব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম। স্থানীয়ভাবে এটি তথাকথিত হিন্দু নৃপতি পরশুরামের প্যালেস নামে পরিচিত।

(১০) বৈরাগীর ভিটা: মহাস্থানগড় এর উত্তর-পূর্ব কোণে রাজা পরশুরামের বাড়ি হতে প্রায় ২০০ গজ দূরে অবস্থিত। এই স্তূপটির আয়তন ৩০০x২৫০ ফুট।

(১১) ভাসু বিহার: মহাস্থানগড় হতে ৭ কি.মি. উত্তর পশ্চিমে এবং বৌদ্ধ বিহার হতে ২ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত।

সুতরাং বিভিন্ন কারণে মহাস্থানগড় প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন প্রত্নস্থল বলে সারা পৃথিবীর পর্যটক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে মহাস্থানগড় আকর্ষণীয়।



নাম: রাফসান রেজা বুখারী  
কলেজ নম্বর : গ-১৮৬৬৬  
শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: E, শিফট: প্রভাতি

## একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা (আমার বড় চাচা)

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাতে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) ঘুমন্ত মানুষের উপর নির্বিচারে হামলা চালায়। তারা এটির নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সার্চ লাইট’। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার পূর্বে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেই সাথে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদেশকে হানাদার এবং দখল মুক্ত করতে নির্দেশ দেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে এদেশের যুবক, বৃদ্ধ, তরুণ বয়সের ছাত্র, কৃষক, আর্মি, লাখ লাখ সাধারণ মানুষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। এমন হাজারো মুক্তিযোদ্ধার মতো আমার বড় চাচাও একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর গল্পই আজ আমি বলব।

আমরা বড় চাচাকে জ্যাঠা বলি। আমার জ্যাঠার নাম নুরুল ইসলাম। তিনি ১৯৫২ সালে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার চরআলগী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে তিনি আই. এ. (বর্তমানে একাদশ) শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। ময়মনসিংহ আলমগীর মিন্টু মেমোরিয়াল কলেজে পড়ার সময়ে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন আমার জ্যাঠার বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। আমার দাদা-দাদির ৬ ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রথম সন্তান ছিলেন আমার জ্যাঠা। ওই সময় গ্রামের যুবক ছেলেদেরকে তাদের বাবা মায়েরা চোখে চোখে রাখতেন।

আমার দাদা-দাদিরও ভয় ছিলো যদি ছেলে পালিয়ে যুদ্ধে চলে যায় আর ফিরে না আসে। সেই জন্য শহরের মেস থেকে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসলেন। একদিন আমার দাদা বাড়িতে ছিলেন না। সেই সময় আমার জ্যাঠা দাদিকে বললেন, ‘মায়া (মা) আমার খুব মুরগীর মাংস দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করছে।’ আমার দাদি ওই সময় খুব অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি জ্যাঠার জন্য মাংস রান্না করে দিয়েছিলেন। এরপর জ্যাঠা দাদিকে মুখে তুলে খাইয়ে দিতে বললেন এবং দাদি খাইয়ে দিলেন। খাওয়া শেষ করে জ্যাঠা বাইরে চলে গেলেন। কাউকে বুঝতে দিলেন না যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছেন। এদিকে দাদা বাড়িতে এসে জ্যাঠাকে খুঁজে না পেয়ে ভয় পেয়ে গেলেন। এরপর দাদির কাছে মুরগীর মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ার গল্প শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার ছেলে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে চলে গিয়েছে। ঐ গ্রামের ৫-৬ জনের যে দলটি ট্রেনিং করার জন্য ভারতে রওনা হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আমার জ্যাঠা অনেক বেশি সাহসী ছিলেন। ভারতের কাছাকাছি যাওয়ার পূর্বেই পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতিরোধের মধ্যে পড়ে যান। সামনে থেকে গুলির আওয়াজ আসছে। জ্যাঠা বুঝতে পারলেন এই পথ দিয়ে সামনে এগোনো সম্ভব না। সাথে যারা ছিলেন অনেকেই দৌড়ে চলে এলেন। কিন্তু জ্যাঠা বললেন বাড়ি যখন ছেড়েছি, আর ফিরে যাব না। রাস্তার পাশে একটি ডোবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি শরীরে কাদা মেখে



শ্যাওলা ও কচুরি পানা মাথার উপর দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এসময় তাঁর আর কিছুই করার ছিল না। কারণ তিনি তো তখন ট্রেনিংয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে তো তখন কোনো অস্ত্রও ছিল না। প্রাণ বাঁচানোই ছিল তখন সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কিন্তু পাকিস্তানিরা যখন সেই পথ দিয়ে গুলি করতে করতে আসছিল তখন কচুরিপানার মধ্যেও তারা গুলি করছিল। বৃষ্টির মতো গুলি জ্যাঠার আশে পাশে এসে পড়ছিল। তখন তিনি শুধু আল্লাহর নাম জপ করছিলেন। আল্লাহ সহায় ছিলেন। একটি গুলিও তাঁর শরীরে লাগে নাই। এই ভাবে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যার পর শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র জ্যাঠাই বর্ডার পার হয়ে ভারতের আসামে গিয়ে পৌঁছলেন। পরিচিত অন্য কারও সাথে জ্যাঠার আর দেখা হয়নি।

ভারতে ট্রেনিং এর এই সময়ে ওনার অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। একদিকে গেরিলা ট্রেনিং অন্যদিকে খাওয়া দাওয়ার কষ্ট। ওইখানে দিনের পর দিন পুরোনো পোকা হয়ে যাওয়া দুর্গন্ধ যুক্ত চাল দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি খেতে হয়েছিল। তাও পরিমাণের তুলনায় অনেক কম। অনেক সময় শুধু সিদ্ধ করা কাঁচা ছোলাও খেতে হয়েছিল। খাবারের কষ্টেই অনেক মুক্তিযোদ্ধা অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। আবার অনেকে মারাও গিয়েছিলেন। তাছাড়া বড় বড় পিঁপড়া, বিভিন্ন পোকামাকড়, পাহাড়ি কেউটে সাপের উৎপাত, জেঁক এবং বিছানা ছাড়া মাটিতেই শুয়ে ঘুমানো এভাবে কষ্ট করে ট্রেনিং শেষ করে ১১ নং সেক্টরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের নানান জায়গায় শত্রুদের বিরুদ্ধে অপারেশন করার জন্য যাওয়ার প্রয়োজন হতো। বেশির ভাগ সময়ে রাতেই তাদের চলাফেরা করতে হতো। একদিন অন্ধকার রাতে জ্যাঠা একটা খাল পার হয়েছিলেন। পার হয়ে অপর পাড়ে এসে দেখলেন, শরীর থেকে পায়খানার গন্ধ বেরোচ্ছে এবং তাঁর সারা শরীরে পায়খানা লেগে আছে। তখনকার দিনে গ্রামে বেশির ভাগ মানুষের স্যানিটারি পায়খানা ছিলনা। খোলা আকাশের নিচে, নদী ও খালের পাশেই ছিল সব কাঁচা পায়খানা। আমার জ্যাঠা ওই অবস্থায় কিছু দূরে ঐ খালের পানি দিয়েই তার শরীর ধুয়েছিলেন। কোথাও কোনো সাবানের ব্যবস্থাও করতে পারেনি। ভাবা যায় কি? কি ভীষণ মানসিক কষ্ট হয়েছিল সেইদিন।

যুদ্ধের সময়ে জ্যাঠাদের অনেক খাবারের কষ্ট করতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে একবেলা খাবার পেলেও দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে হয়েছে। ভাত না পেয়ে শুধুমাত্র সেদ্ধ ছোলা, মুড়ি, গমভাজা ইত্যাদি খেয়ে থাকতে হয়েছিল। সবারই খাবারের সমস্যা ছিল। কিন্তু তারপরও গ্রামের মানুষেরা যখনই কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে পেতেন, ঘরে যা থাকতো তা দিয়েই আপ্যায়ন করতেন।

যুদ্ধ শেষে দেশ স্বাধীন হওয়ার ২ মাস পর যখন জ্যাঠা গ্রামে ফিরে এসেছিলেন তখন তাঁকে কেউই চিনতে পারেনি। চোখ গর্তে চলে গেছে, বড় বড় চুল, দাড়ি, গোফ, শরীর পুরোপুরি কালো, হাতের নখ অনেক বড় বড় ছিল। তারপর তিনি আবার পড়ালেখায় মনোযোগ দিলেন। আইএ পাশ করে বাংলাদেশ রেলওয়েতে টি.টি.সি পদে যোগদান করলেন। প্রথমে ময়মনসিংহের গৌরীপুর এবং পরবর্তীতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেল জংশনে কর্মরত ছিলেন। আখাউড়া মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

আমার জ্যাঠার খুব পছন্দের গান ছিল 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'। তিনি গানটা খুব শুনতেন। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গানগুলো নাকি সকল মুক্তি যোদ্ধাদের খুব সাহস জোগাত। যেখানেই যেতেন মানুষের সাথে শুধু যুদ্ধের গল্প করতেন। আমার বাবাকে জ্যাঠা খুব ভালোবাসতেন। বাবাকে এই গল্পগুলো জ্যাঠা মাঝে মাঝেই বলতেন। যুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া এমন হাজারো গল্প নাকি প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার ভিতরে আছে। বাংলার প্রত্যেকটা মুক্তিযোদ্ধা নাকি এক একটা গল্প-উপন্যাস। ২০০১ সালের ১২ই আগস্টে কর্মরত অবস্থায় সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাকে আমার জ্যাঠা মৃত্যুবরণ করেন। যুদ্ধের পরে আমাদের থানায় প্রথম কোনো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার জ্যাঠাই প্রথম মারা যান। নিজ গ্রামে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে দাফন করা হয়।

সবার কাছে শুনি খুব বড় মনের এবং ভাল মানুষ ছিলেন আমার জ্যাঠা। মুক্তিযুদ্ধ না দেখলেও নিজ পরিবারের একজন দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করায় জ্যাঠার জন্য গর্ববোধ করি। জ্যাঠা, আপনাদের হাতে তৈরি হওয়া এদেশকে যেন সত্যিকার ভাবে ভালোবাসতে এবং গড়তে পারি আল্লাহ যেন সেই শক্তি আমাকে দান করেন। আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং হাজারো সালাম নিবেন। ওপারে ভাল থাকুন।



নাম: হিমাংশু দেবনাথ  
কলেজ নম্বর: ১৮২৮৫  
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: গ (প্রভাতি)

## পঞ্চমিত্রের অভিযান

আমরা পাঁচজন বন্ধু। হিমাদ্রি, কামাল, তপু, রাশেদ ও আমি প্রিয়ম। আমি, তপু ও হিমাদ্রি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। কামাল ও রাশেদ আমাদের চেয়ে বড়, তারা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। বড় হওয়া সত্ত্বেও আমরা খুব ভালো বন্ধু। আমরা সবসময় একসাথে খেলা করি, বেড়াতে যাই, স্কুলে যাই। আমাদের মা-বাবাদের মধ্যেও খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। বার্ষিক পরীক্ষার পর আমাদের মা-বাবারা ঠিক করলেন সবাই মিলে আমাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাবেন। আমরা সবাই খুব খুশি হয়ে রওনা দিলাম আমাদের গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে। কিছুদিন পর আমরা শুনতে পেলাম গ্রামের দুইটি বাচ্চাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং ভাঙ্গা রাজবাড়ি থেকে রাতে ভূতের মতো শব্দ, উড়ন্ত ছায়া ও কান্নার শব্দ শোনা যায়। গ্রামের সবাই খুব ভয় পেয়ে আছে এই ঘটনায়।

রাশেদ বললো: “চল সেই রহস্যময় বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।”

তপু খুব ভয় পেয়ে গেল। সে বললো, ‘বেশি সাহস দেখাস না, যদি আমাদের কোন বিপদ হয়?’

কিন্তু রাশেদ কোন কথাই শুনতে চাইলো না, সে যাবেই। কী আর করা আমরাও রাজি হয়ে গেলাম। বিকালে খেলার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়ে আমরা গেলাম ভাঙ্গা রাজবাড়িতে। একটি ব্যাগে টর্চ, কিছু খাবার ও পানি নিয়ে নিলাম। রাজবাড়িতে ঢুকে আমরা অবাক-সেখানে ঝুলন্ত কাপড়, হারিকেন এবং অনেক মানুষের পায়ের ছাপ দেখে বোঝাই যাচ্ছে এখানে মানুষ চলাচল করে। সাবধানে চলতে লাগলাম আমরা। হঠাৎ পায়ের সাথে কিছু বেঁধে তপু পড়ে গেল আর অনেক জোরে চিৎকার করলো। আমরা সবাই খুব ভয় পেয়ে গেলাম। সাবধানে তপুকে তুলে পানি খাওয়ালাম এরপর আমরা গেলাম একটা বন্ধ ঘরের সামনে। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই নাকে এসে লাগলো একটা গন্ধ। আমরা জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আমার যখন জ্ঞান ফিরলো তখন ভোর হয়ে গেছে, দেখি আমাদের সবার হাত-পা বাঁধা। অনেক চেষ্টা করার পর কামাল তার হাতের বাঁধন খুলতে পারলো এবং আমাদের সবাইকে খুলে দিল। ঘরের মধ্যে আমরা আমাদের ব্যাগ খুঁজে পেলাম। রাশেদ

বললো: “দেখেছিস ভূতটুত কিছু নেই, সব দুষ্ট লোকের কাজ।”

এমন সময় পাশের ঘর থেকে অনেক বাচ্চার কান্নার শব্দ পাওয়া গেল। আমরা তাড়াতাড়ি গেলাম সেদিকে। গিয়ে দেখি চার-পাঁচ বছরের দশটা বাচ্চাকে বেঁধে রাখা হয়েছে সেখানে। বাচ্চাগুলো আমাদের দেখে আরো জোরে কেঁদে উঠলো। আমরা তাদের বাঁধন খুলে খাবার আর পানি দিলাম। ওদের কাঁদতে নিষেধ করলাম আমরা। হঠাৎ জোরে জোরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। আমরা পরিকল্পনা করলাম। আমি আর কামাল দড়ি টানটান করে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার দুইদিকে। ঘরে পড়ে থাকা লাঠি তুলে নিল বাকিরা। লোকটি যেই দরজা দিয়ে ঢুকলো অমনি দড়িতে পা বেঁধে ধপাস করে পড়ে গেল।

হিমাদ্রি, তপু আর রাশেদ শুরু করলো লাঠিপেটা। লোকটি অজ্ঞান হয়ে গেলে দড়ি দিয়ে তাকে বাঁধা হলো এবং তার পকেট থেকে মোবাইল পাওয়া গেল। সবাই আনন্দে নেচে উঠলাম। পুলিশে খবর দিলাম আমি। এমন সময় আবার বিপদ এগিয়ে আসলো আমাদের দিকে। অজ্ঞান লোকটির খোঁজ করতে চলে এলো আরো দুজন। তারা বলতে লাগলো, ‘কালু, এই কালু! উত্তর দিচ্ছিস না কেন? সব ঠিক আছে তো?’ আমরা আবার একইভাবে দাঁড়ালাম, আবার প্রথম লোকটা পড়ে গেল এবং লাঠিপেটা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। দ্বিতীয় লোকটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল, অমনি দশটা বাচ্চা একসাথে বাঁপিয়ে পড়লো লোকটির উপর। আঁচড়াতে, কামড়াতে লাগলো বাচ্চাগুলো। এমন সময় কামাল লাঠি দিয়ে লোকটির মাথায় জোরে বাড়ি মারতেই লোকটি অজ্ঞান হয়ে গেল। তিনজনকেই বেঁধে ফেললাম আমরা। এমন সময় পুলিশ এলো এবং কিডন্যাপারদের ধরে নিয়ে গেল। গোটা একটা রাত পার করে আমরা যখন বাড়িতে ফিরলাম তখন মা-বাবারা সবাইকে বকা দিতে শুরু করলো আমাদের দুঃসাহসিকতার জন্য। কিন্তু গ্রামের লোকরা যখন আমাদের আশীর্বাদ ও প্রশংসা করলো তখন আমরা সবকিছু ভুলে খুব খুশি হলাম। ছুটির রোমাঞ্চকর ঘটনা বুকে নিয়ে আমরা পাঁচ বন্ধু ফিরে এলাম ঢাকায়।



নাম: আফফান ইবনে হাফিজ  
কলেজ নম্বর: ১২৮০৬  
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা: ও (দিবা)

## তেলিয়াপাড়া- মুক্তিযুদ্ধের শুরু এখানেই

গত ইদের ছুটিতে আমরা পরিবারের সবাই আমার দাদাবাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া বেড়াতে যাই। ইদের পরের দিন বাবা-মা ঠিক করেন আমাদের হবিগঞ্জে চা বাগান দেখাতে নিয়ে যাবেন। সকালবেলা নাস্তা করে আমরা রওনা হই হবিগঞ্জের পথে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পরের জেলাই হবিগঞ্জ। হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলায় রয়েছে অনেক চা বাগান। আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটে চলছিল। চারপাশে যতদূর দেখা যায় সবই সবুজ চা বাগান। বাবা একটা চা বাগানের ভিতরে আমাদের গাড়ি থামালেন। চা বাগানের নাম তেলিয়াপাড়া চা বাগান। বাবা জানালেন এটি অন্যান্য চা বাগানের মত সাধারণ চা বাগান নয়। এই চা বাগানের একটা ইতিহাস রয়েছে।

১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়া চা বাগানে একটা গোপন বৈঠক হয়। একদম গোপনে, যেন পাকিস্তানি বাহিনীর কেউ টের না পায়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্মকর্তা ও সাতাশ জন সেনা কর্মকর্তা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী। স্বাধীনতা যুদ্ধের নকশা তৈরি করা হয় এই গোপন বৈঠকে। এরপর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার শপথ করেন সবাই। বৈঠক শেষে এম এ জি ওসমানী নিজের

পিস্তলের ফাঁকা গুলি ছুড়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই বৈঠকেই দেশকে যুদ্ধের জন্য ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল এবং এস ফোর্স, কে ফোর্স ও জেড ফোর্স গঠন করা হয়েছিল।

চা বাগানের ভিতরের জায়গাটি একদম নীরব ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। যতদূর দেখা যায় সবটুকুই সবুজে ছেয়ে আছে। বাগানের এক পাশে মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণে তৈরি করা হয়েছে তেলিয়াপাড়া স্মৃতিসৌধ। বিশাল বুলেট আকৃতির এই স্মৃতিসৌধ। স্মৃতিসৌধের সামনে দুইটি ফলকে খোদাই করে কবি শামসুর রাহমানের বিখ্যাত কবিতা ‘স্বাধীনতা তুমি’ লেখা আছে। স্মৃতিসৌধের একপাশে একটি লেক আছে। পুরো লেকে লাল শাপলা ফুটে ছিল। বর্ষাকালেই নাকি এই শাপলা ফোটে। খুব সুন্দর লাগছিল সেই দৃশ্য। আমরা লেকের পাড়ে বসে কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। মা আমাদের যুদ্ধের গল্পগুলো বলছিলেন আমি আর আমার ছোট ভাই অবাক হয়ে শুনছিলাম। মা জানালেন, তেলিয়াপাড়া মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাক্ষী। প্রতিবছর ৪ এপ্রিল ঐতিহাসিক তেলিয়াপাড়া দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা জীবন দিয়ে আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছেন। তাঁরা আমাদের গর্ব, আমরা তাঁদের কোনোদিন ভুলব না।



নাম: আহনাফ মুক্তাকী নববী  
কলেজ নং : ১২৮১১  
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : E (দিবা)



নাম: ইশতিয়াক আহমেদ স্বচ্ছ  
কলেজ নম্বর: ১৮৮৩৬  
শ্রেণি: ষষ্ঠ শাখা: ঘ (প্রভাতি)

## একটি সুন্দর সকাল

১৫ই ডিসেম্বর, রাত ৯টা। মা বললেন, ‘তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো, কাল সকালে তোমাদের জন্য সারপ্রাইজ আছে’। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম, মা এক পাতিল খিচুড়ি রান্না করেছে। তারপর মা খিচুড়িগুলো প্যাকেট করছে। তখনও আমি জানি না আমরা এ খিচুড়ির প্যাকেটগুলো কী করবো? মা আমাকে এবং আমার ছোটভাই (আন-নাফ)কে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ড গেলেন। মা আমাদের নিয়ে ওভারব্রিজের উপরে উঠলেন। উপরে উঠে দেখি কিছু উদ্ভাস্ত ঘুমিয়ে আছে। আমরা তাদেরকে সেই প্যাকেট করা খিচুড়ি দিলাম। আমরা তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি, তাই আমরা তাদেরকে না ডেকেই খাবারের প্যাকেট তাদের পাশে রেখে আসলাম। আমার খুব ভালো লেগেছে, আবার খুব কষ্টও লেগেছে। আমি সেখানে তাদের ছবি তুলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মা বললেন, দান করতে হয় নীরবে। তাই আমরা খাবার দেওয়া শেষ করে আবার হাঁটতে হাঁটতে বাসায় ফিরে এলাম।

## T-Rex

T-Rex বা Tyrannosaurus হলো পৃথিবীতে যত ডাইনোসর প্রজাতি ছিল তার মধ্যে হিংস্রতম প্রজাতি। T-Rex এর ‘Rex’ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘জবী’ থেকে। যার অর্থ রাজা। অর্থাৎ T-Rex এর অর্থ হলো সব প্রাণীর রাজা। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত মাংসাশী ও হিংস্র প্রাণী এসেছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় ও হিংস্রতম। ১৯০২ সালে জীবাশ্মবিদ বারনুম ব্রাউন সর্বপ্রথম এর ফসিল আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন ৬৫ মিলিয়ন (৬ কোটি ৫০ লক্ষ) বছর পূর্বে এরা পৃথিবীতে রাজত্ব করত। উত্তর আমেরিকা ও মঙ্গোলিয়ায় এর দেহাবশেষ পাওয়া যায়। ২০০টি হাড় সংবলিত প্রাণীটির ওজন ছিল ৬-৮ টন। দৈর্ঘ্য ছিল ৪০ ফুটের বেশি ও উচ্চতা ১৫-২০ ফুট। এদের মাথার খুলির দৈর্ঘ্য ছিল ৫.৫ ফুট ও দাঁতের দৈর্ঘ্য ছিল ৯ ইঞ্চি। এটি এর দেহের চেয়েও বড় ডাইনোসরকে শিকার করতে পারত। এরা এদের নিজেদের প্রজাতিকেও খেতে দ্বিধা করত না। এর পায়ের ছাপের দৈর্ঘ্য হলো ১.৫-৩.৫ ফুট। এখনও বিজ্ঞানীরা T-Rex সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছে।



নাম: মো: ফারহান তাহমিদ

কলেজ নম্বর: ডি ১৩২৩৯

শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ঘ (প্রভাতি)

## স্বপ্নপূরণ

বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের এক প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করে তব্বী নামের একটি মিষ্টি মেয়ে। তার গ্রামের নাম পঞ্চপুকুর। সেই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজ ও দিনমজুরের কাজ করে জীবন চালাতেন। তব্বীর বাবা রফিক হোসেন কৃষি কাজ করেন এবং মা জবা খাতুন বাসা বাড়িতে কাজ করে সংসার চালাতেন। তব্বী খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে। তার স্বপ্ন সে বড় হয়ে একজন চিত্রশিল্পী হবে এবং একটি ছবি আঁকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবে। সেখানে সে বিনামূল্যে অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ছবি আঁকা শেখাবে। কিন্তু অর্থের অভাবে তব্বীর নিজেই ছবি আঁকার সুযোগ পায় না। সে শক্ত কোন কিছু নিয়ে মাটির উপর দাগ কেটে ছবি আঁকে। অর্থের অভাবে সে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করতে পেরেছে।

একদিন তব্বীর মা জবা খাতুন তব্বীকে সাথে নিয়ে যান কাজ করতে। তিনি যে বাড়িতে কাজ করতেন সেই বাড়ির মালিকের নাম ছিল রোকসানা ইসলাম। রোকসানা ইসলাম এবং তার স্বামী দুজনেই সরকারি চাকরি করতেন। রোকসানা ইসলাম ছিলেন অনেক দয়ালু। তিনি তব্বীকে খুব আদর করতেন এবং নিজের কাছে থাকতে দিলেন। তিনি তব্বীকে একটি স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। তব্বী স্কুল শেষে বাড়িতে কাজ করত। একদিন রোকসানা ইসলাম এবং তার স্বামী অফিসে ছিলেন। তাদের ছেলে রাজু মাটির হাঁড়ি নিয়ে খেলার জন্য বায়না ধরল। কিন্তু রাজুর খেলার জন্য কোন মাটির হাঁড়ি ছিল না। তখন তব্বী

রাজুকে একটি মাটির হাঁড়ি বানিয়ে দিল এবং তাতে সুন্দর নকশা এঁকে রং করে দেয়। রোকসানা ইসলাম তব্বীর এমন প্রতিভা দেখে তাকে ঢাকায় আরও ভালো করে ছবি আঁকা শেখার জন্য পাঠাবেন এবং ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু তব্বীর ভাগ্যে ঘটলো একটি দুর্ঘটনা। যেদিন তব্বী ঢাকায় আসবে তার আগের দিন সে কাপড় ধুতে গিয়ে পিছলে পড়ে তার ডান হাতটি ভেঙ্গে ফেলে। সবাই তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার বলেন, ‘তব্বী আর কখনো ডান হাত আগের মত ব্যবহার করতে পারবেনা।’ সবাই ভেবেছিল তব্বীর ছবি আঁকার স্বপ্ন এখানেই শেষ। কিন্তু তব্বী হাল ছাড়েনি। বাম হাত দিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করছিল তব্বী। কিন্তু সে আগের মত আর ছবি আঁকতে পারছিল না। তার বাম হাত দিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা দেখে রোকসানা ইসলাম একজন বাম হাতে ছবি আঁকার শিক্ষকের কাছে তব্বীকে ভর্তি করে দেন। শিক্ষক অনেক চেষ্টা করলেও, তব্বীর বাম হাত দিয়ে আঁকা ছবি আগের মত সুন্দর হচ্ছিল না। এক বছর চেষ্টার পর তব্বী তার প্রতিভা আবার ফিরে পায়। তব্বী আবার আগের মত সুন্দর ছবি আঁকতে পারছিল। রোকসানা ইসলাম তাকে ঢাকায় একটি ভালো ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি করে দেন। তব্বীর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়া শুরু করে এবং সে একজন চিত্রশিল্পী হয়ে ওঠে। তব্বী এখন পঞ্চগড় জেলার গৌরব।



নাম: ফাইরুজ জাওয়াদ  
কলেজ নম্বর: ১১২২২  
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: গ (দিবা)

## দি থ্যানি

“একদিন রাকিব নামে একটি ছেলে একটি ভুতুড়ে বাড়ি গিয়েছিল। কিন্তু ওই দিনের

পর থেকে তাকে আর দেখা গেল না।”

মুসা দৌড়ে গেল কিশোর আর মুনিরার কাছে। মুসা বলল, “তোমরা কি কেউ রাকিবকে চিনো?। মুনিরা বলল, “রাকিব?? হ্যাঁ, আমি চিনি।” কেন? “গত তিন দিন ধরে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না”, বলল মুসা। “সেদিন ছুটি হওয়ার পর থেকে সে আর বাসায় ফিরে নি”। “বল কী!!!”, মুনিরা বলল। “আচ্ছা, ঘটনাটি কী পুলিশকে জানানো হয়েছে?, কিশোর জিজ্ঞাস করল। “হ্যাঁ, পুলিশ এ নিয়ে তদন্ত করছে। তারা ধারণা করছে যে, রাকিব কে অপহরণ করা হয়েছে”, মুসা বলল। “তবে আমার সাথে যখন তার শেষ দেখা হয়, সে আমাকে স্কুলের পিছনের ভুতুড়ে বাড়ির কথা বলছিল। আমার মনে হয় সে সেখানে গিয়েছে।” “তাহলে তো আমাদের সেখানে দেখা উচিত। হয়তো আমরা তাকে সেখানে পেয়ে যেতে পারি। কী বল তোমরা?”, বলল কিশোর। “কিশোর ঠিকই বলছে। আমাদের একবার সেখানে যাওয়া উচিত”, বলল মুনিরা। “তা হলে আমরা সবাই মিলে একত্রে স্কুলের সামনে দেখা করব। ঠিক আছে?”, মুসা বলল। “ঠিক আছে”, বলল মুনিরা আর কিশোর।

মুনিরা আর কিশোর অনেকক্ষণ ধরে মুসার জন্য অপেক্ষা করছে। তারপর মুসা এল। কিশোর রাগান্বিত হয়ে মুসাকে অনেক বকাঝকা করলো। তারপর মুনিরা তাকে থামালো। তারপর মুসা তাদের সবাইকে নিয়ে সেই ভুতুড়ে বাড়ির কাছে

গেল। তারা দেখল বাড়ির দরজাটা খোলা। তারা বাড়ির ভিতর ঢুকল এবং দরজাটা আটকিয়ে দিল। “বাড়িতে তো কেউ নেই দেখছি”, বলল মুনিরা। “আমাদের চারদিকে আলাদা হয়ে রাকিবকে খোঁজা উচিত”, বলল কিশোর। কিশোরের কথার সাথে রাজি হলো মুনিরা আর মুসা। তারা আলাদা আলাদা রুমে গিয়ে তাকে খোঁজা শুরু করল। মুনিরা গেল ড্রয়িং রুমে আর মুসা গেল রান্নাঘরে। তবে কিশোর গেল উপর তলায়। মুনিরা ড্রয়িং রুমে গিয়ে বেশ অবাক হলো। সে দেখল বাড়িটা দেখতে যতটা নোংরা মনে হয় কিন্তু ভিতরের রুমগুলো তার থেকে বেশি পরিষ্কার। তারপর সে টেবিলে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখল। সে জিনিসটার কাছে গেল। কিন্তু হঠাৎ কে যেন তার মাথায় শক্ত কিছু একটা দিয়ে আঘাত করলো। সাথে সাথে সে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। অন্যদিকে মুসা দেখল যে রান্নাঘরে টেবিলে একটি প্যাস্ট্রি পড়ে আছে। তার পাশে একটা চাবি পড়ে আছে। সে আগে চাবিটা তুলে নিল। তারপর সে প্যাস্ট্রি খেতে এগোলো। হঠাৎ কে যেন তার মাথায় শক্ত কিছু একটা দিয়ে আঘাত করলো। সাথে সাথে সে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

“ওঠো মুসা! ওঠো”, বলল মুনিরা। শেষ পর্যন্ত মুসা উঠল। সে দেখল মুনিরা তাকে ওঠানোর চেষ্টা করছিল। সে মুনিরার পেছনে আরেকজনকে দেখল। প্রথমে সে চিনতে পারল না। তারপর সে দেখল যে এটা তো ওদের বন্ধু রাকিব। “রাকিব!! তুমি এখানে কী করছো?”, জিজ্ঞাসা করল মুসা। “তা আমি তোমাদের পরে বলব। আগে এখান থেকে বের হতে হবে”, বলল রাকিব। মুসা দেখল যে তারা একটা জেলখানায় আছে।

“এই জেলখানা থেকে বের হব কী করে?”, জিজ্ঞাসা করল মুসা। “দেখো, দরজায় চাবি ঢুকানোর জায়গা আছে। তার মানে আমাদের একটা চাবি লাগবে এখন থেকে বের হওয়ার জন্য”, বলল মুনীরা। তখন মুসার রান্নাঘরে পড়ে থাকা চাবির কথা মনে পড়ল। সে পকেট থেকে চাবিটা বের করে জেলের তালা খোলার চেষ্টা করল। সে দেখল দরজাটা খুলে গেল। মুনীরা আর রাকিব অবাক হয়ে গেল। “মুসা, তুমি এই চাবিটা কোথা থেকে পেলো?”, জিজ্ঞাসা করল মুনীরা। “আমি এটা অজ্ঞান হওয়ার আগে রান্নাঘরের টেবিল থেকে পেয়েছিলাম”, বলল মুসা। তারপর তারা জেল থেকে বের হলো। “আমাদেরকে এই বাড়ি থেকে বের হতে হবে”, বলল রাকিব। হঠাৎ তারা পায়ের শব্দ পেল। দেখল একজন ভুতুড়ে মহিলা তাদের সামনে এল। “হায় হায়!! গ্র্যানি চলে এসেছে!!”, বলল রাকিব। গ্র্যানির হাব-ভাব দেখে তাদের ভালো মনে হলো না। তারা পালানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। যখন তারা পালাতে গেল তখন তারা দেখল যে ফ্লোর ভাঙ্গা। তারা আর পালাতে পারবে না। তখন তারা গ্র্যানির দিকে তাকাল। তারপর তারা বন্দুকের আওয়াজ পেলো যেন তাদের কাছেই কেউ বুলেট ছুঁড়ল এবং ধারণাটা ঠিকই ছিল। তারা দেখল একটা ছেলে বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটা কাছে আসতেই তারা তাকে চিনে ফেলল। যে ছেলেটা আর কেউ নয় তাদের বন্ধু কিশোর। সে তাড়াতাড়ি এসে গ্র্যানির জামা থেকে একটা চাবি বের করল এবং তাড়াতাড়ি তাদের পাশে একটা রুমে ছুটে গেল। তারা দেখল যে তাদের পাশের রুমের সাথে একটা দরজা আছে। যার সাহায্যে তাদের রুম থেকে পাশের রুমে যাওয়া যায়। মুসা আগেই সে রুমের দরজাটা খোলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দরজাটা আটকানো ছিল। কিশোর চাবির সাহায্যে দরজাটা খোলার চেষ্টা করল। দেখল দরজাটা খুলে গেছে।

“কিশোর!!!”, বলে চৌঁচিয়ে উঠল মুনীরা আর মুসা। “আচ্ছা তোর কাছে এই বন্দুকটা কোথা থেকে এল?”, জিজ্ঞাসা করল মুসা। “এইসব পরে বলব গ্র্যানির জেগে ওঠার আগেই আমাদের এখন থেকে পালাতে হবে”, বলল কিশোর। তারপর তারা ওই রুম থেকে বেরিয়ে নিচে এল। “আমি গ্যারেজ থেকে এই বন্দুকটা পেলাম। আমি এখানকার সব রুমে জিনিসপত্র খুঁজে এই গাড়ির চাবি পেলাম। কিন্তু আমার এখনও একটা চাবি দরকার যার সাহায্যে গ্যারেজের গাড়ি বেরোনোর দরজা খুলে। আমি এখনো একটা তলায় যায়নি।

সেখানে হয়তো তা পেয়ে যেতে পারি। তোমরা আমার পিছনে আসো”, বলল কিশোর। তারপর তারা সে তলায় গেল। সেখানে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে চাবিটা পেল। “অবশেষে এই চাবিটা পেলাম। এখন আমরা এই বাসা থেকে বের হতে পারব।” বলল কিশোর। শুনে অনেক খুশি হলো মুনীরা আর মুসা। “কিন্তু তোমরা আর এই বাসা থেকে বের হতে পারবে না।”, হঠাৎ করে বলে উঠল রাকিব। তারপর দেখল রাকিব তার রূপ বদলিয়ে ফেললো। তারপর তারা বুঝতে পারল যে এটা রাকিব নয় এটা আরেকটা ভূত।” এটা তো সেলেনড্রিনা। গ্র্যানির নাতি”, বলে উঠল মুসা। তারা একসাথে দৌঁড় দিলো। তারা সবাই গ্যারেজের দিকে দৌঁড়ানো শুরু করল। গ্যারেজে এসে তারা যে জায়গায় গাড়ি রাখা তার পাশের রুমে ঢুকে পড়ল। তারা সেখানে আসল রাকিবকে হাত,পা,মুখ আটকানো অবস্থায় দেখল। তারা তাড়াতাড়ি তার হাত,পা,মুখ খুলল। তারা দেখল সেলেনড্রিনা এখনো গ্যারেজে পৌঁছায় নাই। তারা সবাই রুম থেকে বের হয়ে গাড়িতে ঢুকে পড়ল। কিন্তু কিশোর বাইরে ছিল। সে গাড়ি বের হবার জন্য দরজা খুলতে গেছে। দরজা খোলার পর সে যখন গাড়িতে ঢুকতে গেছে ঠিক তখন সেলেনড্রিনা আসে। সে তাড়াতাড়ি গাড়ি চালু করে। এবং এক্সেলেরেটর অনেক জোরে চাপ দিয়ে ধরে রাখে। গাড়ি অনেক জোরে গ্যারেজ থেকে বের হয়ে রাস্তায় চড়ে অনেক দূর চলে যায়। “আসলে তোমার সাথে কী ঘটেছিল?”, জিজ্ঞাসা করল মুনীরা। “তোমাদেরকে শুরু থেকে বলছি। আসলে আমি ভূত দেখে ভয় পাই। এটা দেখে আমার সহপাঠিরা আর বন্ধুরা মিলে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করত। তাই ওদের দেখানোর জন্য আমি ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করলাম যে আমি এ বাড়িতে একদিন একা কাটাব। আমি বাবা-মাকে এ ব্যাপারে কিছু বলিনি। যখন আমি এই বাড়িতে এলাম তখন দেখলাম যে এই বাড়িতে কেউ নেই। কিন্তু দেখলাম বাড়িটা সুন্দরভাবে গোছানো। দেখেই মনে হয় না যে এই বাড়িটা অনেক পুরোনো। আমি উপর তলায় গিয়ে একটা রুম পেলাম যেখানে আমি একদিন কাটাতে পারবো যখন আমি রুমে গেলাম তখন হঠাৎ করে কে যেন আমার মাথায় শক্ত কিছু একটা দিয়ে বাড়ি দিল। সাথে সাথে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।”, বলল রাকিব। তারা রাকিবের বাড়ি অবশেষে পৌঁছাল। “এডভেঞ্চারটা জোস হয়েছে”, বলল মুসা। সাথে সাথে হেসে উঠল সবাই।



নাম: জাহিন আবেদ

কলেজ নম্বর: ১১৯৭১

শ্রেণি: ৬ষ্ঠ শাখা: ঘ (দিবা)

## পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অঞ্চলে আমার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

২০ ডিসেম্বর ২০২১, রাত এগারোটা।

রাজধানীর পাহুপথ বাস পয়েন্ট। অপেক্ষা করছি বাসের জন্য। রাত সাড়ে এগারোটায় যাত্রা শুরু হলো খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে। ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ির দূরত্ব প্রায় ২৭০ কিলোমিটার। এই জেলাকে স্থানীয়ভাবে ‘চেংমি’, ‘ফালাং’, ‘তাউং’ ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়। সকাল ছয়টায় পৌঁছে গেলাম খাগড়াছড়ি শহরে। চারপাশে খালি পাহাড় আর পাহাড়। সকাল নয়টায় রিছাং ঝর্ণার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। রিছাং ঝর্ণা স্থানীয়ভাবে ‘তেরাং তৈকালাই’ নামেও পরিচিত। ঝর্ণার আশে পাশে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম। অনেক আনন্দ হলো। এরপর রওনা দিলাম আলুটিলা গুহার উদ্দেশ্যে। এটি ছিলো আমার জন্য সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। কারণ পাহাড়ি গুহায় আমি আগে কখনো ঢুকিনি। গুহার ভিতর ছিলো প্রচুর অন্ধকার। তাই টর্চলাইট নিয়ে ঢুকতে হলো। সেখানে অন্ধকারের জন্য ভুতুড়ে এক ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় দশ মিনিট লাগলো গুহার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে। এরপর গেলাম একটি বৌদ্ধ মন্দিরে। সেই মন্দিরটিতে জুতা খুলে ঢুকতে হলো। আরো কিছু জায়গায় ঘুরে রেস্ট হাউজে ফিরে এলাম। রাতটা সেখানেই কাটলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠেই রওনা হলো সাজেকের উদ্দেশ্যে। যার জন্য সকাল নয়টার আগেই দিঘীনালা উপস্থিত হতে হলো। কারণ, সাজেকে যেতে হলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে

সেনাবাহিনী টহল দিয়ে সকল গাড়ি নিয়ে যায়। সেখান থেকে খুব কাছে দিঘীনালা বাজারে অনেক কিছু পাওয়া যায়। সেখানে বিন্দি চাল, মরিচ, মাশরুম, বাঁশের কোড়ল, কলা, পেঁপে, তিল ইত্যাদি পাওয়া যায়। পথে ক্ষুধা মেটানোর জন্য আমরা সেখান থেকে কমলা, কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফল কিনে নিলাম। যেগুলো ছিলো খুবই সুস্বাদু। সকাল নয়টায় আমাদের গাড়িসহ অনেক গাড়ি ও জিপের মতো এক ধরনের বেশ কিছু গাড়ি রওনা দিল। জিপের মতো সেই গাড়িগুলোকে স্থানীয়ভাবে ‘চাঁদের গাড়ি’ বলা হয়ে থাকে। এই নামকরণের পিছনে একটি ইতিহাস আছে। প্রাচীন আমলে পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন প্রয়োজনে পাহাড় বেয়ে বেয়ে অনেক উপরে উঠতে হতো। সেই সময়ে এসব গাড়ি যখন প্রথম এই অঞ্চলে এলো, তখন তারা অনেক বিস্মিত হলো। কারণ তারা দেখলো যে এটি দিয়ে কয়েকদিনের পথ কয়েক ঘণ্টায় অতিক্রম করা যায়। তারা বলতে থাকলো, এটি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে চাঁদে চলে যাওয়া যাবে। এ ধারণা থেকেই এর নামকরণ হলো ‘চাঁদের গাড়ি’। প্রায় তিন ঘণ্টা সময় পর আমরা সাজেকে পৌঁছলাম। সাজেকে যাবার পথটি ছিলো খুবই সুন্দর। আঁকাবাঁকা পথ ধরে যাত্রা করতে করতে অনেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকদের বাড়ি দেখতে পেয়েছিলাম। পাহাড়ি রাস্তার সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। সাজেকে পৌঁছে আমি দেখলাম চারপাশে মেঘ আর মেঘ। অনেক দূরে বিভিন্ন পাহাড়



দেখা যাচ্ছিল। বিকালে আমরা বের হলাম কংলাক পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। কংলাক পাহাড় অনেক উপরে। তাই যেতেও বেশ সময় লাগলো। কংলাক পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছানোর পর বেশ কিছু দোকান আর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বাড়ি দেখতে পেলাম। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। রাতে খেতে গিয়ে একটি নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম। সেটি হলো ব্যাঘো চিকেন ও ব্যাঘো বিরিয়ানি। সাধারণত খাবার যেভাবে বানানো হয় এই দুটি সেভাবে বানানো হয়নি, এই দুটি খাবারই বাঁশের মধ্যে রেখে রান্না করা হয়েছে। খাবারগুলোর স্বাদ অন্য খাবারের থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও খেতে অনেক সুস্বাদু ছিলো। পরের দিন ভোরে হেলিপ্যাডে ঘুরতে গেলাম। সেখানে গিয়ে খুব সুন্দরভাবে সূর্যোদয় দেখতে পেলাম। এরপর গেলাম লুসাই গ্রামে। লুসাই গ্রামে লুসাই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে পেলাম। সেখানে অনেক নিদর্শনের মধ্যে যেটি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে সেটি হলো, দোকানদার ছাড়া দোকান। অর্থাৎ, এটি এমন একটি দোকান যেখানে কোনো দোকানদার থাকে না। ক্রেতা যে পণ্যটি কিনতে চায়, সেই পণ্যটি নিয়ে পণ্যের নির্দিষ্ট মূল্য নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হয়। লুসাইরা একে অপরকে এতোটুকু বিশ্বাস করে। এরপর সকালের নাস্তা খেয়ে আবার গাড়িতে চেপে বসলাম। গন্তব্য রাঙামাটি। সাজেক রাঙামাটি জেলার মধ্যে অবস্থিত হলেও, রাঙামাটি যেতে হলে খাগড়াছড়ি অতিক্রম করে যেতে হয়। কারণ, সাজেক থেকে সরাসরি রাঙামাটি যাবার কোনো রাস্তা নেই। সকাল ৯ টার দিকে যাত্রা শুরু করে দুপুর ১২ টার দিকে খাগড়াছড়ি পৌঁছালাম। এরপর যাত্রা শুরু করলাম রাঙামাটির উদ্দেশ্যে। খাগড়াছড়ি থেকে রাঙামাটির দূরত্ব প্রায় ৭৫ কিলোমিটার। বিকাল ৩ টার দিকে রাঙামাটি পৌঁছালাম। এরপর বিশ্রাম নিলাম। রাতে রেস্ট

হাউজে অবস্থান করলাম। পরের দিন সকালে উঠেই কাপ্তাই লেকের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। কাপ্তাই লেকে এসেই নৌকায় উঠে গেলাম। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় কৃত্রিম জলাধার রাঙামাটির কাপ্তাই লেক বা হ্রদ। এই লেকের পানির প্রধান উৎস কর্ণফুলী নদী। এই নদীর গতিমুখে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান আমলে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হলে রাঙামাটি জেলার ৫৪ হাজার একর কৃষি জমি ডুবে যায় এবং এ হ্রদের সৃষ্টি হয়। হ্রদ সৃষ্টির কারণে সংরক্ষিত বনের ২৯ বর্গমাইল এলাকা ও অশ্রেণিভুক্ত ২৩৪ বর্গমাইল বনাঞ্চলও ডুবে যায়। এই পাহাড়ি জনপদে বসবাসরত প্রায় ১৮ হাজার পরিবারের মোট এক লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। তাদের বাড়িঘর, উপাসনালয়সহ সবকিছু তলিয়ে যায় এই জলের নিচে। এরপর আমরা একে একে বেশ কিছু জায়গায় গেলাম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্থান হলো বুলন্ত বিজ, শুভলং ঝর্ণা ইত্যাদি। আমরা সব জায়গায় নৌকায় করে গেলাম। পথে অনেক ঝর্ণা, বড় বড় পাহাড় ইত্যাদি দেখতে পেলাম। দুপুরের খাবারে ব্যাঘো চিকেন ও নানা পদের মাছ দিয়ে খেলাম। আমরা একটি বৌদ্ধ মন্দিরেও গেলাম। যেখানে মূর্তিটি ছিলো অনেক বড়। আমরা কাপ্তাই লেকের উপর একটি পাহাড়ি গ্রামেও গেলাম। সেখানে অনেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারও দেখতে পেলাম। এরপর বিকাল ৫ টায় আবার রাঙামাটি শহরে ফিরে এলাম। অল্প কিছু খাবার খেয়ে বাসে চেপে বসলাম। গন্তব্য ঢাকা। আমি জীবনে অনেক জায়গায় গিয়েছি। কিন্তু এটা ছিলো আমার জন্য সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। মাত্র চার দিনের ভ্রমণে আমি অনেক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি, অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। তাই, আমি কখনো এই ভ্রমণের কথা ভুলবো না।





নাম: মো: ফাহিম শাহরিয়ার  
কলেজ নম্বর: ১১১৫১  
শ্রেণি: ষষ্ঠ, শাখা: ঔ (দিবা)

## ভূতের সাথে যুদ্ধ

সজীব তখন ক্লাস সিন্ধ-এ পড়ে। বেশ সাহসী আর উদ্যমী। সে প্রায়ই বহু ভূতের গল্প শুনে থাকে। মাঝে মাঝে বিশ্বাসও করেছে। আবার মাঝে মাঝে অবিশ্বাস করে বন্ধুদের সাথে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। সে বন্ধুদের বলত, ‘যাহ্! ভূত-তুত বলতে কিচ্ছু নেই’। এসবকে কল্প-কাহিনি বলেই উড়িয়ে দিয়েছে সে। কিন্তু এবার সেই ভূতের সাথে সজীবের দেখা। সজীবের বাড়ি কুমারখালীর শালঘর মধ্য গ্রামে। এটি কিছুটা প্রত্যন্ত অঞ্চল। গ্রামটি যথেষ্ট নির্জন। পাশের গ্রামেই তার মামা বাড়ি। তার মামা থাকেন জাপানে। কিছুদিন হলো দেশে ফিরেছেন। কিন্তু সজীবের বার্ষিক পরীক্ষা চলায় সে যেতে পারছিল না। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় তার মামা তার সাথে দেখা করার জন্য সংবাদ পাঠালে সে তৈরি হয়ে নেয়। বাইরে কনকনে শীত। বেশ নিস্তব্ধ পরিবেশ। চাদর গায়ে সজীব হাঁটছে মামাবাড়ির দিকে। সে সুস্থভাবে মামাবাড়ি পৌঁছাল। অনেক দিন পর মামার সাথে দেখা হয়ে গল্প করতে লাগল দুজনেই। এবার সজীবের বাড়ি ফেরার পালা। সে তার মামাকে এই কথা বলতেই মামা বললেন পরদিন সকালে যেতে। সজীব পরীক্ষার কথা মামাকে বলায়, মামা আর মানা করলেন না। রাত বাজে এগারোটা। সজীব বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে জ্যোৎস্নার আলো। চারদিকের পরিবেশও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কোনো লোকজন নেই রাস্তায়। দু’চারটে ঝাঁঝি পোকাক ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। রাস্তা দিয়ে যেতে অনেক ঘুরে যেতে হয়। তাই সজীব বিলের মধ্য দিয়ে লোকের পায়ে চলা সরু পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। এ পথটি ধরে সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারবে। তাই এই পথটি সে বেছে নিয়েছে। চলতে চলতে কেন জানি তার অসীম সাহস ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। বলতে গেলে এক রকম ভয় চেপে বসেছে। সে আর কিছুই নয়; ভূতের! ভয়ের আরেকটি কারণ হলো এ পথেই বিলের মাঝখানে রয়েছে একটি ভাঙ্গা প্রাচীন জমিদার বাড়ি। ভাঙ্গা পাকা ঘরগুলো বিভিন্ন ঝোপঝাড় ঘিরে রেখেছে। বাড়ির পাশেই কয়েকটি তালগাছ। গা শিউরে উঠছে সজীবের। তবুও সাহস নিয়ে এগিয়ে চলেছে সে। কারণ পিছু ফেরার উপায় নেই। কারণ, সে প্রায় ঐ পরিত্যক্ত বাড়ির কাছে এসে

পড়েছে। আগেই বলেছি বাইরে কনকনে শীত। চারদিকে বেশ কুয়াশা পড়েছে। চারপাশে সরষে ক্ষেতে চমৎকার ফুল ফুটেছে। চারদিকে ঝিঝি পোকা ডাকছে। সে দিকে খেয়াল নেই সজীবের। শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। কারণ তাড়াহুড়োর বশে সে মামাবাড়িতেই চাদর ফেলে এসেছে। এখন বেশ রাত, ঘন কুয়াশায় সবকিছু ঝাপসা দেখা যাচ্ছিল। এদিকে ভয়ে তার গা শিউরে উঠছে আবার অন্যদিকে সাহস নিয়ে এগিয়ে চলছে সে। মনে মনে ভাবছে, ‘যা হবার হবেই, কিছুই করার নেই’। হঠাৎ পরিত্যক্ত বাড়ির পাশের একটি ঝোপের দিকে নজর পড়তেই, রক্ত হিম হয়ে উঠল সজীবের। ধবধবে সাদা কাপড় পরিহিত এক বুড়ি ইশারা করে তাকে ডাকছে। পাশেই ঘন জঙ্গল এবং ওপাশে কয়েকটি তালগাছ। সজীবের মনে পড়ে যায় তার বন্ধুদের কথা, তালগাছে না-কি ভূত থাকে। ভাবল তালগাছ থেকেই ভূতটি তাহলে নেমে এসেছে! মনে হতেই সজীবের পা ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। সে কী করবে ভেবে পেল না। আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিল। একবার ভাবল দৌড়ে পালাবে। আবার ভাবল ভূত যদি পেছন থেকে আক্রমণ করে। আবারও সে ওদিকে তাকাল। দেখল, বুড়ি হাতের ইশারা করে আগের মতই তাকে ডাকছে। সজীব তখন ভয়ে চোখ বন্ধ করে ধীর গতিতে সামনে এগোচ্ছে। সে চিন্তা করল, ভূত তাকে আক্রমণ করার আগেই সে ভূতের উপর আক্রমণ করে ভূতকে ধরাশায়ী করে ফেলবে। সজীব চোখ বন্ধ করে বুড়ির দিকে এগিয়ে গেল, একদম নিকটে। “ছাড়ব না আজ তোকে।” এই বলে চিৎকার করে সে জাপটে ধরল ভূতটিকে। চোখ খুলে সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। দেখল সামনে একটি কেয়ার ঝোপ। কেয়ার ঝোপে মাকড়সা বাসা বেঁধেছিল। তাতে কুয়াশা পড়ে সাদা কাপড়ের রূপ ধারণ করে ছিল। শীতের রাতে মৃদু হাওয়ায় কেয়াপাতাগুলো নড়ার কারণে মনে হয়েছিল এক বুড়ি তাকে হাতের ইশারায় ডাকছে। কেয়ার ঝোপকে জাপটে ধরতেই কেয়া-কাঁটার আঘাতে তার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। আর সে ভেবেছিল হয়ত বুড়ি তাকে নখের আঁচড়ে ছিড়ে ফেলছে। এতক্ষণে ব্যাপারটা তার কাছে খোলাসা হয়ে এলো।



নাম : আয়ান মার্শকুর খান  
কলেজ নম্বর : ১০২৮৮  
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা: খ (দিবা)

## স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম

বিশাল এক বাগান। বাগান বললে ভুল হয়, ঘন জঙ্গল বলা যেতে পারে। চারিদিকে বিশাল আম গাছ। এত মানুষ যে পুরো এলাকা একটা গমগমে ভাব। কিছু বিদেশি সাংবাদিকরা গোপনে আসল। তারা অধীর উদগ্রীবে চেয়ে আছে বিস্ময়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেখতে। বিশাল এক আম গাছ দিয়ে তৈরি হয়েছে তোরণ। তোরণে লেখা "WELCOME JOY BANGLA", "স্বাগতম জয় বাংলা"। প্রথমে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সদ্য জন্ম নেওয়া মুজিবনগর সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম.মনসুর আলী (অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী), এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী) প্রমুখ বরেণ্য মানুষেরা। উপস্থিত সকল বাঙালি ভাইয়ের মুখে একটাই স্লোগান।

“তোমার নেতা আমার নেতা  
শেখ মুজিব ! শেখ মুজিব !

বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো  
বাংলাদেশ স্বাধীন করো  
জয়বাংলা !”

সবার মুখে স্পষ্ট যে, জীবন দিয়ে হলেও এ দেশ স্বাধীন করতে হবে। তারা সকলে সর্বস্ব দিয়ে লড়তে প্রস্তুত যা তাদের মুখে প্রস্তুতি হচ্ছিল। হ্যাঁ, বলছি মেহেরপুরের মুজিবনগরের আমবাগানের ১৯৭১ সালের ১৭ ই এপ্রিল এর কথা। এবার, বর্তমানে আসা যাক। স্বাধীনতার ৪৯ বছর পর ২০২০ সালের

সেপ্টেম্বরে মুজিবনগরের (তৎকালীন বৈদ্যনাথ তলায়) দাঁড়িয়ে যেন সেইসব ভাসছে আমার চোখের সামনে। মনে হচ্ছে, আমিও যেন ৪৯ বছর আগের দিনটিতে ফিরে গেছি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হওয়া মহান মুক্তিযুদ্ধ, তার কারণে থাকার সময় তার অবর্তমানে তাকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে গঠিত হয় মহান মুজিবনগর সরকার যা বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এই সরকারের সঠিক নেতৃত্বে মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় দল - মত নির্বিশেষে সকল পেশাজীবী বাঙালি একসাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিত্রবাহিনীর অসামান্য অবদানে মাত্র ৯ মাসে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১০ ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর আগমনে এই স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়। তাছাড়া সেখানকার স্মৃতিসৌধ তাদের অসামান্য অবদান স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মৃতিসৌধের মাঝখানে চারকোনা বিশিষ্ট লাল মঞ্চ যা সূর্য এর মত দেখতে। যেন মনে হয় পাশে ডানে বামে অনেক স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তাছাড়া নতুন তৈরি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনা স্মৃতি জড়িত ভাস্কর্য। যেমন বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য, ১৯৭১ সালে পাক বাহিনী কর্তৃক ঘরে আগুন দেওয়া, বধ্যভূমিতে হত্যা চার নেতা সহ ইত্যাদি ঘটনার বা ব্যক্তি বর্গের ভাস্কর্য। একটি মঞ্চের মত চারিদিক দিয়ে ঘেরা (অনেকটা স্টেডিয়ামের আকৃতি) এর ভিতরে রয়েছে সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের বিশাল মানচিত্র। সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার থেকে পুরো বাংলাদেশকে খুব সুন্দর করে দেখা যায়। নিজেকে আমার এত ভাগ্যবান মনে হয় যে, আমার এই মহান স্থান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।



নাম : মাজহারুল ইসলাম আবিদ

কলেজ নম্বর : ১১৩৬৪

শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: গ (দিবা)

## মন খারাপের আঁচড়

“নিঃশ্বাস আজ বিষাক্ত

হৃদয় ব্যথাহীন,

কবিতাগুলো অর্থহীন

দেহটা প্রাণহীন

আকাশটা শুধু কালো মেঘে ঢাকা

বুকের পাজরের অনুভূতিগুলো গল্পহীন

চোখগুলো ভাষাহীন”

সূর্য তার তেজে বরফ ঢেলেছে, চাঁদ তার উজ্জ্বলতা হারিয়েছে, মেঘ তার কোমলতা হারিয়েছে, পাখিগুলো সুর হারিয়েছে, সবকিছুর শব্দ ছাপিয়ে ঘড়ির টিকটিক শব্দ কানে বাজছে। হৃদস্পন্দন ধীর হচ্ছে। গাছের পাতাগুলো সতেজতা হারিয়ে ক্লান্ত। ঘাসের উপর শিশিরকণা গড়িয়ে পড়ছে কিন্তু রোদের বিলিক চোখ ধাঁধাচ্ছে না। শরীরটা অবসন্ন। কোনো অপারেশন থিয়েটারে অচেতন না করেই হৃদয়ের অস্ত্রপচার হচ্ছে। বুকফাটা চিৎকার আসছে কিন্তু তাও চোখ জলশূন্য। কোনো কামার তার গরম হাতুড়ি দিয়ে আমার ধাতব হৃদয়ে আঘাত করছে কিন্তু হৃদয়ের আকৃতি পরিবর্তনে ব্যর্থ। আজ আমার হৃদয়ের গভীরতা বোঝার সাধ্য কারো নেই! নাহ..... আবেগের চরকায় আর সুতো কাটব না। জানি না আজ আমার অনুভূতির শহরে বাঁধ ভেঙে কীভাবে পানি ঢুকে গেলো। পানির স্রোত সব ভাসিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। সব ভাসতে দিব না। কিছু জিনিস আকঁড়ে রাখব। চারদিকে সবকিছু ফুলে ফেঁপে স্ফীত হয়ে উঠেছে। আমার উপর দিয়েও

পানির প্রবাহ অবিরাম ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে তবুও হৃদয়ের মরুভূমিতে একফোঁটা জলের জন্য আমি হাহাকার করছি।

গাছের মগডালে বসে থাকা পাখি আমাকেও একটু উড়তে শেখাও। আমিও উড়তে চাই, বুকে একটু প্রশান্তির বাতাস লাগলে হয়তো বেঁচে থাকব। আমার চারপাশে অনেক গাছপালা, কিন্তু অক্সিজেনের অভাবে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আমার শহরে আজ ভূমিকম্প। কয়েকটা দেয়াল ধ্বসে পড়েছে। আমার সেই বিধ্বস্ত দেয়াল সাধারণ ইট পাথর বা কংক্রিটের তৈরি নয়। দুস্প্রাপ্য বাছাই করা স্মৃতি দিয়ে তৈরি করেছিলাম। আমার যত্ন করে সাজিয়ে রাখা ফুলের বাগানে আজ পোকামাকড় বাসা বেঁধেছে। পরিচর্যার শস্যক্ষেতে পঙ্গপালের আক্রমণ। দেহটা ঘুণপোকা ঝরঝরে করে ফেলেছে। জীর্ণ অবস্থা, হালকা টোকা লাগলেও ভেঙে যাবো। শিহরণের প্রলোভনে মত্ত হয়েছিলাম, কিন্তু আমার নিয়তি অতিরিক্ত অনুভূতি পছন্দ করে না। আমি বর্ণাঙ্গ, আমার চোখে আলোকরশ্মির একটিই কেবল দেখতে পাই, তাই পোকাকে বেলিফুল মনে করি আর বাদুরকে কোকিল ভেবে ভুল করি। আমি আজ নাকে শ্রাণ পাচ্ছি না। তাই ক্লোরোফর্মের গন্ধ আমায় অচেতন করতে পারছে না। রজনীগন্ধার সুবাস মনে কোনো মোহময় অনুভূতি তৈরি করছে না।

ধাতব অনুভূতিতে আবেগের জলের ফোয়ারা আসলে তেমন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু তুলোর মতো কোমল অনুভূতিতে জোয়ার আসলে তা আরো ভারী হয়ে পড়ে। এই আবেগ সামলানো দুঃসাধ্য।



নাম: সামির হাসান  
কলেজ নম্বর: ১১১৫১  
শ্রেণি: সপ্তম, শাখা: ও (প্রভাতি)

## কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান (Quantum Mechanics)

আমরা আমাদের চারপাশে বিভিন্ন জিনিস দেখতে পাই। কিন্তু এসব জিনিস কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান অনুযায়ী কঠিন ফর্ম (Solid Form) এর থাকে না, এইগুলো থাকে তরঙ্গ ফর্ম (Wave Form) এ। আমাদের চারপাশে বিভিন্ন বস্তু রয়েছে যেমন: চেয়ার, টেবিল, বাড়ি ও ঘর ইত্যাদি। এসব বস্তুকে যদি আমরা জুম করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা তখন সেই বস্তুটার জুম ফর্ম দেখতে পাব এবং আরো বেশি জুম করলে দেখতে পাব পরমাণু (atom) এবং আরো জুম করলে দেখতে পাব ইলেকট্রন (Electron), প্রোটন (Proton), নিউট্রন (Neutron) এবং আমরা যদি আরো জুম করি তাহলে আমরা দেখতে পাব কোয়ার্কস (Quarks)। মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম কণাটির নাম হচ্ছে কোয়ার্কস এবং এই কোয়ার্কসকেও যদি আমরা জুম করি তাহলে আমরা দেখতে পাব (Energy) মহাবিশ্বের প্রতিটি জিনিস (Energy) দিয়ে তৈরি। তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে পৃথিবীতে কোন কিছু কঠিন ফর্ম এ থাকে না। সকল কিছু থাকে তরঙ্গ ফর্ম এ। এর মানে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যা দেখি তা কঠিন (Solid) থাকে না; এর মানে ওই বস্তুটিকে আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের জন্য কঠিন বানিয়ে দেয়। যেমন: আমাদের আশেপাশে অনেক বস্তু, জিনিস রয়েছে কিন্তু ওগুলোর দিকে যখন তাকাব তখন জিনিসটি আমাদের জন্য কঠিন (Solid) রূপ নিয়ে নেয়। এ রকমটা কেন হয় তা বিজ্ঞানীরা এখনও ব্যাখ্যা করতে পারেনি। কিন্তু এ রকমটা হয় কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের মতে। আমরা জানি আমাদের চারপাশে যত জিনিস রয়েছে সবকিছুর ভিতর ইলেকট্রন রয়েছে এবং এই ইলেকট্রন একই সময়ে তরঙ্গ ফর্ম এও থাকে এবং এটি একই সময়ে দৃশ্যমানও থাকে আবার অদৃশ্য হয়েও থাকে;

মানে একই সময়ে এই ইলেকট্রন দুটি ফর্ম এ থাকে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান অনুযায়ী। ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন মিলে তৈরি পরমাণু এবং এই পরমাণু কোয়ার্ক এবং Energy মিলে তৈরি হয় আমাদের আশেপাশের বস্তু। যখন আমরা কোন বস্তুর জুম ফর্মকে বিশ্লেষণ করে তার বৈশিষ্ট্য পাব তখন তাকে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হবে Wave-Particleuality। বিজ্ঞানীরা আরও একটি তত্ত্ব বানিয়েছে যেখানে তারা Multipleiverse এর কথা বলেছে। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান অনুসারে এটিকে Multiverse and Quantum immortality ও বলা হয়। এই তত্ত্ব দ্বারা এটি বলা হয়েছে যে আমাদের এই বিশ্বের মত আরও অনেক বিশ্ব বা মহাবিশ্ব রয়েছে। এসব বিশ্ব বা মহাবিশ্ব আমাদের এই বর্তমান বিশ্বের মতই কিন্তু ওখানকার ঘটনা বা অবস্থা আমাদের এই বিশ্বের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই তত্ত্ব বলে যে এই বিশ্বে যদি আমরা কোন সুপারস্টার হই তাহলে অপরদিকে আরেকটি মহাবিশ্বে আমরা সাধারণ ব্যক্তি। এই “Multiverse” তত্ত্ব আরও বলে যে, আমরা যে স্বপ্ন দেখি তা আরেকটি বিশ্বের ঘটা ঘটনাকে দেখি। এটি শুধুমাত্র একটি তত্ত্ব। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান আরও বলে যে এই বিশ্বে প্রতিটি জিনিস একে অপরের সাথে সংযুক্ত; এর মানে আমাদের প্রতিটি কাজ এই মহাবিশ্বকে প্রভাবিত করবে। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান আরও বলে যে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের অতীতকে প্রভাবিত করে। মেকানিক্সের শাখা বা সাব অ্যাটমিক (Subatomic) কণার গতি। শক্তির (Energy) পরিমাপকরণ তরঙ্গ কণা দ্বৈততা ধারণাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে তাকে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান (Quantum mechanics) বলে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে কঠিন অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়।



নাম: আরাফাত আলম রাফিন  
কলেজ নম্বর: ১২৯৯১  
শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: খ (দিবা)

## অণুপ্রেরণার গল্প...

যেদিন কেউ চাকরি হারিয়ে চোখের পানি মুছে, সেদিনও কেউ না কেউ চাকরিতে প্রমোশন পেয়ে দামি রেস্টুরেন্টে ট্রিট দিচ্ছে.....

লাইফে কিছু করতে না পারার কারণে যেদিন আপনাকে ছেড়ে কেউ চলে গেছে, সেদিনও কোন প্রতিষ্ঠিত ছেলের কাছে কয়েকটা মেয়ের বিয়ের বায়োডাটা এসেছে। হাত পা গুটিয়ে বসে না থেকে সিরিয়াসলি লাইফটাকে নিয়ে ভাবুন। আজীবন সময় দিয়েছেন নিমগাছের নিচে, এখন বলেন 'জীবন এতো তিতা কেন?' দোষ কার ছিল? যার কিছু নেই, তার কেউ নেই। ভাঙ্গা সিন্দুক টাকা রাখা না, নষ্ট ঘড়ির কেউ যত্ন নেয় না। এই সিম্পল হিসাবটা কেউ বোঝেন না।

আপনি যখন রাত জেগে দুনিয়ার হতাশা নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে কमेंট সিমপ্যাথি আদায় করছেন, তখন হয়তো অপরপ্রান্তে কেউ রাত জেগে ফিল্যান্সিং করছে। আপনি কमेंট প্রচুর পাবেন, আর সে পাবে একাউন্টে টাকা। হিসাবটা খুব সিম্পল যে যেটার জন্য কাজ করেছে সে সেটাই পেয়েছে। আপনি যখন স্টুডেন্ট লাইফে বাবার টাকায় বন্ধুর সাথে মাস্তি করে দামি রেস্টুরেন্টে খেয়ে ফেসবুক চেক ইন দিতেন, তখন আপনার এক বন্ধু ক্লাস এসাইনমেন্ট আর নোট নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কয়েকটা বছর শেষে ফলাফল সে এখন বড় কোম্পানির সিনিয়র অফিসার হয়ে দামি রেস্টুরেন্টে অফিসিয়াল মিটিং করে, আর আপনি দুর্বল সিজিপি এর

সার্টিফিকেট নিয়ে টঙের দোকানে বসে চা খেতে খেতে সরকারি চাকুরির বিজ্ঞপ্তি খোঁজেন। এতটুকু পার্থক্য তো হবারই কথা! যে বয়সে আপনার লাইফটাকে জয় করার কথা সে বয়সে করছেন এনজয়। তাই যখন এনজয় করার সময় তখন বেকারত্ব জয় করতেই হিমশিম খাচ্ছেন, এনজয় করার তো অনেক দূরের বিষয়, আপনার বন্ধু যখন বিসিএস ক্যাডার বা ব্যাংক অফিসার হয়ে পাত্রী খুঁজছে। আপনি তখন টিকে থাকার জন্য চাকরি খুঁজছেন। কারণ আপনি ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ডেটিং করতেন, আপনার এই বন্ধুটিই তখন ক্লাসে বসে নোট করতো। আজ আপনার ডেটিং পার্টনারগুলো একটাও নাই। তারা আজ প্রতিষ্ঠিত কারো লাইফ পার্টনার.....

দিন শেষে হতাশ হয়ে বলেন 'শালার ভাগ্যটাই খারাপ!'

No dear, you are totally wrong.

আপনার ভাগ্য আজ আপনাকে এখানে আনেনি, আপনি নিজেই আপনার ভাগ্যকে এত নিচে নিয়ে এসেছেন। বাড়ির পাশে ময়লা ফেলে তা থেকে কীভাবে ফুলের সুবাস আশা করেন? কাজ যা করেছেন রেজাল্ট ও তো তাই হবে....

সুতরাং, সময় থাকতে যেন আমরা সময়ের মূল্য বুঝি। কারণ প্রত্যেকটি মুহূর্তই জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।



নাম: মুশফিকুর রহমান  
কলেজ নম্বর: ১৮৪৬৪,  
শ্রেণি: অষ্টম, শাখা: গ (প্রভাতি)

## শাসন ব্যবস্থায় প্রধান তিন 'তন্ত্র'

আমাদের এ পৃথিবী মহান সৃষ্টিকর্তার এক অপরূপ দান। বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর বয়স বর্তমানে ৪.৫৪৩ বিলিয়ন বছর। বর্তমানে পৃথিবীতে ১৯৫টি দেশ রয়েছে। সর্ব নব্য গঠিত রাষ্ট্রের নাম দক্ষিণ সুদান। বিভিন্ন জাতিগত মতভেদ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ২০১১ সালে এ দেশ সুদান হতে স্বাধীনতা লাভ করে। পৃথিবীর সর্ব গরিষ্ঠ রাষ্ট্র হলো সান মারিনো। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০১ সালে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সকল রাষ্ট্রেই কোনো নির্দিষ্ট নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। এ প্রবন্ধে আমরা তার মধ্য থেকে সর্বাধিক পরিচিত ৩টি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানব।

**রাজতন্ত্র:** রাষ্ট্রে শাসনের সবচেয়ে সনাতনী পদ্ধতি হলো রাজতন্ত্র। এ ব্যবস্থায় সাধারণত রাজাই রাজ্যের শাসন কার্য পরিচালনা করে। খ্রিষ্টপূর্ব হতেই রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বিরাজমান। পৃথিবীর সর্বপ্রথম আকাদীয় সাম্রাজ্য (২৩৩৪ খ্রিষ্টপূর্ব হতে ২১৯৩ খ্রিষ্টপূর্ব) রাজা মহান সরগন দ্বারা খ্রিষ্টপূর্ব ২৩৩৪ থেকে ২২৮৪ এবং রাজা সু-তুরুল দ্বারা খ্রিষ্টপূর্ব ২২৮৪ থেকে ২১৯৩ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত শাসন করা হয়। আমাদের সকলের পরিচিত মিশরীয় সভ্যতাত্ত্বিক ফারাও (রাজা) দ্বারা শাসন করা হতো। রাজতন্ত্র সাধারণত দুই প্রকার:

১) **নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র:** এ নীতিতে রাজা দ্বারাই দেশের সব কিছু পরিচালিত হয়। রাজা যখন ইচ্ছা তখনই নতুন নিয়ম প্রণয়ন অথবা সনাতন নিয়ম বর্জন করতে পারেন। তিনি চাইলে অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করতে পারেন। যেমন : সৌদি আরব, কাতার ইত্যাদি।

২) **সাংবিধানিক রাজতন্ত্র:** এ নীতিতে রাজা/রাণী চাইলেই সব করতে পারেন না। এক ধরনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকে। সম্রাটকে তার মধ্যে হতেই দেশ পরিচালনা করতে হয়। আবার অনেক সময় সংসদ প্রণয়ন করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী দেশ পরিচালনা করে। যেমন : যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, জাপান ইত্যাদি।

রাজতন্ত্রে বংশানুক্রমে রাজা নির্বাচিত হয়। বেশির ভাগ রাজ্যে শুধু পুরুষদেরকেই রাজা বানানো হয়। অনেক রাজ্যে নারীরাও রাণী হয়।

**সমাজতন্ত্র:** সমাজতন্ত্রকে ইংরেজিতে বলা হয় Socialism। এ ব্যবস্থায় সকল পণ্যের উৎপাদন ও বন্টন সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের প্রথম পর্যায়। সাম্যবাদের ইংরেজি Communism। লাতিন শব্দ Communis থেকে এ শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ 'সাধারণ চিরন্তন'। কার্ল মার্কসকে

সাম্যবাদের জনক বলা হয় (Father of Communism)। কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) এর বিখ্যাত দুই গ্রন্থ দ্যাস ক্যাপিটাল (১৮৬৭) এবং কমিউনিস্ট ইন্সতার (১৮৪৮) তৎকালীন সময়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসকেরা নড়েচড়ে বসে। মূলত রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী, অত্যাচারী রাজা থেকে শ্রমিক এবং খেটে খাওয়া মজদুর, কৃষকদের মুক্তির জন্য সাম্যবাদ ধারার সূচনা হয়। সর্বপ্রথম ১৯২২ সালে পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র

USSR (Union of Soviet Socialist Republic) ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের (১৮৭০-১৯২৪) নেতৃত্বে এক কালজয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে কমরেড চেয়ারম্যান মাও সেতুং (১৮৯৩-১৯৭৬) এর নেতৃত্বে চীনের জাতীয়বাদী দল এর সাথে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর চীন সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এরপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পূর্ব জার্মানি, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, কম্বোডিয়া, যুগোস্লাভিয়া সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সাম্যবাদী রাষ্ট্রের নেতাদের কমরেড বলে আখ্যায়িত করা হয়। ফারসি Comarade শব্দ হতে এর উৎপত্তি যার অর্থ সঙ্গী, সহচর, বিশ্বস্তসাথী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৯১)। USSR এবং USA এর মধ্যকার এ যুদ্ধ USSR এর ১৫টি আলাদা আলাদা দেশে বিভক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। পরবর্তীতে শাসকদের ক্রমাগত স্বৈরাচারী হয়ে ওঠা এবং দেশের অর্থনীতির অবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলো বিলুপ্ত হতে শুরু করে। বর্তমানে পৃথিবীতে ৫টি সাম্যবাদী রাষ্ট্র রয়েছে। সেগুলো হলো:- গণতান্ত্রিক চীন (১৯৪৯), গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া (১৯৪৮), ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (১৯৭৬), লাও গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্র (১৯৫৩), কিউবা প্রজাতন্ত্র (১৯৫৯)।

**গণতন্ত্র:** গণতন্ত্র বলতে এমন একটি শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে কোনো নীতি নিধারণ বা সরকার নির্ধারণে জনগণের ভোটাধিকার থাকে। গণতন্ত্রকে ইংরেজিতে Democracy বলে। এ শব্দটি গ্রিক ভাষা দেমোক্রেতিয়া থেকে এসেছে। যার অর্থ জনগণের শাসন। গণতন্ত্র বিশ্বের সর্ব ব্যবহৃত শাসন ব্যবস্থা। সর্বপ্রথম গ্রিসের এথেন্সে গণতন্ত্রের সূচনা ঘটে। গণতন্ত্রের জনক হলো এরিস্টটল। কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্রের জনক জন লক। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারত। যেহেতু এ ব্যবস্থায় জনগণের ভোটে সরকার নির্বাচন হয়। তাই প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে সরকারকে জনগণের কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। গণতন্ত্রের যেমন সুফল আছে, তেমনি কুফলও আছে। বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো গণতন্ত্রকে একটি মূর্খ ব্যবস্থা বলে সম্বোধন করেছেন। কারণ সংখ্যাগুরু মানুষ যদি শিক্ষিত না হয়। তবে তারা এক অযোগ্য মানুষকে নির্বাচিত করবে। ফলে দেশ ভালো করে পরিচালিত হবে না। সৃষ্টি হবে নৈরাজ্যিকতা এবং দেশ ভেঙ্গে পড়বে।



নাম: ইরাজ ইব্রাহিম

কলেজ নম্বর: ৮৬৯৮

শ্রেণি: নবম, শাখা: ঘ (দিবা)

## তার ঝলক

প্রবন্ধটি মূলত আমারই জীবন ভাষ্য। মাঝে মাঝে মনে হয় প্রতিটি ছেলেরই স্কুল লাইফ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটি আলাদা স্মৃতির বাক্স থাকে, সেটা আমারও ছিল। কিন্তু ছেলেবেলায় কখনো বলা হয়ে ওঠেনি যে, আমার তাকে বরণ করতে ইচ্ছে করে। মনে হতো কখন কী অঘটন ঘটে যেতে পারে। মনোবল পুঁজি করেও কেন জানি তার দিকে তাকাতে পারতাম না। আর তার সাথে কথা বলার সাহসতো দূরের কথা! মলিন সুর, টিপ টিপ করে ঝলকানি দেয়া যেন নিজের মনকে ছুঁয়ে দিত। তাকে না বলে তার অনুভূতি দেখা ছেলেবেলার প্রতিটি ছেলের যেন নিজস্ব মুহূর্ত। আপন প্রশান্তিতে তাকে আগলে রাখতে ইচ্ছে করে। নিজেকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে বরণ করব, কীভাবে একসাথে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করব তা আমাকে ভাবাচ্ছিল। সে যে আমাকে একটি মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে। এই মুহূর্তের মধ্যেই হঠাৎ একদিন পরিবার থেকে শুনলাম তারা একটি ভ্রমণের আয়োজন করেছে এবং জানতে পারলাম মেয়েটির পরিবারও সেখানে থাকবে। আমি তো খুশিতে আত্মহারা। তার উদাস চাহনি উপভোগ করার একটি সুযোগ হয়ে উঠল। মোবাইলে স্ক্রল করতে করতে এইতো সেদিন তাহসানের গল্পটি পড়লাম। শুনলাম তার কিছু বক্তব্য এবং মায়াবী অনুভূতি। দেখলাম তার জীবনেও ছেলেবেলায় কেউ না কেউ ছিল। তারও চোখ কেড়েছিল। পোস্টটি পড়তে পড়তে বুঝলাম, হয়তো সবার জীবনেই কেউ না কেউ আপন হয় এবং এটি যৌবনের একটি ধাপ বটে।

যথারীতি ভ্রমণের দিনগুলি চলে এলো। অপেক্ষার প্রহর শেষে চলে এলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে দেখা হল তাদের পরিবারে সঙ্গেও। আমাদের ভ্রমণটি সাজেকের একটি রিসোর্টে ছিল এবং আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত পেরিয়ে গিয়েছিল। যথারীতি এক সকালে পাহাড়ের কোলে একটি চেয়ারে চা খাওয়ার সময় হঠাৎ পাশের চেয়ারে মেয়েটি বসল। তাকে দেখে আমার হার্ট বিট যেন হাইপ্রেসারে হাবুড়বু খাচ্ছিল। চা খাওয়ার সাথে সাথে এক দু'বার দৃষ্টি আলাপ করলাম। সেও করলো। পরিবারের আলাপচারিতায় শুনেছিলাম সে মাত্র অষ্টম থেকে নবম শ্রেণিতে উঠেছে। জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়ার পর তার পরিবার আমাদের ঘরে মিষ্টিও পাঠিয়েছিল। অতঃপর চা খেতে খেতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার এই সকালের অনুভূতি কেমন

লাগছে? সে ভালোই বলল। নিজের মনোবলকে শক্ত করে আবার জিজ্ঞেস করলাম, সে কোন ক্লাসে পড়ে? সে উত্তর দিল নবম। অতঃপর বিভিন্ন আলাপ করতে লাগলাম। তার কিছুক্ষণ পরেই আমাদের সকালের নাস্তার জন্য রুমে ডাকা হলো। জীবনের ঐ মুহূর্তটি ভালোই উপভোগ করেছিলাম। অতঃপর আমরা দুই পরিবার সাজেকের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান ঘুরলাম। প্রতিটি পরতে পরতে তার মলিন দৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করল। দিনশেষে সকল ঘোরাঘুরির পর সবাই ঢাকার দিকে যাত্রা করলাম। যাত্রার মধ্যে পরিবারের বিভিন্ন আলোচনায় কান পড়লো তার বড় বোনের বিয়ের কথা। সেখানে নাকি আমরাও নিমন্ত্রিত। আমি তো খুশিতে আত্মহারা। তার বড় বোনের বিয়ের দিনে...

আমি এবং আমার বাবা মা যথারীতি সেই বিয়েতে উপস্থিতও হয়েছিলাম। বিয়েতে সবাই নানা খুনসুটিতে ব্যস্ত থাকলেও আমি ছিলাম আমার টানে। তাকে দেখতে পেলেই আমার বিষণ্ণ মন পরিপূর্ণ হয়েছিল। বিয়েতে সবাই খাবার খেতে ব্যস্ত থাকলেও বধূর পরিচর্যার জন্য ছোট বোনটি রীতিমত ব্যস্ত ছিল। বিয়ের সব আয়োজন শেষে দেখলাম কনের আবেগ আপুত বাবা বক্তব্য দেয়ার জন্য সবার সামনে হাজির হল। তার চোখের পানি দেখে আমার নিজেরই খরাপ লেগেছিল। সে বলতে লাগল, 'আজ আমার বড় মেয়ের বিয়ে এবং আমি গর্বিত। কেননা সে এখন একজন মানুষের সাথে আবদ্ধ হয়েছে যে কিনা তাকে ভালোবাসতেও পারবে এবং তার ভরণপোষণও করতে পারবে। একজন বাবা হিসেবে যেমন মেয়েকে আগলে রেখেছি, তেমনি চাই সে যেন আমার পরীকে আগলো রাখুক। ইতি, আপনারা সবাই ভালো থাকুন।' তার বক্তব্যের কথাগুলো শুনে আমার মন কেমন জানি একটি অন্ধকার গর্তে পড়ে গেল। তার কথাগুলো পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলাম জীবনে ভালোবাসাই সবকিছু নয়। ভালোবাসাকে কীভাবে আগলে রেখে ভরণপোষণ করতে হয় সেটিও একটি গুণ। যদি নিজে প্রতিষ্ঠিত না হই ভালোবাসা কিছুদিন পরেই কাঁচের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। অতঃপর চিন্তা করলাম জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে যদি এই ভালোবাসার পেছনে ছুটি তাহলে কখন যে, সেটি কাঁচের মত ভেঙে যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। তাই অশ্রুসিক্ত হয়ে নিজেকে সাবুনা দিলাম। আমি তার জন্য অপেক্ষা করব এবং নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আত্মশুদ্ধি সাধন করব।





নাম: কাজী তাসনিমুল আমিন তূর্নো  
কলেজ নম্বর: ১৪৫১০৯  
শ্রেণি: দশম, শাখা: ও (দিবা)

## মহাবিশ্বে কি আর কোন জীব আছে ?

আমরা সকলে বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশন মুভিতে দেখেছি যে পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহেও প্রাণী থাকে এবং তারা তাদের স্পেসশিপে করে পৃথিবীতে আসে। যাদেরকে আমরা Alien বলে থাকি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে Alien বা ভিনগ্রহি প্রাণী বলতে আদৌ কোন জিনিস আছে না কি সবই আমাদের কল্পনা ?

আমাদের মহাবিশ্বে অসংখ্য ছায়াপথ রয়েছে। তাহলে আমরা এখনও অন্য কোন ছায়াপথে প্রাণ এর এর সন্ধান পাই না কেন?

এই যে মহাবিশ্বে জীবের সন্ধান এর জন্য যে সার্চ হচ্ছে এটাকে বলা হয় SETI (SEARCH FOR EXTRATERRESTRIAL INTELLIGENCE) এখন আমরা জানবো যে SETI রিসার্চররা কী নিয়ে কথা বলে। এগুলো বেশ মজার!

এর জন্য আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহেতে কোন জীব জন্ম নিয়েছে কি না ?

শুধু জন্ম নিলেই হবে না, তাদেরকে বুদ্ধিমান হতে হবে। এবং শুধু বুদ্ধিমান হলে হবে না, এদেরকে টেকনোলজিতে আপডেট হতে হবে আমাদের মত, যেমন : তারা ইন্টারনেট অথবা কম্পিউটার এর মত জিনিস ডেভলপ করেছে কি না। শুধু তাই করলে কি হবে? তাদেরকে আমাদের সাথে কথোপকথন করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এর সম্ভাবনা আসলে কতটুকু ?

এই প্রশ্নের উত্তর বের করার জন্য বিজ্ঞানীরা DRAKE EQUATION নামে একটা একটা equation বের করেছে। যা খুব বিদগ্ধটে, তবে এটা নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আপনি শুধু এই আর্টিকেল টা সামনের দিকে পড়ে যান তাহলেই সব কিছু ভালো করে বুঝতে পারবেন।

এখানে N এর অর্থ আকাশগঙ্গা ছায়াপথে আর কতজন টেকনোলজিতে সভ্য থাকতে পারে।

এর পরে আরো নম্বর আছে যেমন R \* বোঝায় আকাশগঙ্গা ছায়াপথের মধ্যে কতগুলো সূর্যের মতো গ্রহ জন্ম গ্রহণ করে এবং কতোগুলোতে আসলে গ্রহ নক্ষত্র থাকে (সবগুলো সূর্যের মধ্যে গ্রহ থাকে না)। তারপরে সেই গ্রহে জীব জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা আসলে কতটুকু ? এবং সেই জীব কি বুদ্ধিমান ? তারা কি আমাদের সাথে কথোপকথন করার উপযোগী ? এত গুলো ধাপ পার করার পর সবার শেষে আসবে সেটা হল L (longevity factor)। তার মানে হল, গ্রহেতে জীব থাকল এবং সে জীব বুদ্ধিমান হল কিন্তু সে যদি অনেক আগে মারা যায় বা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে ?

অতএব, এই প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও অজানা। এবং এটা বের করা যে কতটা মুশকিল সেটা আমরা এই লেখা থেকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আমাদের নাতি-নাতনিদের নাতি-নাতনিরা এর সন্ধান পেলেও পেতে পারে।

# THE DRAKE EQUATION

What is the Drake equation?

It's an equation developed by Frank Drake, that have the propose of estimate the potential number of intelligent alien civilizations in the our galaxy.

$$N = R^* \times f_p \times n_e \times f_l \times f_i \times f_c \times L$$

How it does work?

$$R^* \times f_p \times n_e \times f_l \times f_i \times f_c \times L = N$$

the average rate of star formation every year in our galaxy



the fraction of those stars that have planets



the average number of planets that can support life in our that has planets



the fraction of planets that actually develop life



the fraction of planets with life that actually begin to develop intelligent life



the fraction of intelligent life that release detectable signs of their existence in space



the expected lifetime of such a civilization for the period that it can communicate across the space



the number of civilizations in our galaxy with which communication might be possible





নাম: মুহা : লাবীবুল হক  
কলেজ নম্বর : ১৮৫৩৬  
শ্রেণি: দশম, শাখা : চ (প্রভাতি)

## পরিশ্রম ও মহানুভবতার মিশেলে এক জীবনী

ইউরোপের কোনো দেশে অনেকে হয়তো টিনের ঘরের কথা কল্পনাই করতে পারেন না, সেখানে এক টিনের ছাদওয়ালা ঘরে জন্ম নেয় এক মহাতারকা। বলছি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কথা। ছোটবেলা থেকে দরিদ্রতা যার নিত্যসঙ্গী, সেখানে পরিশ্রম ও সাধনায় বদলেছেন নিজের জীবনকে।

১৯৮৫ সালে এক মালি ও রাধুনির ঘরে জন্ম নেন রোনালদো। ছোটবেলা থেকেই ফুটবল যার ধ্যান-জ্ঞান। ৬ বছরে স্কুল টিম, ১০ বছর বয়সে Nacioval ক্লাবে খেলেন। ১৯৯৭-এ পর্তুগালের বড় ক্লাব স্পোর্টিং লিসবনে খেলার সুযোগ হয়। তবে হঠাৎ মাত্র ১৫ বছর বয়সে আক্রান্ত হন হৃদরোগে। তাকে বলা হয় জটিল অস্ত্রোপচার করাতে নয়তোবা সারাজীবনের জন্য ফুটবল ছেড়ে দিতে। তিনি প্রথমটাকেই বেছে নিয়ে অস্ত্রোপচার করে আবার ফুটবলে ফিরে আসেন। তবে এরই মধ্যে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। এ ধাক্কা সহ্য করতে পারেননি তিনি। তাদের পারিবারিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে চার সন্তানের পেট চালাতে থাকেন। রোনালদো তাও ফুটবল ছেড়ে দেননি। নিজেও অনেক ছোট খাটো কাজ কর্ম করে নিজের ফুটবল চালিয়ে যান। একদম দমে যাননি। এরই সফলতা আসে ১৭ বছর বয়সে। স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলতে নেমে তার অভাবনীয় স্কিলে মুগ্ধ করেন ইউনাইটেড কোচকে। ব্যাস, এরপর ইউনাইটেড দল ১৭ মিলিয়ন মূল্যে দলে ভিড়িয়ে নেয় তাকে। একে একে ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে সফলতা আসতে থাকে তার। যা আমাদের সবার জানা। তাই আর উল্লেখ না করলাম।

এখন আমরা তাঁর মতো সফল ব্যক্তিদের বিলাসবহুল জীবন সম্পর্কে জানি, তবে এর পিছনের কঠিন পরিশ্রমগুলো সম্পর্কে জানি না। একটা কথা মাথায় রাখা দরকার কোনো মানুষই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে মহান হয়ে যায় না।

কাউকে মহান হতে হলে ভালো কর্ম করে, তার প্রতি শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হয়। জীবনে নানা বাধা বিপত্তি আসবেই। তবে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। সেগুলোর সম্মুখীন হতে হবে। যেমনটা রোনালদো হয়েছেন। তিনি যদি তার পরিবারের অর্থসংকট, জটিল অস্ত্রোপচার কিংবা বাবার মৃত্যুর কারণে ফুটবল ছেড়ে দিতেন, তবে এতোদিন কেউ তাকে চিনতো না। তাঁর জীবনটাতে এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছে যে, হাজারো প্রতিকূলতার পরও তিনি তার প্রধান কাজের সাথে কোনো Compromise বা আপোষ করেননি। নিজের প্রধান কাজকে সব সময় অবিচল রেখেছেন। তেমনি প্রধান কাজের প্রতি অবিচল থাকলে কিংবা পরিশ্রম করতে থাকলে যে কারও সফলতা আসবেই। তার একটি কথা হলো : “কঠোর পরিশ্রম ছাড়া প্রতিভা কিছুই না।”

এভাবে একসময় তিনি বনে যান পৃথিবীর সব থেকে ধনী ফুটবলার হিসেবে। কিন্তু জীবনে শুধু সফল হয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি তিনি। সমাজের প্রতি তার যেসব কর্তব্য তা করে গেছেন উদারভাবে। তাঁর নামে অসংখ্য এতিমখানা রয়েছে। ২০১২ তে নিজের অর্জিত গোল্ডেন বুট নিলামে বিক্রি করে তার অর্থ ফিলিস্তিনের শিশুদের দান করেছেন। সিরিয়ায় শিশুদের জন্য ৫০০০ ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন। ২০১৪-এ ইন্দোনেশিয়ার সুনামি ও নেপালের ভূমিকম্পে অনুদান পাঠিয়েছেন। তার নামে অসংখ্য ক্যান্সার নিরাময় কেন্দ্র আছে, যেখানে তিনি অসংখ্য ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় বহন করেন। এমনকি নিজে বছরে দুইবার করে রক্তদান করেন। এর জন্য শরীরে কোনো ট্যাটু করান নি এবং কখনো মদ স্পর্শ করেন নি।

এভাবে তিনি সফলতার ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। যা আমাদের অনুপ্রাণিত করে পরিশ্রম ও সৎকর্ম করতে।



নাম: মাহির আকবর  
কলেজ নম্বর: ১৫২০২০৭  
শ্রেণি: দশম, শাখা: চ (দিবা)

## বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাঁধা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে এ যাবৎ বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। গৃহীত হয়েছে নানা মডেল, কর্মসূচি ও পাঁচসালী পরিকল্পনা। কিন্তু দেশের অর্থনীতির সুফলবঞ্চিত এ দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনেক মৌলিক সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যার দ্রুত সমাধান না করতে পারলে কাজক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। Professor Snider-এর মতে, “মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষমতার দীর্ঘমেয়াদী বা অব্যাহত বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হয়।” অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল নির্ধারকসমূহ হচ্ছে-প্রাকৃতিক সম্পদ, পুঁজির সরবরাহ, সংগঠন ও সংগঠক, প্রকৌশলগত ও কারিগরি উন্নতি ইত্যাদি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ :

\* দারিদ্র্য : দারিদ্র্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক বিরাট অন্তরায়। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫.১% দারিদ্র সীমার নিচে বাস করছে। ১৯৯০-৯১ সালের ৪৯.৭% শতাংশ দারিদ্র্য কমে ২০০৯-১০ সালে ৪০ শতাংশ দাঁড়ালেও দারিদ্র জনসংখ্যা এখনও অত্যধিক। এ বিপুল জনসংখ্যার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য বিপুল পরিমাণের অর্থের প্রয়োজন, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিরাট বাধা।

\* আমদানি নির্ভরতা : বহিবাণিজ্য দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয়। বাংলাদেশ যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদেশ থেকে আমদানি করে।

\* বৈদেশিক সাহায্য : বৈদেশিক সাহায্য তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুন্নয়নের অন্যতম কারণ। বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ, আই ডি বি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সাহায্য প্রদানের সাথে সাথে তাদের ও স্বার্থ উদ্ধারকারী ‘Structural Formula’ এর শর্ত চাপিয়ে দেয়। ঋণ গ্রহীতা দেশের জন্য যতই প্রতিকূল হোক না কেন। ফলে আমাদের নিজেদের উন্নয়ন উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ব্যাহত হচ্ছে।

\* প্রাকৃতিক দুর্যোগ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এক কালো অমানিশার মতো। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা এবং বর্তমানে আর্সেনিক দূষণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ‘মরার ওপর খাড়ার ঘাঁ’ এর মতো। ১৯৯১ সালের জলোচ্ছ্বাস,

২০০৭ সালের সিডর এবং পরবর্তীতে আইলা হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি করেছে। এর ফলে দেশের অর্থনীতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা সামাল দিতে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ভেঙে যাচ্ছে।

\* ঋণখেলাপীদের দৌরাত্ম : ঋণ খেলাপীদের দৌরাত্ম বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গাঁদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো চেপে রসেছে। এসব ঋণ গ্রহীতা নানা প্রভাব প্রতিপত্তি খাঁটিয়ে শিল্প স্থাপনের নামে ব্যাংক থেকে শতশত কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় এবং নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করে অন্যান্য অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করছে। এই বিপুল পরিমাণ ঋণের টাকা নিয়মিত পরিশোধ হলে পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি লাভবান হতে পারতো।

\* সরকারি নীতি বাস্তবায়নের ধীরগতি : সরকারের গৃহীত নীতি বাস্তবায়নে ধীরগতি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত করে। সরকারি নীতি বাস্তবায়নের এ ধীর গতির ফলে অনেক সময় অনেক সুন্দর ও কার্যকর পরিকল্পনাও ভেঙে যায়। এতে আর্থিক ক্ষতিও হয়।

\* বেকারত্ব সমস্যা : দেশে প্রায় দুই কোটি লোক বেকার রয়েছে। ফলে এরা দেশের অর্থনীতিতে কোনো অবদান রাখতে পারছে না। ফলে দেশের অর্থনীতির উপর চাপ পড়ছে।

\* দুর্নীতি : দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিবিদ জন উইলিয়ামসনের মতে, “বাংলাদেশ দুর্নীতি এক ধাপ কমাতে পারলে বিনিয়োগ বাড়বে জিডিপির ৪ শতাংশ এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধিও হার বাড়বে ০.৫ শতাংশ।” বর্তমান সরকার দুর্নীতি কমানোর জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছে যা আমাদের দেশের দুর্নীতির হার কমাতে সাহায্য করবে।

\* শিল্পের অনগ্রসরতা : শিল্পের বিস্তার দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রপ্তানি বৃদ্ধি করে থাকে। তাই শিল্পের অনগ্রসরতা অর্থনীতিকে অগ্রসর হতে দেয় না।

\* দুর্বল অবকাঠামো : বাংলাদেশে পরিবহনের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট সংযোগ, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের উন্নয়ন, কন্টেইনার টারমিনাল নির্মাণ ইত্যাদি আবশ্যিক। এগুলোর ব্যবস্থা না করলে দেশি-বিদেশি কোনো বিনিয়োগকারী পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী হবে না। তাইতো বিশ্বব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফর শেষে অবকাঠামোগত দুর্বলতাকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় বলে মন্তব্য করেছেন।

\* জনসংখ্যা বৃদ্ধি : বাংলাদেশের মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার জায়গায় প্রায় ১৬ কোটি মানুষ বাস করে। অর্থাৎ এ দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। এ বিপুল জনসংখ্যা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, যানবাহন, চিকিৎসাসহ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হবে।

উপরে উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও আরো বেশ কিছু কারণ রয়েছে যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হতে পারে।

এ সকল প্রতিবন্ধকতা শিক্ষার প্রসার, শিল্পের প্রসার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, কৃষির উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, ঋণখেলাপি সংস্কৃতির অবসান, স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন নিশ্চিতকরণ, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত অবস্থান, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি ও



নাম: অভিষেক বিশ্বাস

কলেজ নম্বর: ১৯২৪১

শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ঙ (প্রভাতি)

## “অনুর দাদুভাই”

মুখোমুখি বাড়ি। মাঝে শুধু একটি ছোট খালের ব্যবধান। তবুও জীবনের নানাবিধ সমস্যার দরুন দেখা করা হয়ে ওঠে না। স্নেহ ভালোবাসার সাধারণের তুলনাই একটু বেশিই ছিল। কিন্তু ভাগ্য এবং করোনা ভাইরাসের কারণে ছিল না দেখা করার সুযোগ। তবুও অনু এবং অনুর দাদুভাইয়ের যোগাযোগ ছিল মোবাইলের মাধ্যমে। বয়সের এবং নানাবিধ রোগে জর্জরিত অনুর দাদু কথা না বলতে পারলেও মোবাইলে অনুর কণ্ঠ শুনে অনেকটাই প্রশান্তি অনুভব করেন। তাঁর বাঁচার আকাঙ্ক্ষা আরো একটু বেড়ে যায়। বিছানা থেকে উঠতে না পারা ব্যক্তিটি ভাবে তাঁর নাতনি চাকরি পেলে তাঁকে নিয়ে যাবে। তখন আর কারো নির্ভরশীলতায় থাকতে হবে না তাঁকে। সবকিছু থেকেও নিঃস্ব ব্যক্তিটির একাকিত্বের অবসান হবে এই ভাবনায় দিন কাটে অনুর দাদুর।

একসময়ে লকডাউন শিখিল হয়। মানুষ এখন ঘর থেকে বের হতে পারে। অনুর মা, অনু ও সৈকত দাদুকে দেখতে অসীম দৈর্ঘ্যের ছোট খালটা পার হতে সক্ষম হয়। অনু দাদুর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জানতে চায় সে কে? কয়েক মাস শয্যাশায়ী, অন্য সকলকে চেনা ও কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা মানুষটি সকলকে অবাধ করে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, “আমার অনু”। গ্লুকোমায় আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারানো মানুষটি কোন দৈববলে অনুকে চিনতে পারলো এটাই বিস্ময়! অনুর মা দাদিকে খাইয়ে দিলেন। খাওয়া শেষ হওয়ার খানিক পরে দাদুর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। অনু, অনুর মা, দিদা সবাই মিলে হাত পা মালিশ করতে থাকে। দিদা সৈকতকে বলে মামাকে ফোন করতে। ঠান্ডা হয়ে যাওয়া হাত-পায়ের তালুতে অনবরত গরম আঁচ দিচ্ছে সবাই। প্রাণ বুঝি এই যায়। “দিদির জন্মদিনে তুমি ওকে আশীর্বাদ করেছো। সামনে আমার জন্মদিন। তুমি আমাকে আশীর্বাদ না করে চলে যাবে দাদু?” প্রশ্নটি করেই কেঁদে ফেলে সৈকত। অনুর মামা, মামি ও ছোট মামাতো ভাইটি আসে। কী হচ্ছে বুঝতে না পারা মামাতো ভাইটি বলে, “কি হয়েছে তোমার দাদু?” অপেক্ষমান তীর্থের কাকটির মনের আশা মহান সৃষ্টিকর্তা আর

কাঁচামাল আমদানি, উদ্ধৃত পণ্যের রপ্তানি, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস, প্রযুক্তি বিদ্যার আমদানি, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানি, বাজারের বিস্তৃতি, মূলধন বৃদ্ধি, এক চেটিয়াত্ব প্রতিরোধ, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা, খাদ্য ঘাটতি পূরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্যবহার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে মোকাবিলা করা যাবে। উন্নত দেশ গড়ার যে লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার এগিয়ে যাচ্ছে তা অর্জনে নাগরিকদের সর্বদা সহযোগিতা করতে হবে।

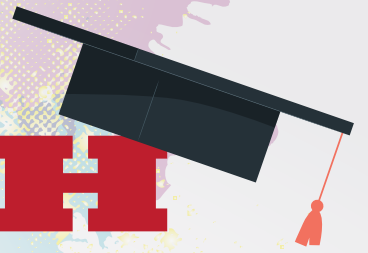
বোধহয় পূরণ করতে দিলেন না। সামনে উপস্থিত জগতের আলো দেখে, অনুর দাদুর মুখের দুপাশে দুফোঁটা আক্ষেপ ঝরে পড়ে। আক্ষেপটা কিসের? জীবনে সন্তানদের জন্য কিছুরেখে যেতে পারেন নি এই আক্ষেপ? নাকি, সুন্দর একটি জীবন এই আক্ষেপ? পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি না পাওয়ার আক্ষেপ? হয়তোবা এই আক্ষেপ, তাঁর অনুর কাছে না যেতে পারার আক্ষেপ?

অন্তিম সময় উপস্থিত। শয্যার পাশে পরিবার পরিজন সকলেই আছে। দাদুর কানে কানে সৃষ্টিকর্তার নাম দেওয়া হয়। আছে ছেলে, মেয়ে, বৌমা ও নাতি ছেলে, কিন্তু কারো দিকেই তাকালো না দাদু। দাদু তাকালেন তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অনুর দিকে। হয়তো মনে মনে বললেন, “আমার আর তোর কাছে যাওয়া হলো না, দাদুভাই। আশীর্বাদ করি তুই অনেক বড় হবি। আমার অনু।” ওই তাকানোর পর দাদু যে চোখ বন্ধ করলেন আর খুললেন না। আর বললেন না যে, “আমার অনু.....।”

একজন বৃদ্ধ এবং একটি শিশুর মাঝে তফাৎ শুধু নশ্বর দেহের আকৃতির। শিশুর যেমন দেখাশোনার প্রয়োজন একজন বৃদ্ধেরও ঠিক তেমনই দেখাশোনার প্রয়োজন হয়। কেননা শিশুটির মতো বৃদ্ধ ব্যক্তিটিও অবুঝ অসহায়। কিন্তু আমরা এই সত্য উপলব্ধি করতে সর্বদাই অস্বীকার করে চলেছি। শিশুরা সর্বদাই মা বাবার ওপর নির্ভরশীল। এই মা-বাবাই বৃদ্ধ বয়সে তাদের সন্তানদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে। কিন্তু তারা কি আসলেই এই নির্ভরশীলতা কামনা করে? “না”, বৃদ্ধ মা-বাবার একমাত্র আশা তাদের সন্তান যেন সুখে থাকে এবং তাদের সামনে থাকে। কিন্তু অসহায় মানুষগুলোর চাওয়াকেই আমাদের সমাজে অনেকে মনে করি বৃহৎ বোঝা, অসহ্য কিংবা দেখলেই গা-পিপ্তি জ্বলে যায় অথবা মরে গেলে বেঁচে যাই, হাফ ছেড়ে বাঁচি। মাঝখান থেকে অনু অথবা সৈকতের জীবন শুরুর যাত্রা না দেখতে পারার আক্ষেপ বুকে নিয়েই দূর দিগন্তে পাড়ি জমায় অমন হাজারো “অনুর দাদুভাই।”

# ENGLISH

## WRITE UP





**Name: Amlan Kumar Nag**

College No: 12709

Class: IV, Section: C (Morning)

## Pen

A kind of pencil that has ink is a pen;  
We write with it and never blink.

If you do not use it,  
You cannot be successful, you must admit.

Remember that a student's life must  
not be jeopardised,  
Student life is a time in your life  
When you can sow the seeds of success and strive.

So, use the pen, write with it,  
And be intelligent, don't forget.

The world will know you  
For your intelligence, that's true.



**Name: Md. Siam Ahsan**

College No: 19387

Class: V, Section: E (Day)

## There Lived a King

There lived a king, without a wife,  
Who watched the river's rolling tide;  
By night his drunken reverie  
Would sweep him away on its ride.

His palace was a lonely road,  
His home, the trees along the way;  
His rage burned like a funeral pyre  
When his house was taken away.

He had no abode to inhabit,  
The king was left quite alone;  
The river's waves became his bed,  
As he sadly made his own.



**Name:** Mohammad Mahbir Alam Sunvi  
College No: 17048  
Class: VI, Section: E (Morning)

## Traffic Jam

One day I found myself stuck in a traffic jam;  
My only option was to stay calm.

Vehicles were honking incessantly;  
Drivers were growing more uneasy.

Some were silent, some were cool;  
A few were shouting like a fool;  
Others were trying to understand  
As if this were a foreign land.



**Name:** Md. Tahseen Kabir  
College no: 16940  
Class: VII Section: E (Morning)

## Life

The breeze is blowing as we watch the setting sun,  
The feel of a dusky road is so full of fun.  
Roaming alone without a goal to seek,  
I only feel the carefree life I lead.

Friends came along, a team was formed;  
Surprisingly, through life we stormed.  
It only took one brave step to win;  
We were afraid but we didn't want to give in.

Small steps we take today will bring about change.  
The roads and the riders we left behind would seem strange.  
Your life is nothing but a wild ride.  
Take a deep breath  
And live your life while preparing to face death.



**Name:** Mahir Afsar Mahir  
College No: 16267  
Class: VI, Section: E (Morning)

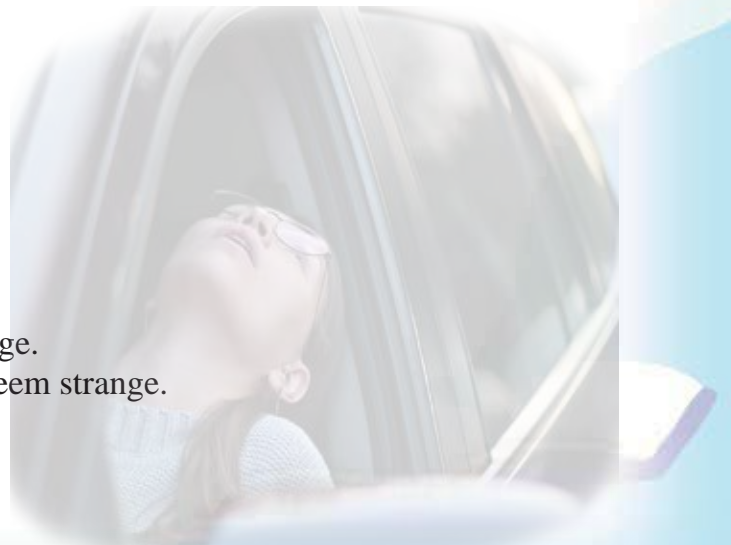
## DRMC is Our Family

Ours is a college full of knowledge and grace,  
Aiming to reach the heights of success.  
A beacon of hope lighting up our space.

DRMC is a home of discipline and faith,  
Teaching us to value time and strive.  
An inspiration to reach our goals and shine in life.

Our college is like a family, ever so dear,  
Where teachers take us on a quest for knowledge  
and cheer.

Forever friends, the bond between us is so clear.  
We are the Forever Remians,  
Our college is a part of us, and ours a part of it.  
Proud of our DRMC and its place in our brains.





**Name: Musanna Sawky**  
College No: 12935  
Class: IV, Section: C (Day)

## The DRMC Ghost

It was the night of 24 January 2021, and a gloomy darkness had fallen over the world. Rafique, a tutor, was on his way home when he realised there would be no rickshaws; so he decided it would be safer to take a shortcut through his old school. As soon as he entered the school compound, it started raining; so he quickly took shelter under the banyan tree.

Suddenly he heard a voice from the shadows: "Someone is here!" Fear gripped him and he asked, "Who is it?"

In the style of Casper, the Friendly Ghost, a blue, transparent figure appeared before him. Rafique found it amusing and asked, "Who are you?"

The figure replied, "My name is Saifun Ahmed. I was admitted to the DRMC in 2009, but tragically I slipped and fell in front of a car. My only goal was to attend DRMC, so I have been here ever since. I attend classes, play a variety of games, and even make friends with the other Remians. But lately, no one has come to DRMC."

Rafique replied, "Oh, the coronavirus is to blame for that."

Safiun sighed, "I'm feeling pretty lonely right now."

Rafique smiled and said, "Well, I'm going to make friends with you."

"Really?" Safiun exclaimed in delight.

From then on, Rafique visited Safiun every evening and their friendship grew stronger with each passing day.



**Name: Md. Ahnaf Kabir Ayaan**  
College No: D12703  
Class: IV, Section: C (Day)

## Proud to Be a Freedom Fighter's Grandson

My maternal grandfather lives across the street from me, and he and my grandmother live in his house. When I was younger, my mother told me that my grandfather was a freedom fighter. I asked him if it was true and he confirmed it.

In January 2022, I went to my grandfather's house and he showed me a book full of stories about the freedom fighters of Khulna. One of the stories was about him. My grandfather and a group of people including Nazrul Master, Humayun Kabir, A. Khalek, A. Barek, Sunil Biswas and Majid Engineer crossed the border and reached the Dholotita camp in Bashirhat for guerrilla training. They then travelled to the Kharagpur railway station in Calcutta and took an Indian Army truck to Dum Dum airport, where they joined the Dehradun Military Academy in Uttar Pradesh for one month and 15 days of training.

After their training, they returned to Bangladesh with guns and bullets and fought a series of bloody battles in Shyamnagar. When Bangladesh gained its independence, the guns and bullets were handed over at the Dhaka Stadium.

I am very proud of my grandfather and the courage and determination he showed in the War of Liberation.





**Name: Raiyan Al Hossain**

College No: 11952

Class: V, Section: E (Day)

## The Journey to Tangua Haor

The journey to Tangua Haor began at Mohakhali Bus Counter 2, where we boarded an Ena Transport (Pvt.) Limited bus at 10.30pm. We arrived at Sunamganj Railway Station at around 7pm and then took an autorickshaw to Saheb Bari Ghat, which took about ten minutes. Once there, we boarded a boat called Palki and enjoyed a delicious breakfast of khichuri and boiled eggs. We reached the Tangua Haor section around 11.30am and then went to the watchtower that jutted out of the water. We bathed in the fresh water near the watchtower and then returned to the boat, but unfortunately I lost my watch. For lunch we had a variety of fillings (bharta), salad, fish, duck and rice. Around 5pm our boat arrived at Keter Ghat and we spent the night there. We spent the day exploring Shahid Shiraj Lake, Chinapathorer Khoni and Borochara Bazar on foot. For dinner we had a variety of vegetables, chicken, salad, fish and rice.

On the second day, at 9am, we started our journey again. We came to a river called the Jadukata Nadi and had mixed rice and chicken with salad for breakfast. Around 11am we reached Barikka Tila on the bank of the Jadukata Nadi. We climbed Barikka Tila all the way to the top, drank some lemonade and coconut juice and enjoyed the beautiful view of the Meghalayan mountains. Then we went back to the boat and headed for an ideal swimming spot. We took our life jackets and jumped into the water and had a wonderful time. After

returning to the boat, we had five kinds of bharta, chicken and fried fish for lunch. Our boat then started moving again and at about 6pm we reached Saheb Bari Ghat. We stopped for a while and had dinner at a restaurant called Pangshi. At 8pm we started our journey back to Dhaka. The trip was a wonderful experience that I will never forget.



**Name: Md. Ayan Rahman**

College No: 17862

Class: V, Section: E (Morning)

## A Visit to Cox's Bazar

After my final exams, my parents and I travelled to Cox's Bazar on the evening of 8 December 2022. We travelled by sleeper bus and arrived at around 8 a.m. We stayed at the Sea Crown Hotel and had breakfast at around 9 a.m. before heading to the beach at 10 a.m. We had a lot of fun at the beach and my aunt and I even went on a water bike ride. In the afternoon we watched the sunset from the beach before returning to the hotel.

The next day we took a jeep to Teknaf and then went to Inani Beach where we saw some big rocks. We then climbed the 300 steps of Himchori Hill to watch the sunset from the top.

On the last day we went back to the beach and had an exciting time with the bigger waves. We then visited the Burmese market and bought some souvenirs before I went to Radiant Fish World to see some unfamiliar fish.

My visit to Cox's Bazar was truly an unforgettable experience and I will cherish the memories I made there.



**Name: Sheikh Zafir Ahmed**

College No: 11255

Class: VI Section: E (Day)



## The Legend of Blackbeard

You may have heard of the Caribbean. The sea was once ruled by pirates. They brought terror to the entire sea. It was a bad time to be a ship captain and it was hard to reach your destination safely. Pirates would attack any small town along the coast. Some pirates were not very fierce, while others were rough. They would capture ships and kill all the crew.

One of these cruel pirates was Blackbeard. A tall, fearsome man with a long black beard and a slow fire in his hat, Blackbeard was the most famous pirate of all in the Caribbean. He captured over 30 ships in less than two years (his entire career as a pirate). He was the pirate that England would never forget. There are many legends and stories about him.

When Queen Anne's War ended in 1713, many sailors were out of work. One of them was Edward Teach. This 34-year-old Bristolian is only happy when he is at sea. He settled on the Bahamian island of New Providence. Captain Benjamin Hornigold, captain of the pirate ship Mary Anne, called it home. Hornigold was one of the nicer

pirates of the Caribbean. Teach joined Hornigold's crew around 1716. Hornigold gave him command of one of his captured ships. The two engaged in numerous acts of piracy and increased the size of their fleet. However, towards the end of 1717, Hornigold retired from piracy and returned home to his wife, giving his ship to Teach.

On 28 November 1717, a lookout named Mary Anne shouted that a large French slave ship called La Concorde was in the area. Teach ordered his crews to prepare their guns and be ready to board. The three pirate ships attacked the French ship. One of La Concorde's masts came down loudly, killing some of the French crew. Teach's men boarded the French ship, fought the crew and defeated them. Teach captured the ship. He renamed the ship the Queen Anne's Revenge, fitted it with 40 guns and manned it with over 300 men. This was the ship he used to terrorise the Caribbean and as his flagship.

Teach and his crew would terrorise all ships in the Caribbean for the next six months. After these incidents, he became a

renowned pirate and soon every captain and sailor knew of Teach. His nickname 'Blackbeard' came from his thick black beard and fearsome appearance. It is said that he tied lighted fuses under his hat to frighten his enemies. Before a battle, he would dress all in black, with several pistols strapped to his chest. All in all, he looked like a devil in battle.

In May 1718, Blackbeard sailed near the town of Charleston, South Carolina. He formed an alliance of pirates and blockaded the port of Charleston, holding its inhabitants for ransom. He then sailed for North Carolina. He ran the Queen Anne's Revenge aground on a sandbar near Beaufort, North Carolina. He then sailed his smaller ship to Bath, North Carolina. There he parted company with another pirate, Stede Bonnet, and settled in Bath Town. He gave some gold and sugar to Charles Eden, the governor of North Carolina. Eden is a friend of Blackbeard's. He gives Blackbeard a royal pardon from King George.

But Blackbeard is soon back at sea, continuing his pirate adventures. Alexander Spotswood, the governor of Virginia, had his eye on Blackbeard from the start. This time, after the blockade of Charleston and his return to sea, even after being pardoned, he attracted Spotswood's special attention. He heard more news of Blackbeard's whereabouts from the captains of other ships. Blackbeard was at Ocracoke Inlet, near North Carolina.

Alexander Spotswood became agitated when he learned of Blackbeard's whereabouts. He called a meeting of soldiers and sailors to discuss and plan the capture of Blackbeard. At this meeting it was decided that Lieutenant Robert Maynard of the British Royal Navy would board his ship, the Jane, with 35 men on board. And the Ranger will go with him,

with 25 men under its captain, Mr Hyde.

On 21 December 1718, the ships Jane and Ranger sailed into Ocracoke Inlet and dropped anchor. Blackbeard looked over at the naval vessels. At the time, some of his men were in the town of Bath. There were only 18 men on his ship, the Adventure.

Finally, the day came. The Jane and the Ranger arrived in the bay on 22 November 1718. Blackbeard ordered his men to fire their cannons. The Adventure's cannon hit the Ranger, killing some of its sailors. Captain Hyde was among them. Lieutenant Maynard brought Jane alongside the Adventure and fired at her. Blackbeard and his men boarded the Jane and the battle began. After a few moments, Blackbeard met Maynard. As they fought, Maynard's sword suddenly broke. But Maynard quickly fired his pistol at the pirate captain. He hit Blackbeard. He fired his pistol again and again. In the end, Blackbeard fell to the deck.

Blackbeard died with five gunshot wounds and twenty sword wounds in his body. Maynard wanted the head of the most famous pirate in the Caribbean. He sailed back to Virginia with Blackbeard's head on the bowsprit of his ship. With Blackbeard's death, the best days of Caribbean piracy were over.

Blackbeard's pirate career was one of the shortest, lasting only two years. But his violence and cruelty were enough to make him the most feared and famous pirate in the Caribbean. No other pirate left a legacy like Blackbeard's. He spent two short years terrorising America and the West Indies, building a reputation as the fiercest and most fearsome pirate on the seven seas. And one of the most surprising things of all was that no one ever found his treasure. Was this Edward Teach's revenge?



**Name: Arittra Karmokar**

CollegeNo: 17843

Class: VI Section: E (Day)

## Robbery Bob (Man of Steal)

It was 2006 in the United States, a peaceful country until Robbery Bob, the most cunning thief in the United States, appeared. In New York, there was a 12-year-old boy called Bob. His father, Mr Denslay, was a businessman and his mother had died when he was born. His father was always busy and Bob lived a peaceful life, being a good student and always getting good marks.

One night, Mr Denslay, his father, was coming home from work and tragically died in a car accident. At that time Bob was in class VI. His uncle took all of Mr Denslay's property, leaving Bob homeless and without food. Desperate, Bob thought he would steal some food to satisfy his hunger and went to a grocery store, stealing a loaf of bread and a carton of milk. After eating, he realized that if he could steal food, he could also steal money.

So, he began to target houses, banks, shops, and factories and was able to steal a lot of money without getting caught. Until one day, when Inspector Clive caught him in the act of stealing from a house. He was taken to court, where he was sentenced to 14 years in prison. Bob was taken to Central Prison and spent two months there before making a plan to escape. However, he needed something in order to do this.

Every day the jailer gave him a spoon and fork with food. He thought he could dig with the spoon and fork, so one night he started digging. He dug and dug all night, and eventually he managed to break through the wall and come out of the building. But there was a policeman outside the building, so they quickly put Bob back in his cell. The

floor was now metal, so he could no longer dig. So, Bob made another plan. This time he went to the bathroom, lifted up the toilet, stood in the hole, and put the toilet back in place. He then crawled through the hole and walked through the drain for about a kilometer and a half. Eventually, he came to a cap on the drain, and when he removed it, he saw a police station in front of him and a policeman standing next to him. They took him back to prison. Six months had passed and Bob could not escape.

But one day, a stranger came through the window and gave Bob a metal cutter, which he used to cut the window bars and escape. He saw the stranger standing in front of him, and the stranger told Bob that if he stole for him, he would share what he stole with Bob.

Bob accepted the stranger's offer, and the stranger took him back to his house. The stranger offered to teach Bob how to steal, and Bob agreed. When Bob asked the stranger his name, the stranger introduced himself as Jack. From that day on, Bob and Jack continued to steal and became wealthy, but they weren't happy because they couldn't steal happiness.

One night Bob had a change of heart and realised that stealing was not the right thing to do. He tried to persuade Jack to stop, but Jack refused. Bob decided to leave and start a new life as an honest man, making a good living. This made Jack jealous, so he called the police and gave them Bob's address. But when the police arrived, they couldn't find Bob and instead caught Jack, whom they had mistaken for Bob. Bob went on with his normal life, while Jack ended up in prison.



**Name: Ariq Ishraq**

College No: 10393

Class: VII Section: E (Day)

## Mother Teresa

Mother Teresa was a great personality who spent her whole life serving the poor and is known all over the world for her great service. She will always be remembered in our hearts because she was the only one who was like a real mother. She is a great legend and a very recognisable symbol of compassion and care for our times. She was known to wear a simple white sari with a blue border. She always saw herself as a devoted servant of God, sent to earth to serve the poor, disabled and suffering people of the slums. Her kind smile was always on her face.

Mother Teresa's real name was Agnes Gonxha Bojaxhiu and she was born on 26 August 1910 in Skopje, Macedonia. Her parents, Nikolle and Dranfile Bojaxhiu, had three children and Mother Teresa was the youngest. Her father died in 1919 when she was just eight years old. She was given the name Mother Teresa after she became a nun in the Church of St Teresa. She was born into a Christian family and had a great interest in religious activities. She also joined many religious groups that spread religious beliefs by travelling to different countries.

Mother Teresa had a great interest in preaching from an early age and at the age of 12 she decided to become a religious missionary. At the age of 18 she left her hometown and joined the Loreto Sisters, Irish nuns in Rathfarnham, Ireland. She was educated in Dublin and Darjeeling and took

her first vows in 1928. In 1931 she took her vows as a nun and founded the Missionaries of Charity. This was a Roman Catholic religious organisation whose primary purpose was to serve humanity and help the hungry, homeless and disadvantaged.

Mother Teresa was truly dedicated to uplifting society and helping people. She received many awards and honours for this. Mother Teresa was also awarded the Nobel Peace Prize in 1979. She was also awarded the Bharat Ratna in 1980. She died on 5 September 1997 in Kolkata, West Bengal. People all over the world admire her inner beauty and charm and she is still alive in their hearts.





**Name: Mohammad Sadin Ahsan**

College No: 16959

Class: VII, Section: C (Morning)

## My First Day at the Cricket Stadium

Bangladesh have been playing Test cricket for over 20 years, but I had never been to an international cricket match. I always wanted to watch a cricket match in an international stadium and feel the thrill. That opportunity came on 3 March 2023. The day before, my father informed us that we would be attending the second international match between Bangladesh and England. The match was scheduled to start at 12 o'clock and we had to be at the stadium before 11:30. I was very excited and could not sleep that night.

I woke up early in the morning along with all my family members as we were going to the Mirpur Cricket Stadium to watch the Bangladesh v England one-day cricket match. We finished showering at 9am and had breakfast together. After breakfast, we all got ready by 10:15am and left for the stadium at 10:30am. Everyone in my family was excited, but there was a bit of a traffic jam and we arrived at 11:30. Luckily, we managed to get enough seats for all of us as the match was due to start at 12 noon.

Once we were comfortably seated, my dad brought us some snacks and we joined the crowd of over 15,000 people who had come to watch the match. The match started on time with Bangladesh winning the toss and electing to bowl first. England posted 326 runs for the loss of seven wickets in 50 overs. For the first time in my life, I saw my childhood cricket heroes playing in front of

my eyes, including Shakib, Tamim, Miraz, Mahmudullah, Mushfiqur Rahim and Taskin. Taskin bowled very fast and took three wickets. The England team consisted of Moeen Ali, Josh Butler, Mark Wood, Adil Rashid, Jason Roy and Dawid Malan.

Then the game had a 40 minute break. We finished our lunch at 4pm. Everyone was in doubt because England scored big. There were a lot of foreigners around us. And what was most impressive was that many of them were supporting Bangladesh.

The match resumed at 4.30pm. Bangladesh came in to bat and this was the most exciting part of the match. Bangladesh tried their best to win the match, but due to a strong England bowling attack, Bangladesh crumbled for 194 runs. The crowd started to leave the stadium with sad expressions on their faces.

As this was my first day at the stadium, I noticed a few things that I wanted to discuss. One of them was the food I bought from the vendors. At the stadium, many people bought food from the vendors, including me. However, the food did not taste good and was not worth the money. Such food scams by vendors spoil the goodwill of our country, and others who visit the stadium later should be aware of them. On a positive note, the behaviour of the support staff was excellent and endearing. All in all, it was an interesting and exciting experience for me.



**Name: Shah Md Tanjid Rayeed**  
College no. 16124  
Class: VIII Section: D (Morning)

## Mary's Terror

Mary's point of view:

Mary got up, frightened. She quickly drank the glass of water that was on the table next to her bed. After drinking the water, she put the glass back in its place. She tried to remember the dream she had just had, but her brain wasn't working. She had had the same dream (she thought) the last few nights and had forgotten it by the time she woke up. Her brain didn't even catch a fraction of the dream (or nightmare, really). Her face was pale, just like the other times.

She quickly took out her mobile phone and texted her friend Nina.

"I think I had the same dream again," she typed.

"Again?" Nina texted back after a while.

"Yes, I think. I felt the same as the other days," she typed.

"Do you remember anything?"

"No."

"Tomorrow you go to the Marcelli department. I'll make an appointment for you."

"Why? Who is there?"

"Doctor Renard."

"You mean that psychiatrist. I am not going mad. You can't do that."

"I have had enough of this. We must end this once and for all. So, for my sake, go. Please. Don't raise my heartbeat every night, or else."

"All right, I will go just because you said so, but only once. If it doesn't cure my problem, I'll never go again."

There was just a pause in the answer and then Nina typed, "Don't worry, I trust him. He fixed my problem earlier; I don't think it will take him long to fix yours."

"OK," Mary typed before trying to sleep again at midnight.

Mary walked into the department at 11 a.m. Her heart was pounding frequently. She tried to take deep breaths, but her anxiety soared.

Finally, she sighed and said, "Let's see what he's got."

Doctor Renard's point of view:

I was looking at some reports. Just then a girl came into my cabin.

"May I come in, sir?" She asked.

"Yes, come in," I said.

She came in casually. Her face was pale and weak. I guessed from her appearance that she hadn't eaten normally for at least two weeks.

"Have a seat," I said in a friendly tone.

She sat down.

"You're Mary, aren't you? One of my patients told me about you. Even though she told me everything, I would like to hear from you," I said.

"My name is Mary. I am 20 years old. I go to the college in Citaro. I usually walk alone," she said.

"Hey, no need to be so formal. We are almost the same age, you can talk to me like a friend," I reassured her.

"How old are you?" she asked.

"28," I said.

"You're the same age as my older brother," she smiled.

"Well, now that we've been introduced, let's get down to business," I said.

"Oh! OK," her smile disappeared and she looked tense.

Then, slowly but surely, she described her situation. She said how she gets up and feels pale, how she gets up in shock. I listened carefully to her details in silence.

When she had finished, I thought for a moment and said, 'I don't think you slept well last night. How about sleeping in the cupboard? Then I'll get a more practical perspective on what's going on and try to remember the dream again.'

"But I..." she hesitated.

"Don't worry, I'll help you this time," I reassured her.

"Nina helped me, but still..." she hesitated again.

"Nina wasn't a psychiatrist."

"I know, but I don't know how to do this."

"How much do you trust Nina?" I asked.

"More than anyone," she said.

"Then you must trust me more than her," I said.

"But we've only just met," she said.

"It only takes a second to trust someone; you can do the same for me. If you give me your trust, I will give you your dream," I said with a smile.

She thought for a second and I think one of my words reassured her more than anything else.

She smiled and said "OK".

"So let's get started," I said, keeping the same smile. Then I took her to one of the cubicles. The cabin she entered had a bed, a chair and a table on which I had placed a glass of water. To observe her, there was an outer layer to the glass panel. I stood in front of the panel and started a timer on my watch.

For the first 20 minutes everything was normal. Then I noticed that Mary started to flinch and after a moment she started to scream. I deliberately did not wake her.

After an hour and thirty minutes she woke up, and to regain her trust I sat down on the chair next to the bed. She was panting heavily when she woke up. I handed her the glass of water, which she drank quickly, and suddenly her pale face lit up. "I remember the dream perfectly," she said. "I know exactly what happened. What did you do?"

"Let's go to my office and see what you've learnt," I said to her, and we went into our office.

The dream she always gets was quite fabulous (for me) and terrifying (for her).

When we reached our office and sat in our chairs, she began: "When I fell asleep, I saw nothing but darkness, and then suddenly I appeared in my house. At first I thought I was in a lucid dream, but after a moment my body began to move by itself. My body entered the dining room and reached a glass of water, but when I was about to drink it, my body stopped. It left the glass and went back into my room. It unlocked the door to the bookcase on my furniture. Then..." she stopped.

"Then?"

It took her a moment, but she continued, "As soon as I closed the door, I myself appeared behind it. Only her eyes were different to



mine. For a moment we stared at each other, but then she smiled a very sinister smile. Her smile extended to her full mouth. It was so wide that a normal person couldn't have done it. It frightened me and I fell over. My body tried to move away, but stopped against a wall. The girl was coming towards me. On her way she twisted her arms and head completely. It was so frightening that I froze. I even tried to scream, but nothing came out. The girl slowly walked in front of me and the last thing I saw were her teeth.

"Did anything happen after that?" I asked her calmly. "Yes," she closed her eyes and cried, "after a moment of blackness, I was suddenly in the third person and saw myself being torn and eaten. This girl tore my skin apart and then she drained all my blood and ate all my flesh. Then she tore out every single one of my organs. And finally she ate my brain, which made me wake up in shock."

"Do you know why this happened?" I asked after a short pause.

"No."

"It's because of your mental pressure. The explanation of the dream is simple. The water you saw is determined by the rest your body wants, but because of your work and study you didn't get it, and that's why you saw yourself, because that self was none other than your inside, full of mental pressure that slowly but steadily destroyed your whole body and finally your brain."

"You mean?"

"Yes. Go home and drink a glass of water, then think about what you need to do."

"Thanks, I'm really..." she began, as if she had finally met someone who could take the weight off her shoulders.

"Don't mention it."

Then she shook my hand quickly and walked away. As she left, I thought to myself, "How many more people will suffer from her trauma?"



**Name: Ibteeker Mahir Ishum**

College No:17133

Class: X Section: F (Morning)

**Vision**

**Passion**

**Excellence**

**Innovation**

**Determination**

**Inspiration**

## Plan: Successful

Professor Kerlon gave his lecture to the class on Newton's Third Law: Every force has an equal and opposite reaction. "Put simply, if you want to get a reaction from something, you have to give something to it first. This law applies everywhere," he said.

Only one of the students, Rohan, liked his lectures very much. The professor also liked Rohan the most because of Rohan's affinity for space science, especially astrophysics.

"We don't need to study any of that now. We have a perfect life," Simon interrupted. He had a habit of interrupting important conversations.

"I don't think so. Our lives have become quite artificial. We can do nothing without technology. We don't know what it costs. First we destroyed Mother Earth, then Mars, and now we are living in a glass dome on Kepler-22b. I don't think we're living a perfect life, I think we're living a destructive one," the professor replied in a gruff voice.

Later that day, Rohan found a diary in the corridor. The diary belonged to Professor Kerlon. In the diary, Rohan discovered a wealth of information about the professor. The professor had a daughter. She was an astronaut. But her space module broke apart during a space mission, and she was lost forever. The diary also briefly mentioned the

Professor's mission plan. The professor wrote in his diary that he had been able to locate the DR-60, a space research shuttle that had been abandoned due to an asteroid impact. Professor Kerlon was the captain of this shuttle. He did a lot of research, which he left behind. The shuttle is currently near the planet WASP-12-b. The professor intended to return the entire shuttle and his research by travelling there in his self-built sonic shuttle, the REM. Rohan closed the journal. He thought about something.

The next day, Rohan went to Professor Kerlon's house. He showed the professor his journal and said he wanted to join him on his mission. The professor seemed surprised to see Rohan holding the journal. He didn't want to agree at first, but Rohan's pleas forced him to.

They boarded the REM that night. Though its thrust was not great, it gained speed within an hour. After 16 hours, the REM was within a few hundred kilometres of the DR-60.

"Professor, I understand that WASP-12-b is very close to its parent star. The REM is too heavy to escape its gravity in a short time. Do you have a plan for that?"

"I always have a plan, Rohan. We will simply keep the REM in orbit around the

planet TrES-2-b. It's the darkest planet ever discovered. Then we will simply take a sub booster from the REM to dock with the DR-60."

As planned, they kept the REM in orbit around TrES-2-b. Then they got into a sub-booster and headed for the DR-60.

"Professor, I see the DR-60. Oh dear! It has suffered a major asteroid impact."

"Yes, Rohan. But strangely there is a capsule docked to its main hatch. We didn't see it when we escaped."

"Perhaps you didn't notice it and left in a hurry."

"Perhaps," the professor replied suspiciously.

After a few moments they came very close to the DR-60.

"Professor, I don't think we'll be able to dock with it because the main docking hatch is damaged."

"Don't worry. We won't dock with it. We will keep our booster parallel to it and very close to it. Then we will board it manually."

They successfully boarded the DR-60. Fortunately, the asteroid wasn't able to destroy the shuttle's engines. So it will be able to run on its own. When they entered the control room, they found a girl lying on the force sleep module. Rohan couldn't believe his eyes. But the professor seemed pleased to see the girl.

The professor went to the control panel to turn off the sleep module. After a while, the girl woke up.

"Who are you? Why are you on this ship?" Rohan asked.

The girl looks around for a moment.

"I am Juria. I am an IPSA astronaut. My

capsule was separated from my team by a satellite debris impact. I couldn't contact my team. I docked with this shuttle to ask for help. But it seemed that this shuttle had been abandoned. So I sent a distress signal from it. When my rocket was hit, the nitrous oxide tank exploded and I inhaled some of the gas. That's why I can't remember anything before that. Who are you?"

"I'm Rohan and this is Professor Kerlon. We have come on a mission to recover this shuttle. Don't worry. We will help you."

"Okay, guys. We need to concentrate on the mission. Rohan and Juria, you go back to the booster. I'll start the DR-60's engines and tie them to the REM. But first, please allow me to retrieve my research papers," the professor said, breaking his silence.

"Professor, why don't we stay in the shuttle with you? We don't need the booster anymore."

"No. We need to keep the REM as light as possible to escape the gravitational pull. Before you go to the booster, Juria, you should detach your capsule from the shuttle. Don't waste time. Go now!"

Rohan noticed that Professor Kerlon had been acting strangely ever since they had found Juria. It was pointless to leave the REM. He did not know why the professor had said that. He helped Juria remove her rocket.

Juria seemed to be a very quiet girl. She didn't talk much. As they were about to enter the booster, the professor handed Rohan a box.

"What is it, Professor?"

"Nothing, Rohan. Just take it with you."

Rohan still did not understand the point of giving them a box when the professor could carry it himself. But he did not think much

about it. He knew only one thing: everything Professor Kerlon does is for a reason. So he got into the booster with Juria. Once they were out of WASP-12-b's gravitational pull, Professor Kerlon started the REM's engine.

After a few moments, the REM was also able to escape the gravitational pull.

"Professor, we have docked with the DR-60. But after we docked with the DR-60, the fuel tank started to leak because of the thrust. We can't start the engine in this condition. We have to use the escape pod. But the capsule can only get us halfway to Kepler-22b. We need some kind of power to increase its thrust."

"I know that. That's why I have a plan. I will hit the REM from behind with the DR-60 when you eject the escape module".

"What do you mean you knew? And what plan?"

"Newton's third law: For every force there is an equal and opposite reaction. The opposite force created by my push would give you the thrust you needed. When we got into the booster, I found out that the fuel tank could leak from the docking pressure because I forgot to handle it properly in my haste."

"But, Professor, then you will crash into TrES-2-b. That was not the plan."

"It was always the plan. My main plan was to rescue Juria."

Juria broke her silence.

"What do you mean by 'rescue me'? Who am I to you?"

"You are my treasure. You're my lost daughter. If you check your digital medallion, it has the word 'NOLREK' in it."

"Yes, it does. I don't know how I got this

medallion. But how does it prove that I'm your daughter?"

"It's just the reverse of my name. I gave you this digital medallion when you were born. I was able to locate the REM because of the signal from this medallion. My mind told me it would be you."

"You are my father! Why didn't you say so when you saw me in the sleep module?"

"I didn't want any emotions to interfere with saving you."

"No. There must be another way," Juria sobbed.

"There isn't. If there was, I would have tried it. Rohan, prepare for ejection."

Rohan now understood why the professor had acted so strangely when he saw Juria. As soon as the REM collided with the DR-60, he ejected the capsule.

"It was a nice trip with you, Rohan. The box I gave you contains my research. Make good use of it."

"Please, no!" Juria cried.

"Professor, it was an honour to be your student. I will always remember you."

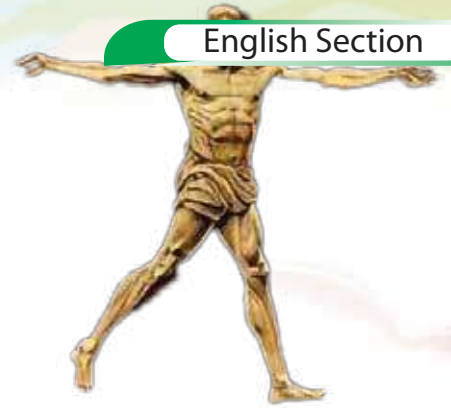
They stared at the REM as it crashed into TrES-2-b. They had successfully reached Kepler-22-b. Two years have passed since then. Humans no longer have to live in a glass dome. Professor Kerlon's research has helped them make Kepler-22-b habitable. After medical treatment, Juria can remember everything. She and Rohan are trying to build a shuttle to travel to TrES-2-b. They still believe that Professor Kerlon is alive and out there waiting for them. They have a plan for the successful rescue of the professor, but the plan is not yet in place.



**Name: Fahim Faysal**

College No: 18174

Class: HSC-22 Section: E (Morning)



## The Vitruvian Man

Works of art are not always just sketches, landscapes and portraits; on the contrary, they often reveal to the beholder many significant, undeniable thoughts and truths without uttering a single word, but asserting many, which has made them unforgettable in the inexorable course of time. Perhaps good art is no better than good literature: good essays, even good novels. "A picture is a poem without words," said Horace (65-8 BC), a Roman poet and lyricist.

As a viewer, a few months ago, while scrolling through the recommended videos on Facebook or YouTube, I came across one of the most recognisable works of art from the finest and most ingenious hands of the multi-talented genius Leonardo Da Vinci. It was most likely the 15th of April, Leonardo da Vinci's 569th birthday. Ted-Ed posted a video paying tribute to the legend in one of his most famous works of art, the Vitruvian Man. It may be an ink-on-paper sketch, but what fascinates me is its magnificence in showing our position in the 'chain of being'. It is also known as 'The Proportions of the Human Body according to Vitruvius'. This artwork was given this name because of some pertinent descriptions of the proportions of the human body in *De architectura*, a multi-volume book by Marcus Vitruvius Polio, who was a Roman architect, author and military engineer in the first century BC. This is a straightforward drawing in ink on paper, with no exaggerated embellishment. It is a sketch of a man in two superimposed positions. One

has his arms outstretched, like birds preparing to fly, and his legs outstretched about twice the width of his shoulders. This is the circumscribed one and has a similarity to Vitruvius' notion of proportion, which states that if you take the navel as the centre, you can draw a perfect circle and the legs and hands will touch the curvature of the circle. Another has the hands parallel to the ground and the legs relatively close together, within shoulder distance. These are the debates about the concept of proportion.

But what fascinates me is the drawing's relevance to a contemporary Italian intellectual movement, Neoplatonism, whose credo or dogma is intertwined with an ancient concept from the 4th century, "The Great Chain of Being", introduced by the philosophy of the famous philosopher Plato. This belief says that the whole universe (the macrocosm) has a hierarchy as a chain of all the microcosms below it, starting with the Omnipotent at the top and descending through the angels, planets, stars and all living beings to the demons and devils at the very bottom. In the early stages of this movement, it was assumed that our (human) position was right in the middle of the chain, because we have a mortal body with an immortal soul. It was around this movement that Vinci drew this sketch while jotting down his observations about the proportions of the human body. A neo-Platonist called Giovanni Pico Della Mirandola, on the other hand, had a different

perspective on our place in the chain of hierarchy. He simply broke our position off the chain and claimed, "Man has the unique ability to take any position he wants". He also claimed that the Creator wanted someone capable of understanding the enigmatic universe He had created. His concept established our position in the chain, based on our actions and deeds. According to Pico, we humans can crawl up the chain of being and behave like God, or we can crawl down to the lowest level and behave like a demon or a quadruped. It's all up to us. Looking at the sketch, we can see that the male figure in the sketch can reconcile the irreconcilable areas of the circle and the square by changing his position. As TED-ED says, we can also see from this artwork that "if geometry is the

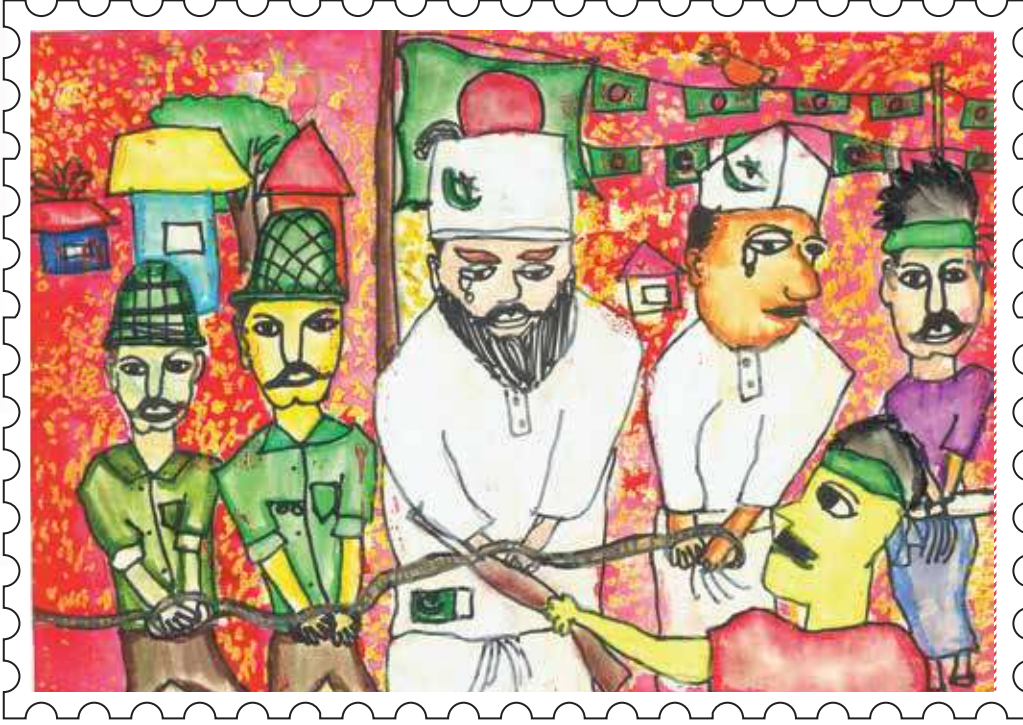
language in which the universe is written, then this sketch seems to say that we can exist within all the elements". Mankind is capable of taking on any shape it wishes, both geometrically and philosophically. This sketch by Leonardo shows his ability to combine geometry, religion, philosophy, architecture and the legendary artistic skills of his time. No wonder it was an icon of the age.

After all, we are enormously capable of maintaining our goodness throughout the universe. The choice is ours, either we crawl down or we crawl up. This combination of religion, philosophy and mathematics is thought-provoking, questioning our every action.



# চিত্রশৈলী





নাম : সাফওয়ান জাবির  
কলেজ নং : ১৩৮৪০  
শ্রেণি : ৩য়, শাখা : গ (প্রভাতি)



নাম : আব্দুল্লাহ আল আওসার  
কলেজ নং : ১৯৪৭২  
শ্রেণি : ৩য়, শাখা : গ (দিবা)







নাম : রিদওয়ান রহমান  
কলেজ নং : ১৮৩৭৫  
শ্রেণি : ৪র্থ, শাখা : খ (প্রভাতি)



নাম : স্বপ্নীল সাহা  
কলেজ নং : ১৮২৮৯  
শ্রেণি : ৪র্থ, শাখা : গ (প্রভাতি)



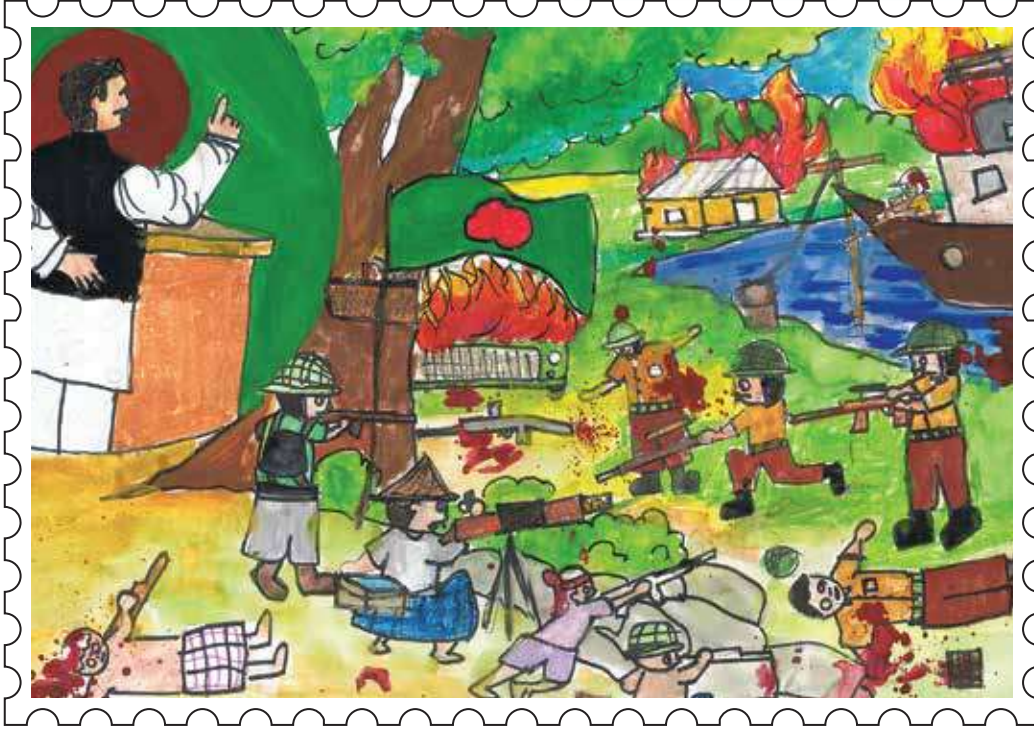


নাম : রায়হান কবির  
কলেজ নং : ১২০২৪  
শ্রেণি : ৫ম, শাখা : (প্রভাতি)



নাম : শাহরিয়ার রাফসান  
কলেজ নং : ১৭৯২১  
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, শাখা : খ (প্রভাতি)

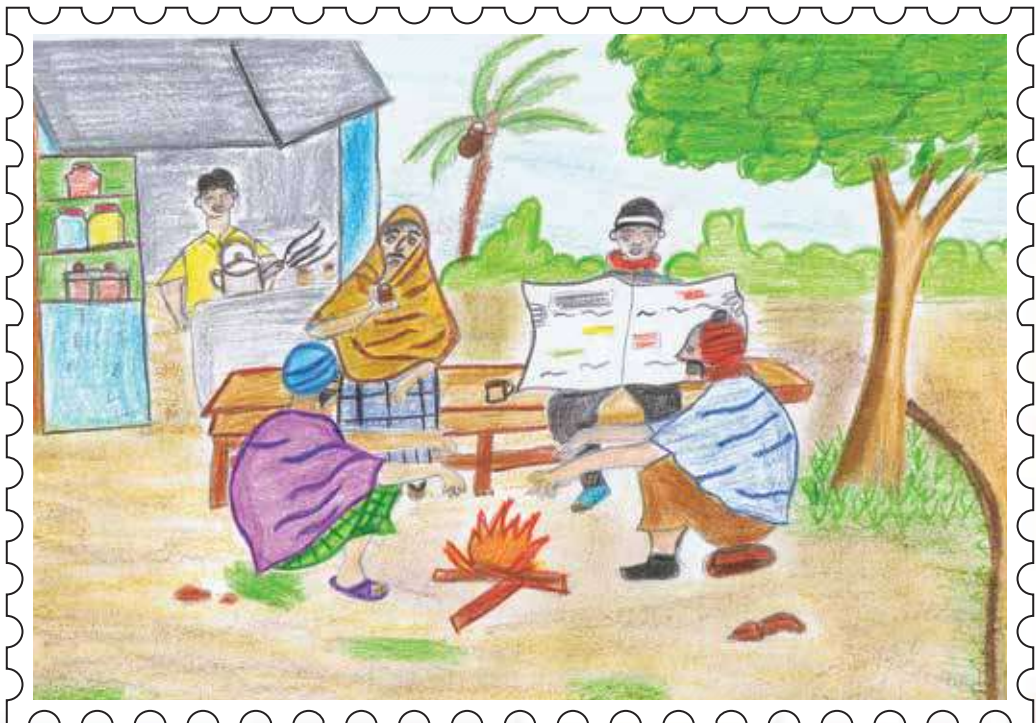




নাম : তন্ময় গুহ  
কলেজ নং : ১৮৮১৮  
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, শাখা : গ (প্রভাতি)



নাম : মো. মাহবির আলম সানভি  
কলেজ নং : ১৭০৪৮  
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, শাখা : (E) (প্রভাতি)

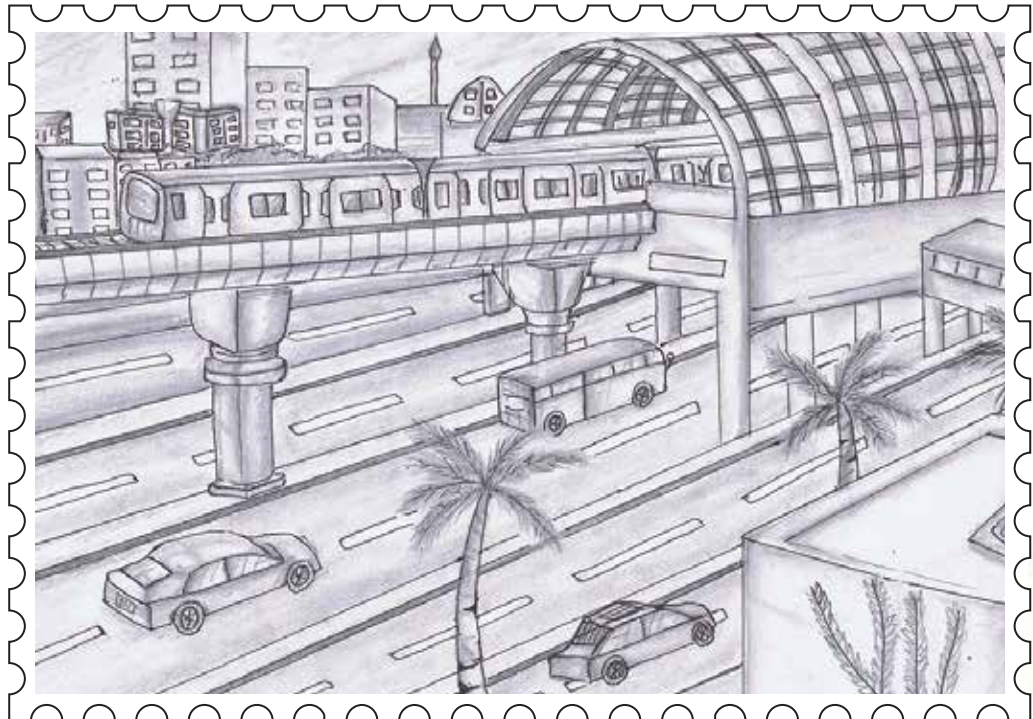




নাম : আতিক  
কলেজ নং : ১৭০৪৭  
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, শাখা : খ (প্রভাতি)



নাম : মাহির আফসার মাহির  
কলেজ নং : ১৬৯৬৭  
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, শাখা : (E) (প্রভাতি)





নাম : আতিক  
কলেজ নং : ১৭০৪৭  
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, শাখা : খ (প্রভাতি)



নাম : মো. তানভীর শাহাদৎ রাজ  
কলেজ নং : ০১২৯৭৫  
শ্রেণি : ?, শাখা : ? (দিবা)





নাম : সালমান ফারসি  
কলেজ নং : ১৩২১৩  
শ্রেণি : ৭ম, শাখা : খ (প্রভাতি)



নাম : মো. মুশতাক সিদ্দিক  
কলেজ নং : ০১২৮৬০  
শ্রেণি : ৮ম, শাখা : গ (দিবা)





মোঃ মুশতাক সিদ্দিক  
কলেজ নং : ১২৮৬০  
শ্রেণি : অস্টম, শাখা : গ (দিবা)



নাম : স্বচ্ছ হাওলাদার  
কলেজ নং : ১৬১৩৪  
শ্রেণি : ৮ম, শাখা : (E) (প্রভাতি)





নাম : মো. সাইফুজ্জামান রুমন  
কলেজ নং : ১৯০৬৪  
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ছ (প্রভাতি)



নাম : মো. সানজিদ রেজা  
কলেজ নং : ১৩৬৯২  
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : খ (দিবা)







# CLUB REPORT



# The DRMC Science Club

## Introduction:

“Science of today is the technology of tomorrow,” said Edward Teller, and with this statement, it is evident that science plays a vital role in shaping the world. The Dhaka Residential Model College Science Club, established in 2008, aims to spread awareness and increase consciousness among students about the infinite applications of science. The club members, consisting of enthusiastic students passionate about science, work tirelessly for the betterment of the organization.



## Chief Club Coordinator and Moderators:

The DRMC Science Club is led by Md. Nurun Nabi, an Associate Professor, who holds the position of Chief Coordinator of all the 18 clubs of Dhaka Residential Model College. The Moderator of the Science Club is Muhammad Mustafizur Rahman, an Assistant Professor in Zoology. Both are dedicated to ensuring the club fulfills its objectives.

## Objectives:

The core objectives of the DRMC Science Club are as follows:

- To inspire students to pursue scientific knowledge vigorously and broaden their scientific outlook.
- To bring schools and colleges and other Science Clubs close to society and acquaint people with the services and contributions of science.
- To develop constructive, exploratory and innovative faculties of the students.



- To create interest in the latest inventions and discoveries of science in various fields and get acquainted with the life history and contributions of great scientists.
- To create scientific facts and events according to one's surroundings.
- To organise a national inter-school and college science carnival every year.
- To discuss interesting topics, quizzes, and Olympiads and practise them.

### Activities:

The DRMC Science Club accomplishes its objectives through various activities and student participation events throughout the year, such as:



- Regular discussions with club members regarding various projects;
- Scientific competitions;
- Workshops on various science-related subjects, especially regarding quizzes and Olympiads;
- Guest lectures from renowned researchers and learned persons.

### National Festival:

The DRMC Science Club also organises a national inter-school and college science carnival every year. The festival provides an opportunity for students to showcase their scientific knowledge, creativity, and innovative ideas. It allows them to learn from each other and establish connections with fellow science enthusiasts.



### Conclusion:

The DRMC Science Club is a knowledge hub for science enthusiasts. The club's objectives are aimed at inspiring and developing students' scientific knowledge, creativity, and innovative faculties. With the support of the Chief Coordinator, Md. Nurun Nabi, and Moderator, Muhammad Mustafizur Rahman, the club continues to provide various activities and events that engage and empower students to explore the infinite applications of science.



## রেমিয়াস আর্ট ক্লাব পরিচিতি

ফিরে দেখা রেমিয়াস আর্ট ক্লাবের ২০২২ - ২০২৩ যাত্রা:

আর্ট, শব্দটি কম-বেশি সকলেই চিনে। এই শব্দটিকে অনেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় নানা অর্থে ব্যবহার করে। আর্ট যে শুধু ছবি আঁকাতেই সীমাবদ্ধ তা নয়। তবে এই আর্টকেই অনেকে তুচ্ছ মনে করে। জীবনে সফল হতে গেলে যে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে হয় এটা আমরা কমবেশী সবাই-ই মনে করি। কিন্তু একজন আর্টিস্ট হয়ে যে সম্মান পাওয়া যায় তা অনেকের কাছেই অজানা। একজন লেখক যেমন গল্প লিখে আর একজন কবি যেমন কবিতা লিখে মনের ভাষা প্রকাশ করেন, তেমনি করে একজন আর্টিস্ট ছবি একেই মনের ভাব প্রকাশ করে, আশে পাশের পরিবেশের চিত্র তুলে ধরেন। তাই এই আর্ট কিংবা শিল্পের অগ্রগতির উদ্দেশ্যেই পথচলা শুরু হয় রেমিয়াস আর্ট ক্লাবের।

“আর্টিসি ওভারল্যাপ ২০২১ এর মতো চমৎকার ফেস্টিভ্যাল আয়োজনের সফলতা ধরেই ২০২২ সালের ২২ সেপ্টেম্বরে অপরিমেয় কর্মপ্রেরণার মাধ্যমে তিন দিবসব্যাপী জাতীয় আর্ট ফেস্টিভ্যাল মার্কস একটিভ স্কুল আর্টিসি ওভারল্যাপ ২০২২ এর আয়োজন করে রেমিয়াস আর্ট ক্লাব। এই ফেস্টিভ্যালের দ্বারা সারাদেশের সকল শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যের অভাবকে দূর করে তাদের লুকানো প্রতিভাকে তুলে ধরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সকলের সামনে।

ক্লাবের প্রতিটি সদস্যের আপ্রাণ চেষ্টার কারণে তারা ফলস্বরূপ হিসেবে পেয়েছে অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। চিত্রাংকন, কসপ্লে, দেয়ালিকা, সরাচিত্রসহ বহুমুখী প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সকলের সাদাসিধা জীবনে রঙের ছোঁয়ায় রঙিন করে তুলেছে আমাদের প্রিয় রেমিয়াস আর্ট ক্লাব। তন্মধ্যে ছিল আর্ট ফর এঙ্গেলস, যেখানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সৃজনশীলতা অভিব্যক্তি পেয়েছিল। এই অভাবনীয় প্রয়াসের পিছে যেমন সকল সদস্যের অতুলনীয় অবদান ছিল, তেমনি ছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের অমিত ভূমিকা।

আমাদের সকলেরই কামনা রেমিয়াস আর্ট ক্লাবের এই উদ্যোগ সামনের দিনগুলোতে আরো সুফল বয়ে আনবে, যা দেশের শিল্পচর্চাকে বিশেষ বৃদ্ধি সহকারে প্রদর্শন করবে। বিশেষ আনন্দের সঙ্গে ব্যক্ত করা যাচ্ছে যে আমাদের রেমিয়াস আর্ট ক্লাবের বেশ কিছু সদস্য চলতি বছরের বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জন করেছে যা কেবল ক্লাবের বা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নয়, সমগ্র দেশের জন্যেও এক গর্বের বিষয়। তাদেরই একজন আবতাহি নূর, যে নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

চিত্রশিল্প মানুষের অন্তরের প্রতিফলন। মানুষ যা ভাবে, যা চিন্তা করে, যা দেখে, যা উপলব্ধি করে এবং যা প্রকাশ করতে চায় তার একটি নান্দনিক ও সার্বজনীন বহিঃপ্রকাশ হলো চারু ও কারু শিল্প। আমাদের রেমিয়াস আর্ট ক্লাবের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো দেশের সকল খুদে আর্টিস্টদের আর্টিস্টিক প্রতিভাকে বিকশিত করার মাধ্যমে শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা।

# Remians Music and Cultural Club

[Unite Through Music, Exchange Through Culture.]

## Introduction:

The Remians Music and Cultural Club at Dhaka Residential Model College is a student-centred club founded in 2016 with the aim of preserving and promoting the musical and cultural heritage of Bangladesh. The club consists of students who are enthusiastic about music and culture and are committed to keeping the country's rich traditions alive.



## Chief Club Coordinator and Moderators:

Mohammad Nurun Nabi, an Associate Professor, holds the position of Chief Club Coordinator, while Prasun Goswami, an Assistant Professor, serves as the club's Moderator. The roles of co-moderators are fulfilled by Tamanna Ara, a Lecturer, and Bornali Ghosh, an Assistant Teacher.



## Objectives:

The main objectives of the club are to:

- Offer a platform for students to showcase their musical skills
- Introduce students to the cultural heritage of Bangladesh
- Foster unity among club members
- Provide opportunities for collaboration and exchange of ideas

### Activities:

The club accomplishes its goals through various events and activities throughout the year, including:

- Regular musical performances by club members
- Cultural competitions
- Workshops on traditional instruments and dance styles
- Guest lectures from renowned musicians and cultural experts

### National Festival:

The National Music and Cultural Festival is the most celebrated event hosted by the club, taking place on the college campus. It is a joyous celebration of the best of Bangladeshi music and culture, featuring musical performances, cultural competitions, and Olympiads. Students from various educational institutions across the country take part in the festival,



which draws a large audience of people from the college and the local area to take



pleasure in the festivities. There are also stalls and stands selling traditional Bangladeshi cuisine, in addition to a wide variety of arts, crafts, and cultural items. Moreover, the event is also a great opportunity for people to gain a deeper understanding of the culture and history of Bangladesh.

### Conclusion:

The Remians Music and Cultural Club at Dhaka Residential Model College is a lively and active club that plays a vital role in preserving and promoting the musical and cultural heritage of Bangladesh. Through its events and activities, the club provides students with opportunities to showcase their talents and deepen their understanding of their country's rich cultural traditions.

# The DRMC IT Club

## Introduction:

Deep within the confines of Dhaka Residential Model College, Bangladesh, lies the DRMC IT Club, a haven for the brightest young minds with a passion for technology and innovation. Founded in 2017 by driven students, this club is a platform for members to unleash their creativity and delve into the endless possibilities of the tech world. With a mission to inspire and motivate, the DRMC IT Club empowers its members to push boundaries and explore the ever-evolving landscape of the digital realm.

Chief Club Coordinator, Moderator, and Member Secretary:

At the helm of this organisation is the brilliant Mohammad Nurun Nabi, Associate Professor and Chief Club Coordinator. Assisting him in guiding the club's activities are the ever-insightful Rasel Ahmed and Md. Asique Iqbal, Aiyesha Anwar both esteemed Lecturers serving as Moderator and Co-moderator, respectively.



## Objectives:

The DRMC IT Club aims to achieve the following objectives:

- \* Foster a community of individuals passionate about technology and innovation
- \* Encourage creativity and exploration of new ideas
- \* Develop technical skills and knowledge
- \* Provide opportunities for personal and professional growth
- \* Encourage teamwork and collaboration

## Activities:

The DRMC IT Club regularly organises a range of activities to engage its members, including:

- Workshops on coding, web development, and other technical skills
- Tech talks and seminars by industry experts
- Hackathons and coding competitions
- Project showcases and exhibitions
- Social events to encourage networking and collaboration



### National Festival:

The DRMC IT CLUB hosted a great tech fest from March 18-20, 2022. They celebrated innovation and technology, bringing together pros, enthusiasts, and students to explore the latest advancements in the tech industry. Not only exhibits, but there were also workshops and seminars on AI, blockchain, cybersecurity, and more, led by experts to teach people valuable insights and knowledge. It was not just a tech show, but an enjoyable carnival with



food stalls and other activities for all ages. With Cosplay, Project Display, Digital Art Display, Gaming Contest, Robotics, Programming, Olympiad and Quiz, the fest was a hit, and attendees got a unique chance to learn, network, and have fun.

### Our Achievements:

The DRMC IT Club has received several awards and recognition for its achievements in various competitions and events. Notable achievements include winning the Innovative Teaching and Learning Expo, Esonance 2017, Inclusive University Challenge, and Josephites Technovation 2017, among others.



### Until The Eu App:

Two of the club's members, Mahir Daiyan Safwan and Muhtasim Mahim, developed an app called "Until The Eu", which won the 1st prize in the 12th e-Icon World Contest held in South Korea in 2022. The app aims to help students recognize their stress levels and provide personalised solutions to manage stress effectively.

### Conclusion:

The DRMC IT Club has created a vibrant community of tech enthusiasts, fostering a passion for technology and innovation among its members. With its excellent leadership and dedicated members, the club has achieved significant success and is set to inspire and nurture future generations of tech-savvy students.



# The DRMC Photography Club

## Introduction:

The DRMC Photography Club is a prestigious and prosperous club at DRMC that has become a significant outlet for creativity for students all over the country since its birth in 2014. The club's dedicated executives, panel members, and volunteers have shown excellent dedication, helping to expose photography and amuse the world with the innovative talents of both pro and newbie photographers from their college.

## Moderators:

The Chief Club Coordinator of the DRMC Photography Club is Mohammad NurunNabi, an Associate Professor, and Khandker Azimul Haque, a Lecturer, serves as a Moderator.



## Objectives:

The DRMC Photography Club aims to achieve the following objectives:

- To create a photography-minded environment for participants to blend in and learn about the world of photography actively.
- To provide opportunities for recognition and awards to inspire members.
- To raise members' photography skills through meetings, workshops, and fests.
- To encourage leadership among members.



### Activities:

The DRMC Photography Club engages in the following activities:

- Covering college events and programs through photography and promoting them on their communication media.
- Recording club meetings, workshops, and fests through photography.
- Being active during emergencies that require photography.
- Producing promo materials for the club or upcoming events through cinematography and graphics.
- Conducting weekly club meetings, monthly workshops, and yearly fests to teach members the skills and responsibilities of professional photographers.
- Appointing a captain among members weekly to encourage leadership.



### National Festival:

The DRMC Photography Club's National Photography Fest is a mandatory part of their yearly goals. The club strives to hold the "DRMC Photography Club presents DRMC National Photography Fest" under the permission of their respected authorities and moderators. The club promotes the fest through social media and other channels to reach thousands of students, photographers, sectoral specialists, and relevant stakeholders

### Conclusion:

The DRMC Photography Club provides a platform for future generation photographers to explore and showcase their talents. The club's goal is to organize national events, establish a network between professional and amateur photographers, and enhance and develop students' photography skills. The DRMC Photography Fest offers a unique opportunity for photographers to be part of the most fascinating festival of Dhaka Residential Model College and exhibit their work in a group exhibition. The club provides leadership opportunities and inspires future photographic projects.

## The DRMC BNCC Platoon

### Introduction:

The Bangladesh National Cadet Corps (BNCC) is a voluntary organisation that aims to instil discipline, hardship, and patriotism in students while enriching their knowledge and preparing them to become smart citizens of future Bangladesh. The DRMC BNCC Platoon, one of the best Platoons of the army wing of Ramna Regiment, provides an opportunity for college-level students to experience the life of a cadet and compete with a patriotic attitude for future challenges in life.

### Platoon Commander and Company Adjutant:

The DRMC BNCC Platoon is led by the respected PUO, Md. Abu Syed, Lecturer, who has

completed the Short Course, Professor Under Officer-13 from Bangladesh Military Academy (BMA) with distinctive achievements. The current Company Adjutant, CUO Farhan Shihab Ta'sin, was a former Cadet Sergeant and In-charge of the DRMC BNCC Platoon. He excelled up to the Cadet Under Officer (CUO) rank due to his excellent performance and dedication and now leads the Bravo Company with great effort.

### Motto and Spirit of BNCC:

The motto of the BNCC is Knowledge & Discipline.



The spirit of the BNCC is embodied in the volunteers who are trained and prepared to work voluntarily for the nation.

### Purpose:

The DRMC BNCC Platoon aims to train students to become good citizens who can render their services to the nation as organised and disciplined volunteers during peace and war.

### Activities and Responsibilities:

The students enrolled under the BNCC Act 2016 are called cadets and are the main functional force of the BNCC. Cadets are trained and prepared to serve the nation during a national emergency, render services to distressed citizens and the nation during man-made and natural disasters, act as an aid to the Armed Forces to safeguard national integrity and undertake any responsibilities given by the government.

### Achievements:

The DRMC BNCC Platoon achieved unprecedented success in the National Education Week-2022 Thana-level co-curricular activities competition, winning the Best BNCC Platoon, Best Platoon Commander (PUO Md. Abu Syed, Lecturer), and Best BNCC Cadet (Rudnan Ahammed Tanzim) categories. The achievements were possible due to the leadership of Respected PUO Md. Abu Syed, Lecturer and the contribution of every member of the BNCC platoon.

### Conclusion:

The cadets of the DRMC BNCC Platoon have participated in various voluntary activities during sudden emergencies, such as fire emergencies and road accidents. They have also participated in multiple training camps and tours, highlighting their institution and their country in front of national and international representatives. Through their dedication and hard work, they have proven to be disciplined and organised volunteers who can serve their nation during peace and war.

## DRMC Business and Career Club

### Introduction:

Business plays a vital role in shaping the economy of a country. It is an essential organisation that engages in commercial, industrial, or professional activities. A career is also a crucial aspect of our lives, defining our status in society and lifestyle. The DRMC Business and Career Club, a student-governed club of Dhaka Residential Model College, aims to connect students to the world of business and enhance their skills and vision.

### Chief Club Coordinator and Moderators:

The DRMC Business and Career Club is led by Md. Nurun Nabi, an Associate Professor, who holds the position of Chief Coordinator of all the 18 clubs of Dhaka Residential Model College. Ahasanul Hague Rinku, a lecturer of Management at Dhaka Residential Model College, serves as the club moderator. Under their leadership, the club has expanded its reach beyond the walls of Dhaka Residential Model College, providing opportunities for students to learn and grow in the field of business.



### Objectives:

- To provide students with opportunities for professional exposure and development;
- To widen students' vision and enhance their skills in the field of business and career;
- To connect students with successful entrepreneurs and professionals in their respective fields;
- To foster leadership skills and promote teamwork among the students.





**Activities:**

- Organising workshops, seminars, and guest lectures by successful entrepreneurs and professionals
- Providing networking opportunities for students to connect with industry experts and fellow students
- Conducting skill-building activities such as case studies, business simulations, and group projects
- Participating in inter-school and inter-college business competitions and events

**National Festival:**

The DRMC Business and Career Club also organises the Annual Business and Career National Festival, where students from different schools and colleges come together to showcase their business and leadership skills. It is an excellent platform for the students to learn from each other and gain exposure to the industry.



**Conclusion:**

The DRMC Business and Career Club has made significant progress since its inception in 2019, and it is a torchbearer for every future leader, entrepreneur, and dreamer of a bright career in the country. With the vision of "Together we can do so much," the club hopes to continue expanding its reach and providing opportunities for students to excel in the field of business and career.

# DRMC Social Service Club

## Introduction:

DRMC SOCIAL SERVICE CLUB is one of the remarkable clubs of Dhaka Residential Model College. It is a club dedicated to serve the needy and distressed section of the society. In our society, a considerable number of people live below the poverty line and lead an underprivileged life. The club aims to build productive students and inculcate moral and ethical values in them through proper socialisation. The aim of the club is to teach the students the importance of helping the needy and to promote social work for the overall welfare of all people.

## Club Coordinator and Moderators:

The club is managed by a trusted executive committee headed by the Chief Club Coordinator, Mohammad Nurun Nabi, Associate Professor and the Moderator, MD. Khairuzzaman, Lecturer, and Assistant Moderators Jahangir Alam, Lecturer, and Maidul Haque, Lecturer.



## Objectives:

The motto of the club is to serve humanity and make a difference in the lives of the needy and suffering people. The club aims to create awareness among students about social issues, raise funds for welfare projects and provide a platform for students to engage in social welfare activities. By participating in these activities, students develop sympathy, compassion and the urge to make a positive contribution to society.





### Activities:

The club organises seminars on social issues, collects donations from various organisations and individuals, and supports welfare projects. During the ongoing pandemic, the club organised online seminars to help students maintain good mental health. The club also organised events to show respect for health workers and to raise awareness about the importance of cleanliness and dengue prevention. In addition, the club distributed winter clothes to the underprivileged, provided assistance to those affected by the COVID-19 pandemic, distributed iftar kits during Ramadan, and donated raincoats to rickshaw pullers.

### Social Work:

DRMC SOCIAL SERVICE CLUB is actively involved in social work to improve the lives of the needy and underprivileged in society. The club organises various initiatives such as distributing winter clothes, providing assistance during the COVID-19 pandemic, distributing Iftar kits during Ramadan and donating raincoats to rickshaw pullers.

### National Festival:

The club participated in the Virtual National Mega Festival 2021 organised to celebrate the 61st anniversary of DRMC. The festival included various programmes and activities organised by all the clubs of DRMC.

### Conclusion:

DRMC SOCIAL SERVICE CLUB plays a vital role in serving humanity and inculcating a sense of social responsibility among the students. The club's activities and initiatives are aimed at improving the lives of the needy and underprivileged and promoting social welfare. With a dedicated executive committee and the support of students and faculty, the club continues to make a positive impact on society.





## Dhaka Residential Model College Model United Nations Association

### Introduction:

Dhaka Residential Model College Model United Nations Association (DRMCMUNA) is a 4-year-old club of Dhaka Residential Model College. Since its inception in 2019, the club aims to provide an opportunity for individuals to practice public speaking and showcase their diplomatic and leadership skills. The focus of DRMCMUNA is to improve socialisation skills, communication skills, public speaking skills, comprehension skills, research efforts, cooperation, negotiation, and writing skills. The club aims to develop the interpersonal skills of students so that they can excel in their respective careers.

### Club Coordinator and Moderators:

The club is managed by a trusted executive committee headed by Mohammad Nurun Nabi, Associate Professor, as the Chief Club Coordinator, Rashed Al Mahmud, Associate Professor, as the Convenor, and Md. Afzal Hossen, Lecturer, as the Moderator.

### Objectives:

#### DRMCMUNA aims to:

- Improve public speaking and diplomatic skills
- Improve socialisation and communication skills
- Promote comprehension and research skills
- Develop cooperation and negotiation skills
- Develop writing skills
- Help students achieve their goals and become effective leaders



**Activities:**

DRMCMUNA has actively participated in various Model United Nations conferences and achieved notable successes. The club has received awards and recognition in various categories, demonstrating the potential and talent of its delegates. Some of the **achievements include:**

- Best Delegation Award at the Eventrra Model United Nations General Assembly 2021
- Special Mention, Outstanding Delegate and Verbal Mention awards from various conferences such as Notre Dame College Model United Nations Conference 2022, Oxford International School Model United Nations 2022, Jahangirnagar University Model United Nations 2022, Sunnyside Model United Nations 2022 and Adamjee Model United Nations Session I 2022.
- Individual awards in categories such as Best Strategist, Outstanding Delegate, Special Mention and Verbal Mention.

**National Festival:**

DRMCMUNA organised its own Model United Nations conference titled "DRMC Model United Nations 2023". The conference featured 12 committees and welcomed participants from over 50 institutions. Eminent guests including politicians and dignitaries attended the conference which was co-sponsored by LankaBangla Finance, Trust Bank, CodersTrust and Supreme Chemi International. The United Nations Bangladesh was the strategic partner of the conference.

**Conclusion:**

Through its participation in various Model United Nations conferences, DRMCMUNA has demonstrated its commitment to developing students' skills and providing them with valuable experiences. The club's achievements reflect the dedication and talent of its delegates, and it continues to strive for excellence in developing leadership and diplomatic skills among the students of Dhaka Residential Model College.

# The DRMC Islamic Cultural Club

## Introduction

Dhaka Residential Model College (DRMC) is a renowned institution of education, founded in



1960 in Mohammadpur, Dhaka. The college is renowned for its exceptional academic programmes and for its significant emphasis on Islamic knowledge and culture. However, despite having a range of clubs for different disciplines, there was no specific club dedicated to organizing events celebrating Islamic customs and traditions. To address this issue, the DRMC Islamic Cultural Club was established on 6 May 2021.

## Chief Coordinator and Moderator

The club is managed by a reliable executive committee, led by The Chief Club Coordinator, Mohammad Nurun Nabi, Associate Professor and the Moderator, Muhammad Abdullah Al-Mamun, Lecturer.

## Objectives

The primary objective of the DRMC Islamic Cultural Club is to liberate students from the influences of militancy and drugs while spreading the correct history, traditions, culture, education and message of Islam. The club is also committed to creating a platform for students to rise above misconceptions and establish an atmosphere of truth and peace in Islam.



## Activities

The club has organized various events and programmes, including:

- "DRMC National Islamic Cultural Festival 2021"
- "Composition and Qirat Competition 2021" on the occasion of Eid Miladunnabi
- "Ramadan Calendar Distribution Program 2022" on the occasion of the Holy Month of Ramadan
- "The DRMC Islamic Cultural Club Organised Iftar Distribution Program 2022"
- "Ramadan Daily Dua and Hadith Series 2022"
- "Online Islamic Quiz 2022" The club provides one online poster each week to help students learn about Islam and Islamic culture. Members of the club come together for an hour twice a month to conduct club activities. Additionally, the club organizes one workshop every six months and a Quran education programme for college students during Ramadan.



### National Festival

To celebrate 61 years of Dhaka Residential Model College, the club organized a "Virtual National Mega Festival." The event included live quizzes, movie projections, Nasheed, Qirat and performances by the Islamic Band 'Kolorob' and 'Truth of Ummah.' More than 4,000 students from various parts of the country participated in the festival, which was held online.



### Conclusion

The DRMC Islamic Cultural Club is a newly established club at Dhaka Residential Model College that is committed to honouring the rich history and culture of Islam. The club provides a platform for students to showcase their skills in various Islamic activities while learning about Islamic knowledge and culture. The club aims to spread positivity and moral values among all peace-loving people while promoting peace and harmony.





শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়- ক (E) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-ক (E) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-খ (B) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-খ (B) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-গ (C) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়- গ (C) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-ক (E) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ- ক (E) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ





শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ- খ (B) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ- খ (B) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ- গ (C) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ- গ (C) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম- ক (E) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম- ক (E) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-খ (B) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম-খ (B) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম- গ (C) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম- গ (C) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ক (E) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- ক (E) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- খ (B) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- খ (B) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- গ (C) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- গ (C) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ





শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ-ঘ (D) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- ঘ (D) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ক (E) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম- ক (E) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম- খ (B) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম- খ (B) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-গ (C) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম- গ (C) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম-ঘ (D) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম- ঘ (D) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ক (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ক (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-খ (B) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-খ (B) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-গ (C) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম- গ (C) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ





শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম-ঘ (D) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম- ঘ (D) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ক (A) মানবিক (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-খ (B) বানিজ্য (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-গ (C) বিজ্ঞান (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-গ (C) বিজ্ঞান (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ঘ (D) বিজ্ঞান (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-ঘ (D) বিজ্ঞান (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-৬ (E) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-৬ (E) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম- চ (F) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-চ (F) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম-(B/E) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-(B/E) (বাণিজ্য ইংরেজি ভাষন) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ক (A) মানবিক (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-খ (B) বাণিজ্য (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ





শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-গ (C) বিজ্ঞান (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- গ (C) বিজ্ঞান (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-ঘ (D) বিজ্ঞান (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- ঘ (D) বিজ্ঞান (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-চ (F) বিজ্ঞান (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- চ (F) বিজ্ঞান (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম-৬ (E) বিজ্ঞান (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- ৬ (E) বিজ্ঞান (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ক (A) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ক (A) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- খ (B) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- খ (B) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- গ (C) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- গ (C) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ঘ (D) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ঘ (D) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ





শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- উ (E) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- উ (E) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ছ (F) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ছ (F) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ছ (G) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ছ (G) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

ବର୍ଗିଳ

୨୦୨୨



বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২২



বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২২, মেডেল প্রদান



বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২২, মেডেল প্রদান



বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২২, সাইকেল রেস



প্রতিযোগীদের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২২



বসন্ত উৎসব-২০২২



বাগান প্রতিযোগিতা-২০২২



বাগান প্রতিযোগিতা-২০২২, সম্মানিত বিচারকবৃন্দ



১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২



মহান বিজয় দিবস-২০২২



মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২, উপহার গ্রহণ



২৬ মার্চ রানার আপ পুরস্কার গ্রহণ-২০২২



অধ্যক্ষ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ ফিল্ডার এর পুরস্কার প্রদান-২০২২



স্বাধীনতা দিবস ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন দলের উপহার গ্রহণ-২০২২



বিজয়ী দলের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয় ও অধ্যক্ষ পত্নী



পহেলা বৈশাখ, বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষবৃন্দ-২০২২



বর্ষ-বরণ অনুষ্ঠান-২০২২ উদ্বোধন



পহেলা বৈশাখ-২০২২ র্যালি



বাংলা বর্ষ-বরণ অনুষ্ঠান-২০২২



শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২০২২; জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পুরস্কার গ্রহণ-২০২২



শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান-DRMC গর্বিত-অধ্যক্ষ মহোদয়



শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী পুরস্কার গ্রহণ-২০২২



শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান (DRMC) ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী-২০২২



জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান-২০২২



শেখ রাসেল পদক-২০২২ প্রাপ্তি



১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস-২০২২



আইটি ফেস্ট-২০২২



রেমিয়াস আর্ট ফেস্ট-২০২২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান



ক্ষুদে শিল্পীর চিত্রকর্ম উপহার প্রদান, রেমিয়াস আর্ট ফেস্ট-২০২২



সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, রেমিয়াস আর্ট ফেস্ট-২০২২



শিক্ষা সচিব জনাব আবুবকর সিদ্দীক এর চিত্রকর্ম প্রদর্শনী পরিদর্শন





মান ক্লাব আয়োজিত অনুষ্ঠান-২০২২



সম্মানিত অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান, আয়োজনে মান ক্লাব



৫ম মিডিজিক ফেস্ট-২০২২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ



মিডিজিক ফেস্ট-২০২২ উপহারসহ প্রতিযোগী



'লুক এ্যাট বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি



মানব জমিন নাটকের অভিনেত্রী ও কলা-কুশলী



সোস্যাল সার্ভিস ক্লাব আয়োজিত ইফতার শাহফিল



সোস্যাল সার্ভিস ক্লাব আয়োজিত শীতবস্ত্র প্রদান

